বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার অভিযান

ময়ূখ চৌধুরী
চিত্রিত

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বাংলাবুক.অর্গ

বুক ফার্ম

শিকার কাহিনীগুলি এখন ইতিহাসের মতোই অতীতের নীরব সাক্ষী। এ বইয়ের কাহিনীর যারা নায়ক তাঁরা সকলেই বঙ্গসন্তান, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হলেন ভূ-সামন্ত ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি । কাহিনীগুলি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং বেশির ভাগ শিকারের পটভূমিকা অবিভক্ত বাংলার। অধিকাংশ কাহিনী বর্তমানে দুর্লভ। কাহিনীর মাধ্যমে শুধু অতীতের সুখস্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়াই নয়, এ বইয়ের পাতায় পাতায় পাঠকেরা পুনরাবিষ্কার করবেন শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী (প্রসাদ রায়)-কে যাঁর অসংখ্য জীবজন্তু ও শিকারের অলংকরণ সমৃদ্ধ করেছে এই সংকলনকে।

www.BanglaBook.org

ময়ূখ চৌধুরী চিত্রিত

বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার অভিযান

সম্পাদনা

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বুক ফার্ম

বুক ফার্ম

Bangalir Dushprapyo Shikar Abhijan

Edited by

Biswadeb Gangopadhyaya

Book making, page layout & compilation © BOOK FARM

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৩০
থেকে প্রকাশিত

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেসন্‌ প্রা লি, কল-০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

তৃতীয় মুদ্রণ : মে ২০১৯

মূল প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ময়ূখ চৌধুরী (প্রসাদ রায়)
কারিগরি সহায়তা ও প্রচ্ছদ রূপায়ণে : সৌম্যেন পাল
প্রচ্ছদ লিপি : শ্রী ছদ্মনাম
প্রচ্ছদের রং : সুমিত রায়
বর্ণ সংস্থাপন ও ফটোশপ ডেভেলপ্‌মেন্ট : প্রদীপ গরাই

এই সংগ্রহে যাঁদের আলোকচিত্র ও কাহিনীগুলি মুদ্রিত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে অথবা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সকলের সন্ধান না পাওয়ায় অনুমতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো হল। বিষয়টি তাঁদের নজরে এলে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হল যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়।

চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০

৪৫০ টাকা

উৎসর্গ

'আরণ্যক' শিল্পী ময়ূখ চৌধুরীর স্মৃতিতে

* চিত্র পরিচিতি : ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত মন্দিরা পূজাবার্ষিকীতে ময়ূখ চৌধুরী 'আরণ্যক' ছদ্মনামে 'অতিকায় মার্জার' নামক সংক্ষিপ্ত রচনার সঙ্গে এই ছবিটি আঁকেন। প্রসঙ্গত, 'ভয়াবহ শিকার কাহিনী' নামক অন্য একটি বইয়ে 'নয়টি ছুরির মালিক' গল্পে একই ছবি আবার আঁকেন। ময়ূখ চৌধুরী অলংকরণ করার সময় 'প্রসাদ রায়' নাম ব্যবহার করলেও আরণ্যক নামটি বিরল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্বাগত দত্ত বর্মন নিমাই ঘোষ অর্ক পৈতণ্ডী সৌম্যেন পাল অমিতাভ কারকুন
সুমিত রায় দীপাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় দেবাশিস গুপ্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌশিক মজুমদার সৈকতশোভন পাল সুমিত সেনগুপ্ত
দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম নির্মল বুক এজেন্সি দেব সাহিত্য কুটীর

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রাক্‌কথন

আমরা অনেকেই শৈশব থেকে অ্যাডভেঞ্চার কিংবা গোয়েন্দা কাহিনির মতো শিকারকাহিনি পড়েও উত্তেজনা অনুভব করেছি। শিকারির সঙ্গে আমরাও অনুসরণ করেছি নরখাদকদের পদচিহ্ন, শিকারির মতো আমরাও বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি গাছের মাচায় বসে, মাহেন্দ্রক্ষণে শিকারির আগ্নেয়াস্ত্রে শিকারপর্বটি শেষ হওয়ার পর কাহিনির শেষে শিকারির মতো আমরাও নিশ্চিন্ত।

বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আধিক্যে, অরণ্যভূমির বিস্তারে একসময় আফ্রিকার পরেই ভারতের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে মৃগয়া তথা শিকারের প্রচলন ছিল তা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ইতিহাসের নানা অংশে উল্লিখিত হয়েছে। কালের বিবর্তন শিকারের সংজ্ঞাটাকে বদলে দিয়েছে, নিধন নয় সংরক্ষণ— আজ সভ্য মনুষ্যসমাজের অঙ্গীকার। শিকারের রোমাঞ্চের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ছিল তাও আমরা মেনে নিয়েছি।

তবু নিছক হিংসা ছাড়াও শিকারের মধ্যে যে বীর্য, সাহস, ক্ষিপ্রতা, একাগ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তথা ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল তা মিথ্যা নয়। আজও দেশ-বিদেশের শিকারের নায়কদের অভিজ্ঞতার কাহিনি নিয়ে নানান বই পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়। বাংলা কিশোর সাহিত্যেও একসময়ে শিকারকাহিনির অনিবার্য উপস্থিতি চোখে পড়ত। পুরোনো দিনের সেই স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই এই বই-এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ।

'বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার অভিযান'-বই এর এই নামকরণের একটা ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

এ বইয়ের কাহিনির যারা নায়ক তাঁরা সকলেই বঙ্গসন্তান, এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হলেন ভূ-সামন্ত ও জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি, কারণ শিকারযাত্রার মতো রীতিমতো ব্যয়বহুল কাজ করা তৎকালে সাধারণ শ্রেণির লোকেদের সাধ্যাতীত ছিল, তবু তার মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতো খ্যাতকীর্তি ভাস্কর ও হীরালাল দাশগুপ্তর মতো রাজনীতিবিদরা রয়েছেন। কাহিনিগুলি তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং বেশির ভাগ শিকারের পটভূমিকা অবিভক্ত বাংলার। দ্বিতীয়ত 'দুষ্প্রাপ্য' শব্দটির প্রয়োগ এ কারণেই, যে, অধিকাংশ কাহিনি বর্তমানে দুর্লভ। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিখ্যাত শিকার কাহিনী' (১৯৬৩) নামক অধুনালুপ্ত সংকলনটির সঙ্গে আরও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য শিকারকাহিনি, তথ্যপঞ্জি ও অলংকরণ যুক্ত করে নতুন আঙ্গিকে বর্তমান বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আর পরিশেষে 'অভিযান' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে কারণ এতে মনগড়া কাহিনি নয় কেবলমাত্র শিকারের সত্য ঘটনা এবং বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

কাহিনির মাধ্যমে শুধু অতীতের সুখস্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়াই নয়, এ বইয়ের পাতায় পাতায় পাঠকেরা পুনরাবিষ্কার করবেন শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী (প্রসাদ রায়)-কে যাঁর অসংখ্য জীবজন্তু ও শিকারের অলংকরণ সমৃদ্ধ করেছে এই সংকলনকে। ময়ূখ চৌধুরীর অলংকরণ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন স্বাগত দত্ত বর্মন।

প্রসঙ্গত, বাঘ শিকারের কাহিনি এই সংকলনের গরিষ্ঠ অংশে জুড়ে আছে। পশুরাজ সিংহ, কিন্তু বাঘ হল বনের রাজা, উপরন্তু ভারতের জাতীয় পশু। বাঘের হিংস্রতা, শক্তির পরিচয় শিকারিরা পেয়েছেন। প্রাণীতত্ত্ববিদরা বলছেন : বাঘের আদি নিবাস সাইবেরিয়া। আদি বাসস্থান থেকে দক্ষিণ অভিমুখে যেতে যেতে তারা ভারতে প্রবেশ করে ও এশিয়ার নানা দেশে তাঁদের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়।

BanglaBook.org

উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের দীর্ঘ অরণ্যে ও দক্ষিণে জল জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনে বাঘের অবস্থান। তরাই অঞ্চলে বাঘ ছাড়াও হাতি, গণ্ডার, চিতা, বাইসন, হরিণ ও ছোটো আকৃতির বহু বন্যপ্রাণীর বাস। দীর্ঘকাল ধরে শিকারের ফলে সব বন্যপ্রাণীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৭১ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর অতিথি সাহেবসুবোরা অসংখ্য বন্যজন্তু সংহার করেছিলেন, মহারাজার একারই রেকর্ড ছিল ৩৭০ টি বাঘ, ২০৮ টি গণ্ডার, ৪৩০ টি বাইসন ও ৩২৪ টি বারোশিঙা হরিণ শিকারের। মধ্যপ্রদেশের সরগুজার মহারাজা একাই ১১৫০ টি বাঘের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এখন সব বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব মারাত্মক কমে গিয়েছে। সরকারের চৈতন্যোদয়, The Wild Life (Protection) Act 1972 প্রণয়ন, পরবর্তীকালে বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা ও তা রক্ষার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা শুরুর আগেই অনেক পশুপক্ষী ভারতের বনাঞ্চল থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রায় একই পরিস্থিতি সারা বিশ্বেও। বনভূমি ধ্বংস করে জনপদের বিস্তার ও প্রয়োজন পড়লেই বন্যপ্রাণী হত্যা, কখনো তাদের মূল্যবান চামড়া, শিং, পালক, দাঁত ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করার জন্য মানুষের লোভের ফলে এদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকেই মুছে যেতে বসেছে। পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অবিন্যাসের ফলে ক্রমেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নানা বিচিত্র পশু, পাখি, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ। এভাবেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আমেরিকার লাল দৈত্য বাইসন, আফ্রিকার কালো ভাল্লুক, বালি দ্বীপের বাঘ, জাপানের ধূসর নেকড়ে, মরিশাসের ডোডো পাখি, নিউজিল্যান্ডের মোয়া পাখি, গ্যালপাগোসের বিশাল কচ্ছপ, দক্ষিণ আফ্রিকার লাল কৃষ্ণসার হরিণ ইত্যাদি ও আরও অনেক বিচিত্র প্রাণীকুল। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রয়াসে এই পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন হলেও চোরাশিকার, বন্যপ্রাণীর চোরাচালান আজও চলছে। কারণ নানা শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতে প্রাণীর দেহাংশ ব্যবহার বেআইনি হলেও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। আধুনিক কালের স্লোগান Shoot not with your gun but with your camera। বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত অভয়ারণ্যগুলি পর্যটন কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হচ্ছে।

বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী শিকার আজ অতীতক্রীড়ায় পর্যবসিত, আইনের চক্ষে নিষিদ্ধও বটে। শিকারকাহিনীগুলি এখন ইতিহাসের মতোই অতীতের নীরব সাক্ষী। কিন্তু তার প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বোধকরি যায়নি, যে কারণে আজও বিখ্যাত শিকারিদের অভিজ্ঞতালব্ধ রোমাঞ্চকর আখ্যানগুলি পাঠকের মনে শিহরন তোলে, এ ধরনের কাহিনির আকর্ষণ সব বয়সি পাঠকদের কাছে সমানভাবে বজায় রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য ছবি, বই ও তথ্য সরবরাহ করে যাঁরা বইটি নির্মাণে অশেষ সহযোগিতা করেছেন নিছক ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না।

একইসঙ্গে এই বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ যা দর্পণের মতো শিকারিদের অতীত স্মৃতিকে পাঠকদের সামনে প্রতিফলিত করবে। সংকলিত ফটোগ্রাফগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কাহিনির শেষে মূল্যবান কিছু পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে।

পরিশেষে জানাই, প্রথম সংস্করণটি সীমিত সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় বইটির মুদ্রিত মূল্য সকলের নাগালের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়নি। প্রকাশের প্রথম মাসেই প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় এই দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণের প্রয়াস। দ্বিতীয় সংস্করণে স্বল্পমূল্যের পেপার ব্যাক এবং হার্ডকভার সংস্করণ দুইই প্রকাশিত হল।

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালি শিকারী-লেখক

ভারতীয় রাজা ও ইংরেজ শাসকদের শিকার-ক্রীড়া

বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার মুহূর্ত

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
পেয়েও হারালাম ৪৯

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
অবিশ্বাস্য ৬৬

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে ৮২

প্রবোধকুমার সান্যাল
শিকারের সন্ধানে ৯৬

কুমুদনাথ চৌধুরী
নির্ভীক ১০৫

হীরালাল দাশগুপ্ত
শিকারীর ক্ষোভ ১১০

দুর্গাপ্রসাদ রায়
শিকারীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ১১৬

জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী
বিপর্যয় ১২১

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী
হাওদা শিকার ১২৮

কুমুদনাথ চৌধুরী
হাওদায় বসিয়া শিকার ১৩২

ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
শিকারের কথা ১৩৮

সুধাংশুকান্ত আচার্য
একদন্তের শেষ ১৫৬

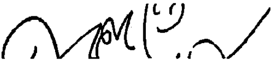

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
প্যান্থার ১৬৩

সুধাংশুকান্ত আচার্য
মাচা থেকে চিতা ও অন্যান্য ১৭২

আরণ্যক
জঙ্গলের ভ্রূকুটি ১৭৮

১৮৮ — অদিতিমোহন রায়
মহিষ

আর্য মুখোপাধ্যায়
বীভৎস — ১৯৬

২০০ — কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কুমীর শিকার

ধরণীধর সেন
হিমালয়ে ভল্লুক শিকার — ২০৮

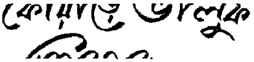

২২০ — বিজয়কান্ত সেন
কোয়াড়ে ভালুক শিকার

সূর্যকান্ত আচার্য
ভালুকের কবলে — ২২৭

২৩২ — হিতেন্দ্রমোহন বসু
বাজ-বহেরী

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
পদ্মায় পক্ষী শিকার — ২৪০

প রি শি ষ্ট
২৫৪ - ৩১৪

শিকারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

শিকার, শিকারী ও জীবজন্তু

বন্দুক, বন্দুকের প্রকার ও ব্যবহার

বাঙালির শিকারের আগ্নেয়াস্ত্র

ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প, ন্যাশনাল পার্ক ও স্যাংচুয়ারী

ভারতের বন্য প্রাণী

অবিভক্ত বাংলার বন্য প্রাণী

শিকারের পাখি

লেখক পরিচিতি

সহায়ক বাংলা পুস্তক তালিকা

বাঙালি শিকারী-লেখক

কুমুদনাথ চৌধুরী

সুধাংশুকান্ত আচার্য

ছবি সৌজন্য : অমিতাভ কারকুন

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

হীরালাল দাশগুপ্ত

জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী

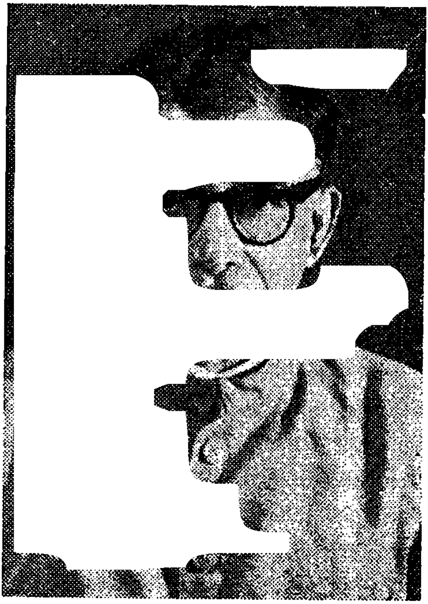

ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

অদিতিমোহন রায়

সূর্যকান্ত আচার্য

সুধাংশুকান্ত আচার্য (আসামের জঙ্গলে)

ভারতীয় রাজা ও ইংরেজ শাসকদের শিকার-ক্রীড়া

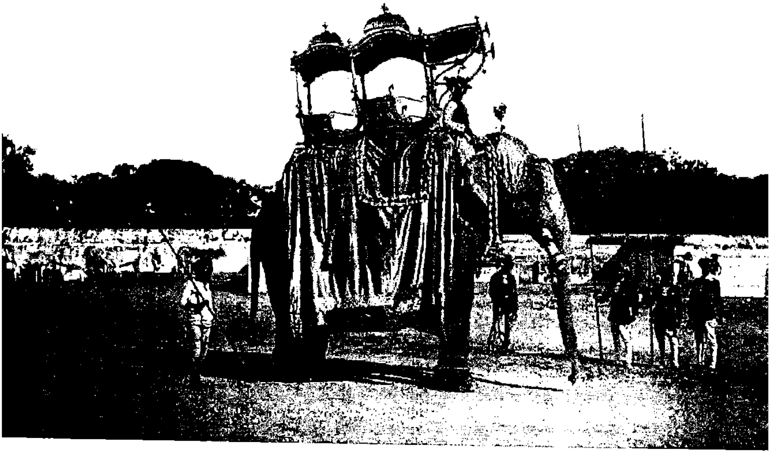

হাতির পিঠে হাওদা।

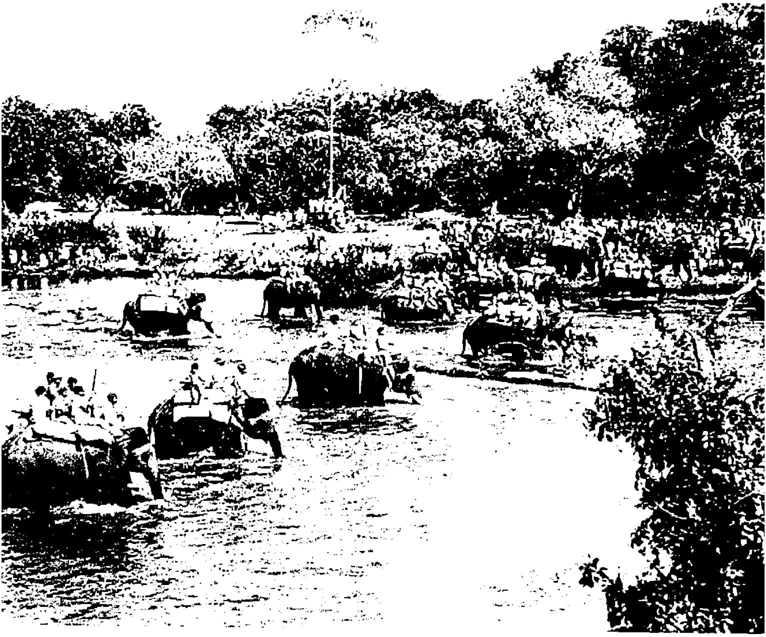

নদী পেরিয়ে জঙ্গল যাত্রা।

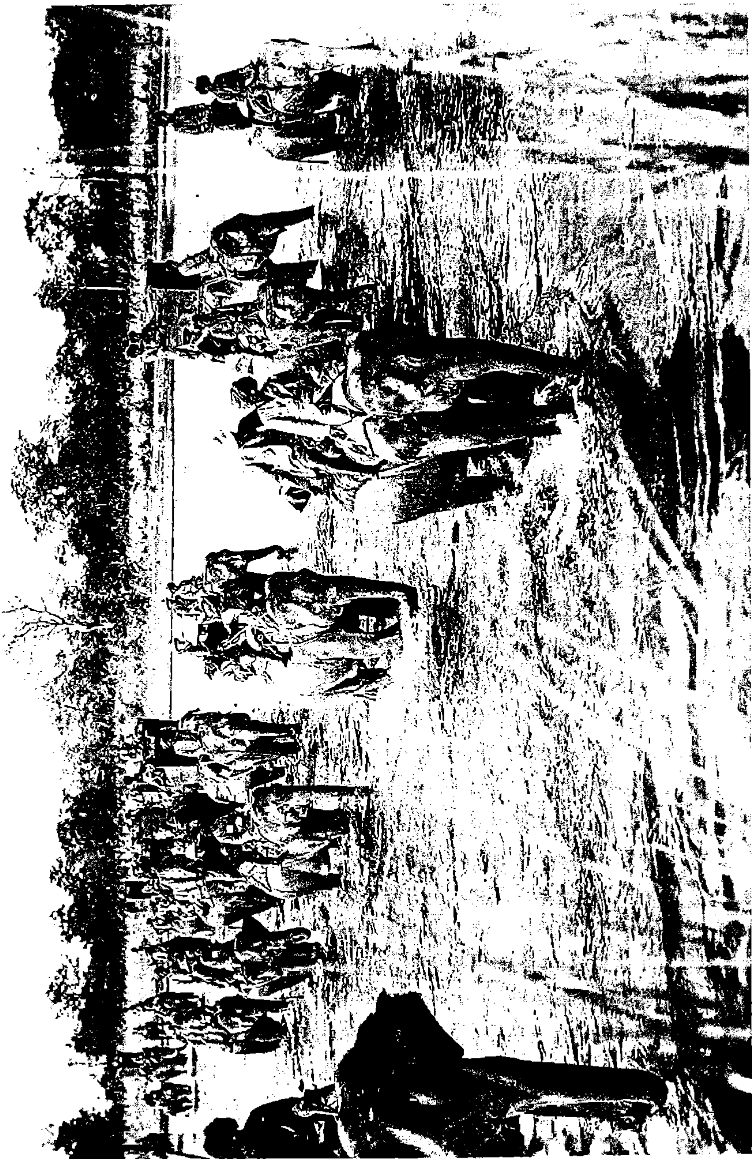

নদী পেরিয়ে জঙ্গল যাত্রা।

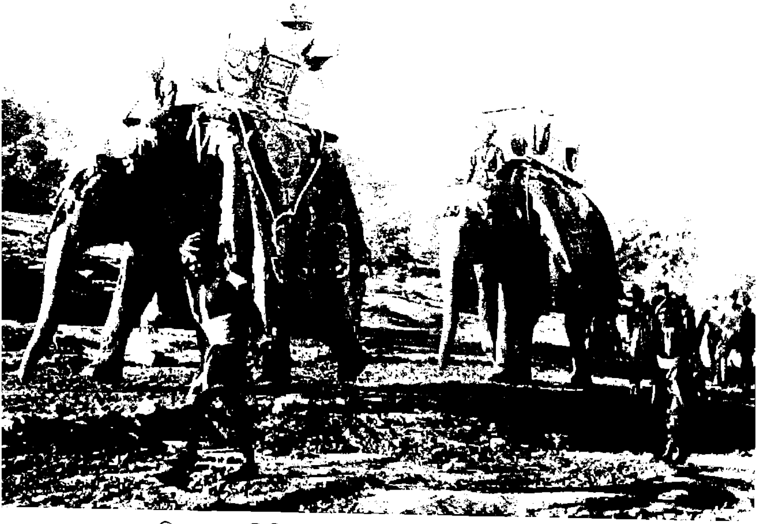

শিকারে প্রশিক্ষিত রাজকীয় হাতির শোভাযাত্রা।

শিকারের লাইন।

হাওদা থেকে শিকার করা বাঘ।

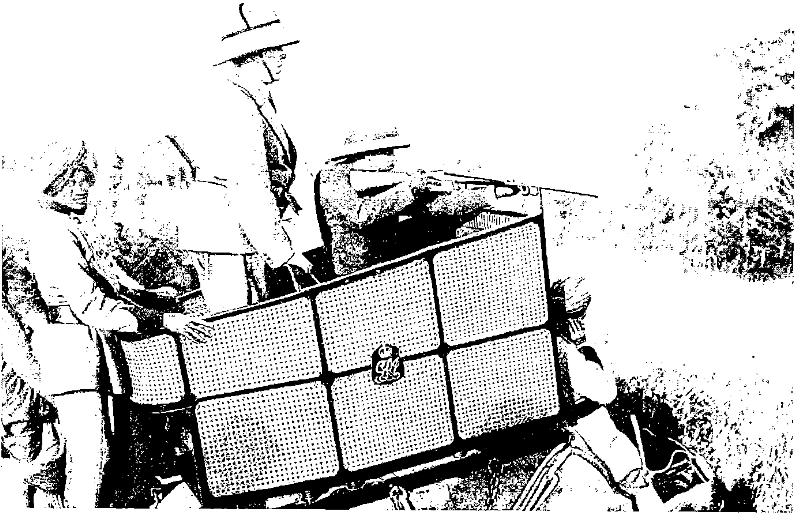

হাওদা থেকে বাঘ শিকার।

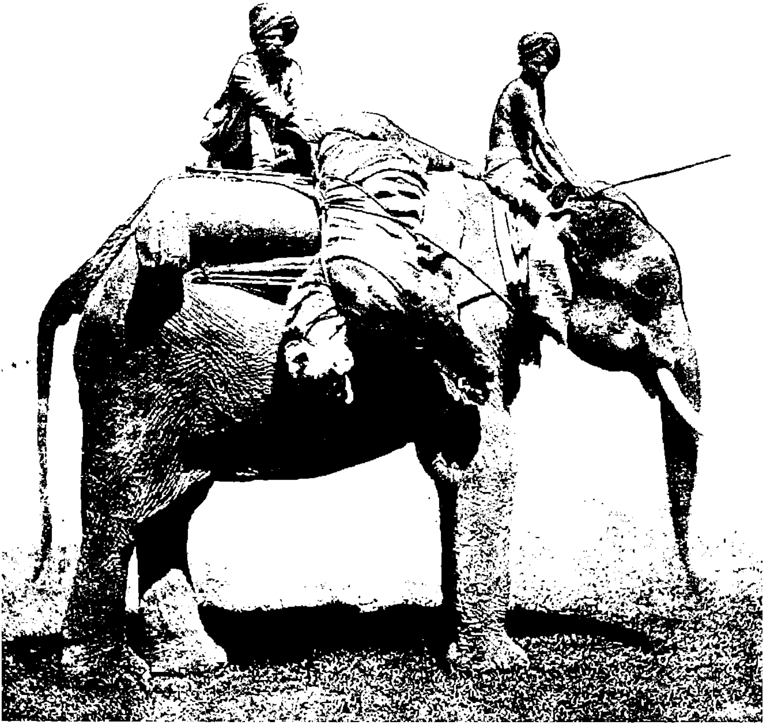

হাতির পিঠে বাহিত সুবিশাল আকৃতির নিহত বাঘ।

মৃত বাঘ নিয়ে প্রত্যাবর্তন।

শিকার ক্রীড়ায় নিহত অসহায় বাঘ।

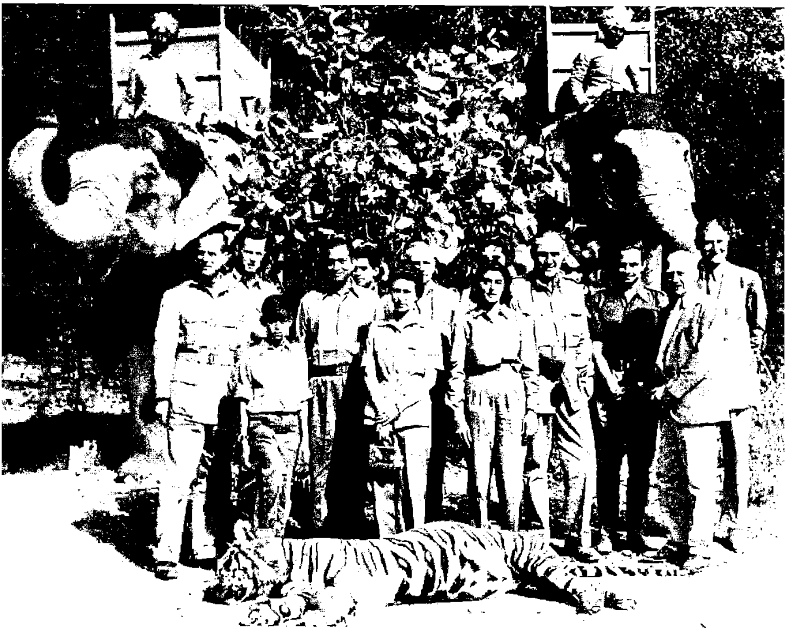

ভারতীয় রাজ পরিবার ও ব্রিটিশ শাসকের হাতে নিহত বাঘ।

রানি যখন শিকারী।

বাঘের পদচিহ্ন।

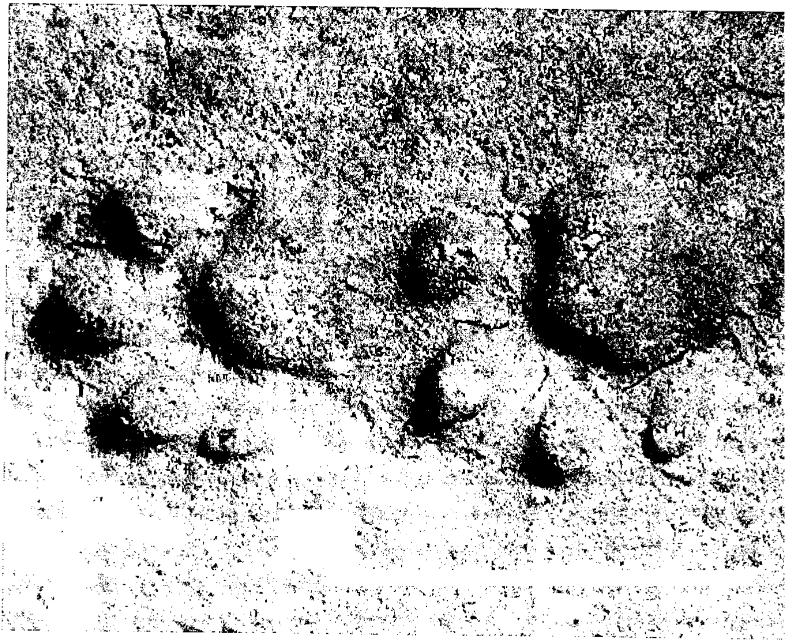

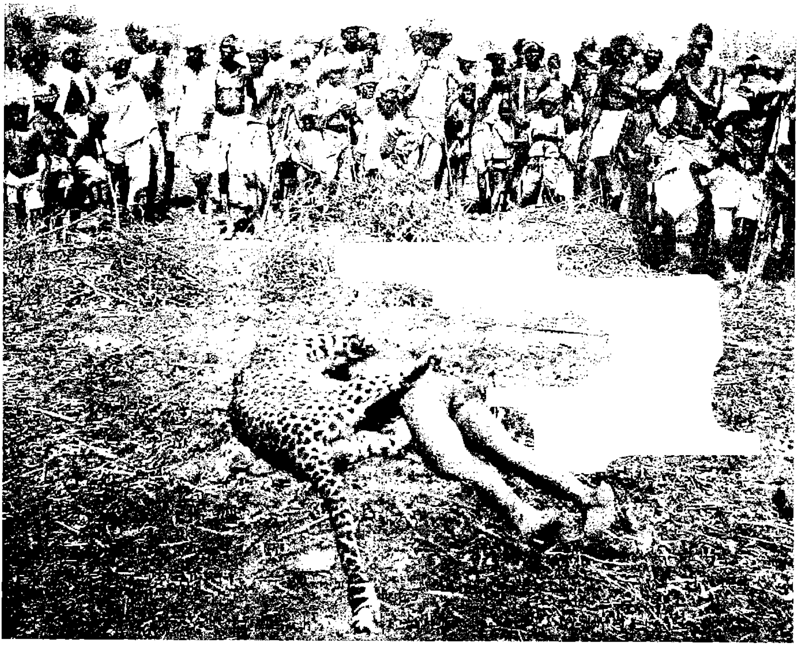

মড়ি খেতে আসা চিতার মৃত্যু শিকারীর হাতে।

জিম করবেটের হাতে নিহত মানুষখেকো, ১৯০৭

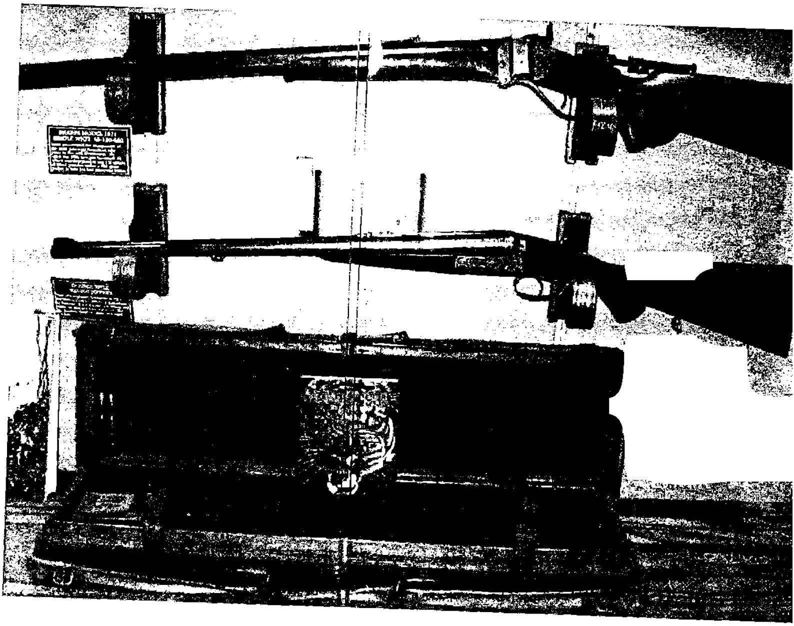

জিম করবেট ব্যবহৃত অস্ত্র সম্ভার।

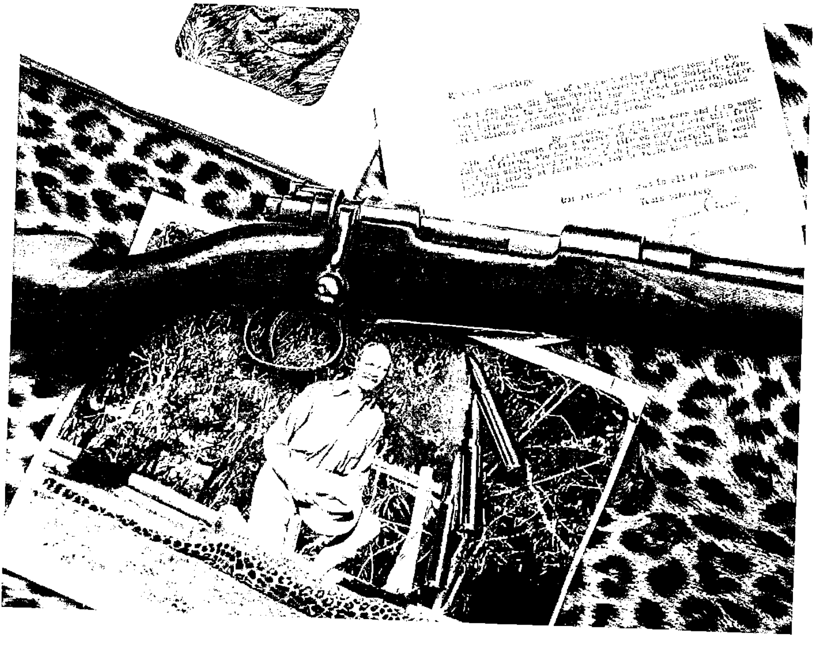

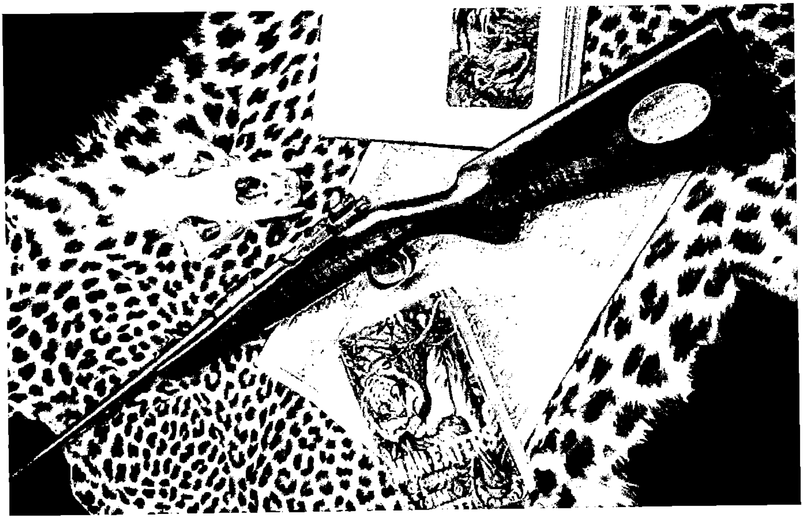

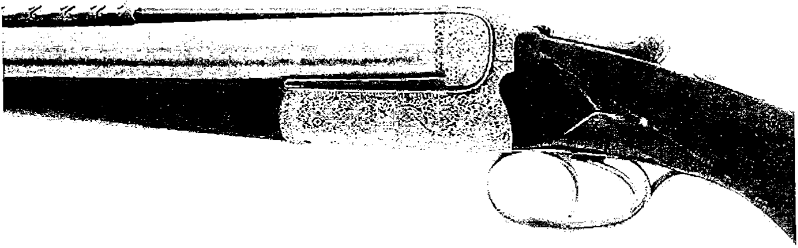

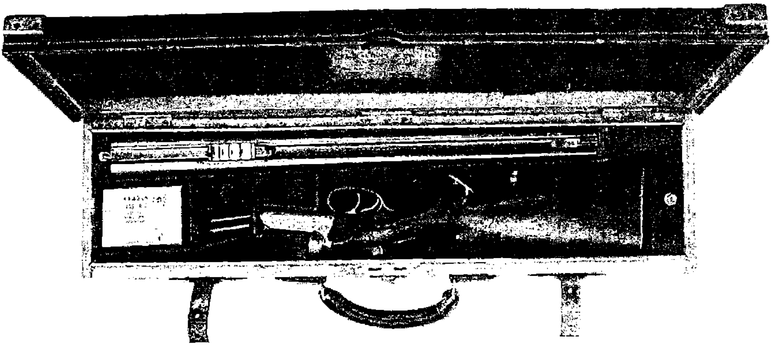

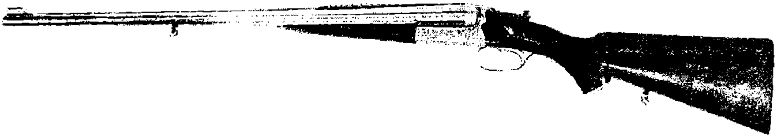

সস্ত্রীক শিকারী লর্ড কার্জন।

গ্রামের পথে নিহত বাঘ ও শিকারী।

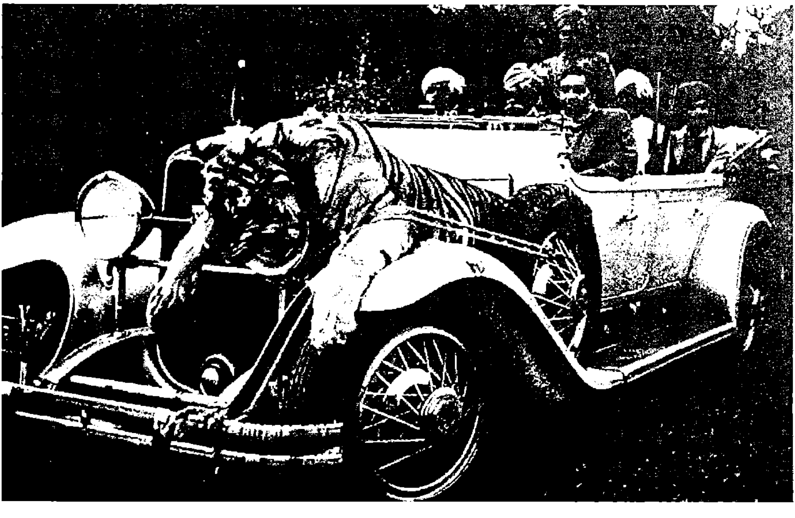

বিলাস বহুল রোলস্ রয়েজ্ গাড়ির বনেটে নিহত বাঘ।

শিকার ও শিকারী।

মহারাজা যখন শিকারী।

মৃত বাঘ ও গ্রামবাসী।

শিকারে প্রশিক্ষিত হাতি ও নিহত বাঘ।

বিলাসিতার শিকার ও রাজন্যবর্গ।

বাঘ নিধনের শেষে গ্রুপ ফটোগ্রাফ।

শিকার সহ গ্রুপ ফটোগ্রাফ।

ভারতীয় রাজা ও বিদেশী শাসকের হাতে নিহত বাঘ।

প্যান্থার ও শিকারী।

সস্ত্রীক শিকারী ও জোড়া বাঘ।

শিকারীর হাতে নিহত দুটি বাচ্চা সহ মা বাঘিনী।

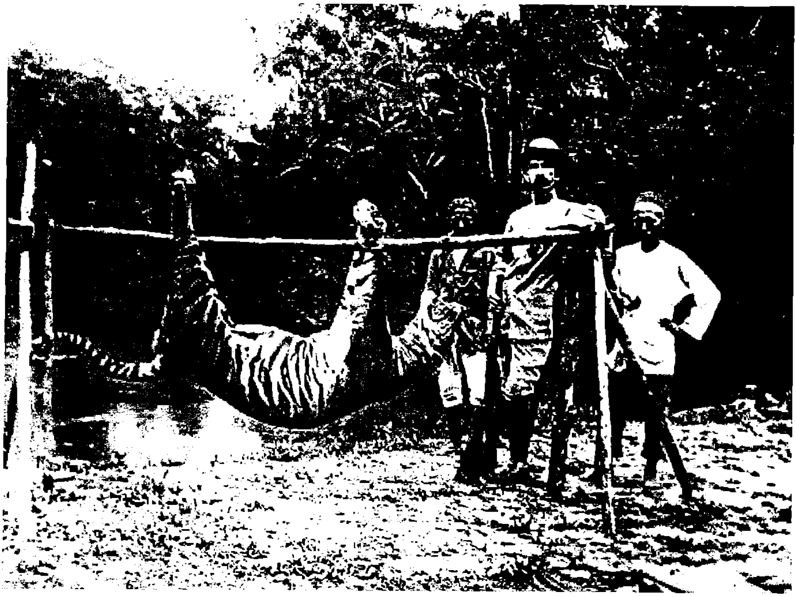

জলার ধারে সদ্য শিকার করে আনা বাঘ।

বন্য মহিষ ও শিকারী।

গ্রামবাসীর কাঁধে নিহত বাঘ।

শিকারের কাজে নিয়োজিত বিটারকে বাঘের আক্রমণ।

বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার মুহূর্ত

মহারাজ সুধাংশুকান্ত আচার্য ও সুবিশাল একদন্ত হাতি। সূত্র : আসামের জঙ্গলে।

সকন্যা সুধাংশুকান্ত আচার্য ও ওদালগুঁড়ির বাঘ। সূত্র : আসামের জঙ্গলে।

নিহত চৌশিঙ্গা হরিণ। সূত্র : ঝিলে জঙ্গলে শিকার, কুমুদ নাথ চৌধুরী, ১৯৪১।

১৯২৪ সালে গারো পাহাড়ে নিহত ১১′ - ৩″ উচ্চ অতিকায় হাতি। সূত্র : বনজঙ্গল ও শিকারের কথা।

মহারাজ সুধাংশুকান্ত আচার্য ও পুঁটিমারির পাগলা হাতি। সূত্র : আসামের জঙ্গলে।

মহারাজ সুধাংশুকান্ত আচার্য ও সম্বর হরিণ। সূত্র : আসামের জঙ্গলে।

মহারাজ সুধাংশুকান্ত আচার্য ও মানুষখেকো বাঘ। সূত্র আসামের জঙ্গলে।

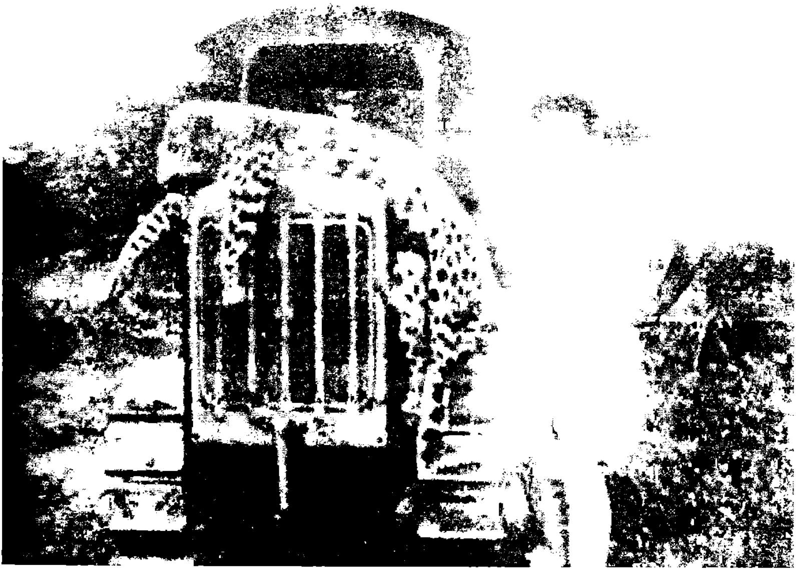

মহারাজ সুধাংশুকান্ত আচার্য ও ট্রাকটার থেকে শিকার করা চিতা। সূত্র আসামের জঙ্গলে।

শিকারের জন্য নির্মিত মাচা।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম— Tiger waiting come sharp.

বন্ধুবর মি. সিনহা তারবার্তা হাতে নিয়ে আমার দরজায় তারস্বরে হাঁক দিতেই বেরিয়ে এলাম।

—কী ব্যাপার? এত সিংহনাদ কী হেতু?

—চলুন শিকারে— ডাক পড়েছে।

টেলিগ্রামে চোখ বুলিয়ে চক্ষু চড়কগাছ!

বাঃ রে খবর! ব্যাঘ্র মহাশয় যেন লোক মারফত সংবাদ পাঠাইয়াছেন— আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, শিকারি মহাশয় অচিরাৎ আসিয়া আমার বক্ষ বিদীর্ণ করুন!

যত সব আজগুবি কথা। যাঁরা শিকারের অ অ ক খ জানেন তাঁরাই বলবেন, পাগল না মাথা খারাপ! আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। বাঘ ভালুকের কথা ছেড়েই দিলাম, একটা 'গেমবার্ড'ও মানুষের চাইতে বুদ্ধি কম রাখে না।

আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধু মি. হীরানন্দানী। জীবনে কখনো বন্দুক রাইফেলের স্পর্শসুখ পাননি তবে হ্যাঁ, শুটিং করেন ক্যামেরায়। তাঁর একান্ত ইচ্ছায় তাঁকে পথের সাথি করে নেওয়া হল। মস্ত বড়ো DeSoto Convertible car খানা নতুন কিনেছেন, বললেন— আমিই নিয়ে যাব।

প্রস্তুতির জন্যও কিছুটা সময়ের দরকার। প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সঙ্গে নিয়ে আমরা গৃহত্যাগ করলাম রাত তিনটেয়। চলেছি জিম করবেটের সেই কুমায়ুন রেঞ্জে— আহ্বানভেরি সেখানেই বেজে উঠেছে।

BanglaBook.org

মি. হীরানন্দানী গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, অর্থাৎ আমি, মি. সিনহা আর মি. হীরানন্দানী নৈশ অভিযানে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছি। সঙ্গে আছেন মিসেস সিনহা।

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার— মাঝে মাঝে স্টেশন পার হওয়ার সময় একটু আলোর ঝিকিমিকি— তার পরই আবার হারিয়ে যাওয়া। তবে মিসেস সিনহা গল্প আর হাসির বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন— আমাদের একঘেয়েমিটা দূর হল।

ভদ্রমহিলা কথা বলতে জানেন বটে! কথায় কথায় এত হিউমার!

ঠিক উষাক্ষণে বর্ধমান পৌঁছোলাম, তবে স্টেশনে নয়। পথের ধারে একটা গাছতলায় একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়ে সেদিকেই এগিয়ে যাই। এক বৃদ্ধ দম্পতি সেখানেই দোকান পেতেছে, নিশাচর ট্রাকড্রাইভার আর আমাদের মতো ভবঘুরেদের সামনে চা-এর ভাঁড় তুলে দিয়ে কিঞ্চিৎ রোজগারের আশায়। শুধু চা নয় টা-ও আছে। পুরি, জিলেপি আর potato in jacket অর্থাৎ খোসাসুদ্ধ আলুর চচ্চড়ি। সেখানেই নেমে পড়া গেল। কিছু গরম দুধ আমার জন্যে আর বন্ধু ও বন্ধুপত্নী ও মি. হীরানন্দানী রুটির সঙ্গে চা আর দোকানে যত রকমটা আছে, উদরস্থ করলেন। তারপর অবশ্য-প্রয়োজনে গাছের ছায়ায় কখনো কখনো থামা ছাড়া দালমিয়া নগরে পৌঁছোবার আগে আর 'নো হল্ট'।

তবে শোণ নদী পার হবার মুখে ছেদ টানতেই হল। তখন তো আর এখনকার মতো পুল ছিল না।

অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটি আশ্রয় চাই— তারপর উদরের প্রচণ্ড সমস্যা আছে কি না— খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কাজেই 'ব্যোম শংকর' বলে ঢুকে পড়লাম এক বাড়িতে, অর্ধপরিচিত। এক অবাঙালি পরিবার। ঘনিষ্ঠতা কোনোদিনই হয়নি।

বারান্তরে ঠিক এমনি অবস্থায় স্টেশনে দেখা হয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য এঁর অতিথি হয়েছিলাম, তবে দক্ষিণ হস্তের কোনো ব্যাপার ছিল না।

'দুটি অন্ন পাই, বাবা' বলে হাঁক দিতেই গৃহস্বামী ঘরের বাইরে এসেই হতবাক। আমাকে দেখে হাত দু-খানা এক করেই নমস্কার জানিয়ে বললেন :

—আঃ হাঃ, আইয়ে আইয়ে, কেয়া মেরি কিসমত।

আর কোনো কথাটি না বলে আমরা লক্ষ্মী ছেলের মতো সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ি। একটা খাটিয়ায় বসে খানিকটা জিরিয়ে স্নানপর্ব। ঠান্ডা জলে দেহ শান্ত হয়ে গেল— জঠরেও কিছু পড়ল, কিন্তু চাইলাম অন্ন পেলাম দাল রোটি— তার ওপরেও নির্ভেজাল নিরামিষ। একটুখানি আমড়ার চাটনি, চাটতে গেলেই চোট খেতে হয়। ইতিমধ্যে গৃহকর্তা সংবাদ আনিয়ে দিলেন মোটরখানা মালগাড়িতে পার করার ব্যবস্থা হয়েছে।

ব্যস— আর কী; পরস্পরে আমরা হেঁ হেঁ হুঁ হুঁর পালা চুকিয়ে বিদায় নিলাম।

বেলা তিনটা নাগাদ আমরা ডালমিয়া নগর ছেড়ে নদী পার হয়ে গেলাম। অনেকটা সময় লাগল। ওপারে ডিহিরি অন শোণ— সেখান থেকেই সোজা বেরেলির পথে। আর কোথাও থামতে হল না— আমরাও একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম— সন্ধ্যা প্রায় হয়ে

BanglaBook.org

এসেছে। মি. হীরানন্দানী এবার বেপরোয়া গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। বেরেলি পৌঁছোতে রাত আটটা। গন্তব্যস্থলটি ঠিক জানা না থাকায় একটু ঘোরাঘুরি করে খুঁজে বের করতে হল।

গৃহকর্তা মি. পি এন দে— পুরো নাম প্রেম নারায়ণ দে— আমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি রাখেননি। তিনি একা নন, মিসেস দে-ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, শিকার উপলক্ষ্যে তাঁদের কাছে আরও অতিথি এসেছেন সেজন্য তাঁরাও তৈরি।

আজকের দিন হলে কী হত বলা যায় না, একসঙ্গে চারজন অতিথি পেয়ে মিস্টার দে কিছুমাত্র বেসামাল হয়েছেন বলে মনে হল না। অবশ্য এ বিষয়ে ভারতের ঐতিহ্য আছে। দশ হাজার শিষ্য নিয়ে অতিথি হওয়াটা দুর্বাসা মুনি নিতান্ত স্বাভাবিকই মনে করেছিলেন।

যাই হোক, অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য প্রেম নারায়ণের ছুটোছুটি দেখে অন্তরীক্ষে স্বয়ং নারায়ণও বুঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, হায় রে, তাঁর জন্যে মানুষের এতটা আকুলিবিকুলি দেখা যায় না।

মিসেস সিনহা খুবই ক্লান্ত। মুখে স্বীকার করতে না চাইলেও মিসেস দে তাঁকে অন্দরে টেনে নিয়ে গেলেন। বাইরের বারান্দায় সাজানো সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে শিকারের আলোচনায় আমরা চারজন চতুর্মুখ হয়ে উঠলাম।

মি. দে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সম্প্রতি 'বন কেটে বসতি' প্রোগ্রাম নিয়ে সে-অঞ্চলে কাজ শুরু করেছেন। কুমায়ুন ডিস্ট্রিক্টেই তাঁর কাজ। কাজেই জিম করবেটের লীলা নিকেতনে বাঘ দেখা এবং ভাগ্যে থাকলে দু-একটা শিকার করার আশা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

মি. দে শিকারের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন— দিল্লি থেকে এসেছেন মি. ভটচারিয়া, পুরো সাহেবি কেতাদুরস্ত। একা নয়, সস্ত্রীক। সঙ্গে আছেন সদ্য বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূ। আরণ্য শোভার মধ্যে মধুচন্দ্রিমা যাপনের এমন সুযোগ তাঁরা ছাড়বেন কেন? স্থানীয় একজন শিকারি মি. অর্জন সিং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যাবে। পিলভিটের ডি এম মি. শিয়ালও আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন। এ ছাড়াও দে সাহেবের নিজস্ব লোকজন আমলা, গোমস্তা এবং অফিসারদের নিয়ে যে সফরি তৈরি হবে, তার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ জনের কম নয়। বিরাট ব্যাপার, এলাহি কারবার।

প্রথমটায় একটু ভড়কে গেলাম— কারণ, আমি সাধারণত বেশি লোকজন নিয়ে শিকারে যাওয়া পছন্দ করি না। সুযোগ বুঝে মিসেস সিনহাকে সেকথা বলতেই তিনি আশ্বাস দেন।

—মা ভৈষীঃ— বরযাত্রীদের নিয়ে হইচই করে বিয়ে করতে বর যখন যায় তখন একটা বিরাট কিছু হচ্ছে বলে মনে হয়। তারপর ছাঁদনাতলায় কিন্তু সেই বর ও বধূ আর সবই নস্যাৎ। শিকারে যাচ্ছে সবাই কিন্তু সে শুধু আসর জমাতে— আসল খেলা জমবে শিকারি আর বাঘের মধ্যে— সেসময় আপনি আর আমাকেও চিনতে পারবেন না।

মি. দে আরও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এদিকে ওদিকে যেসব রাজা মহারাজ, নবাব বাদশা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে গুটি পনেরো হাতি সংগ্রহ হয়েছে। এগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে, জিপ 'ওয়েপন ক্যারিয়ার' ইত্যাদি চড়ে খুব

BanglaBook.org

ভোরেই আমাদের ক্যারভান রওনা হল। আগে থেকেই জঙ্গলে লোকজন, তাঁবু ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জিপ গাড়িতে আমার দু-পাশে মি. ও মিসেস সিনহা আর ড্রাইভারের পাশে 'সিট' জুড়ে বসে আছেন মি. হীরানন্দানী।

মিসেস সিনহা বেণি দুলিয়ে বলে ওঠেন :

—কী মজা জ্যান্ত বাঘ দেখব—

আমিও মজা পেয়ে গেলাম:

—তবে কি মরা বাঘ দেখতে এসেছেন?

মি. সিনহা শাবাশ দিলেন :

—যথার্থ— বাঘ শিকারের পরই তো লোকে হুল্লোড় করে দেখতে আসে।

মিসেস সিনহা তাঁর বল্লভকে আসন থেকেই শাসন করেন :

—কিন্তু মশাই, আমি সে-দলের নই, বুঝলেন?

দুজনের মাঝখানে আমি, অতএব মধ্যস্থতা করে দিলাম :

—না বুঝে উপায় কী? স্বয়ং সিংহকেই যখন বশে রেখেছেন!

হঠাৎ ঝিরঝির করে বয়ে যাওয়া একটি ছোট্ট পাহাড়ি নদীর মুখে আমাদের বিরাট দল থেমে গেল।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখি দুটো বাঘ খেলায় মত্ত— সঙ্গে আরও দুটি বাচ্চা। এ-রকম দৃশ্য

লালগোলার কাছে থাবাড়ের জঙ্গলে আগেও চাক্ষুষ দেখেছি। মিসেস সিনহা চিৎকার করে উঠলেন :

—মারো, মারো—

শিকারি অর্জন সিং আপত্তি জানায় :

—সে হয় না, এখন ফায়ার করলে, বনের শের চমকে যাবে।

অবাধ্য বন্দুক আমার হাতে আপনিই উঠে গিয়েছিল। কেন যে সে নেমে গেল, ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

ভারি মজার যুক্তি দেখছি! এরা কি তবে গুলবাগিচার বাঘ? মারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ?

মনটা খিঁচড়ে গেল।

এ কী, হাতের পাঁচ, পেয়েও ছেড়ে দিলাম!

শুনেছি দশচক্রে ভগবান ভূত হয়!

ধীরে ধীরে নদী পার হয়ে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পে পৌঁছোলাম।

ক্যাম্পের আয়োজনও বিরাট। ম্যানেজমেন্টের ভার যাঁর ওপরে ছিল, তিনি আগে থেকেই লোকলশকর নিয়ে হাজির। আমাদের আরামের সব ব্যবস্থাই তিনি করে রেখেছিলেন— ব্যারামকে দু-হাতে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে।

শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে গুটি পঞ্চাশেক তাঁবু পড়েছে। ছোটো, বড়ো, মাঝারি, সব সাইজের। প্রত্যেক তাঁবুর সঙ্গে একটা করে ল্যাভেটরি। মাঝখানে একটি বেশ বড়ো তাঁবু— তাতেই খাওয়া, বসা, গল্প করা। আমোদপ্রমোদের অঙ্গ হিসেবে গোটা তিনেক রেডিয়ো, পোর্টেবল গ্রামোফোন, ইলেকট্রিকের জন্য জেনারেটার, আবার পাঁচ ছ-টি পেট্রোম্যাক্সও জ্বলবে সারারাত। প্রত্যেক তাঁবুতে কেরোসিন আলো, চারপাই, ছোটো টেবিল ও ভাঁজ করা চেয়ার। বিছানার ব্যবস্থা যতটা আরামদায়ক সম্ভব, তা ম্যানেজ করা হয়েছিল। গদি, বালিশ ও চাদর আর একটি করে ইটালিয়ান রাগ।

খাওয়াদাওয়ার পালা চুকে যেতেই আমরা ক-জন গোলটেবিলে বসলাম। আলাপ-আলোচনায় স্থির হল মি. সিনহা আর আমি শিকারি অর্জন সিংকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন ভোরেই বের হব— শিকার করার জায়গাগুলো বাছাই করতে হবে।

অতঃপর যে যার তাঁবুতে চলে গেল। পরদিন শিকারে যাবার তাগাদা নেই, কাজেই আপাতত নিশ্চিন্ত।

ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটু এদিক-ওদিক পায়চারি শুরু করতেই মি. সিনহার সঙ্গে দেখা— মিসেস সিনহা তখন সুখশয্যা ত্যাগ করেননি, মি. হীরানন্দানী প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যালোকের ঝিকিমিকি গাছের পাতায় চমক এনে দিলে। ততক্ষণে সমস্ত জঙ্গল জেগে উঠেছে। মাঝখানের বড়ো তাঁবুতে সবাই জমায়েত হলাম— সবার হাতেই এক কাপ করে চা, অবশ্য আমি বাদে।

মি. সিনহা আর আমি দুজনেই তৈরি। অর্জন সিং-এর হাতে তার নিজস্ব বন্দুক। আমি আর মি. সিনহা Holland & Holland 405 ও 500 নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হাতির পিঠেই জঙ্গলটা ঘুরে ফিরে দেখে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। মি. দে আর মি. ভটচারিয়া খোশগল্প ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। আলোচনায় ঠিক হল যে main জঙ্গলে যেখানে বাঘ আছে, সেখানে এত লম্বা আর ঘন ঘাসের বন যে তার ভেতর দিয়ে নাকা

BanglaBook.org

(বাঘের যাওয়া-আসার পথ) করতে হবে, হাতি দিয়ে মাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। অতএব অর্জন সিংকে নির্দেশ দিতেই সে গোটা তিনেক হাতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরাও কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলাম। আমাদের সঙ্গে যে চারজন মহিলা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মিসেস সিনহাই শিকারে সক্রিয় অংশ নিতে এগিয়ে এলেন। তাঁর প্রস্তাবটা অভিনব— তিনি 'বিটার'দের সঙ্গেই থাকবেন। উদ্দেশ্য— শিকারের 'থ্রিল'টা পুরোমাত্রায় পান করতে চান।

বিশেষ হাওদাওয়ালা গোটা চারেক হাতি ছিল। বাকিগুলোয় মাত্র একটা করে মামুলি গদি দড়ি দিয়ে হাতির ওপরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

একটা হাতির ওপর মি. ভটচারিয়ার পুত্র ও পুত্রবধূ উঠলেন। একটায় মি. দে ও মি. ভটচারিয়া, আর একটায় মি. শিয়াল ও মি. হীরানন্দানী। আমি আর মি. সিনহা একটা দাঁতাল হাতি বেছে নিলাম।

প্রথম দিন। সকালে কিঞ্চিৎ ব্রেকফাস্ট নিয়ে আমরা রওনা হলাম ব্যাঘ্র সন্দর্শনে। মাঠের রাস্তা পার হয়ে বাবলা গাছের সারি— মাঝে মাঝে দু-চারটে শিশু গাছ। বিটারের দল বাঘ তাড়িয়ে আনবে— মশাল জ্বালিয়ে, পটকা ফাটাতে ফাটাতে আর হইহুল্লোড় করে বনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করাই তাদের কাজ।

ভি আই পি শিকারিদের মধ্যে আমি আর মি. সিনহা কলকাতা থেকে আর মি. ভটচারিয়া দিল্লি থেকে। মি. দে আর মি. শিয়াল স্থানীয় ধুরন্ধর।

একটা বিরাট শিশু গাছের নীচে আমাদের দল এসে থামল। যেন এক যুদ্ধজয়ে আমরা চলেছি— এইভাবে সকলের 'পজিশন' ঠিক করে দিয়ে মি. দে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সেদিন তিনিই দলপতি। সহকারী হিসেবে রইলাম আমি আর মি. সিনহা। মি. ভটচারিয়া অর্জন সিং আধখানা চাঁদের মতো সাজানো অশ্বাক্ষুরাকৃতি শিকার-ব্যূহের মধ্যে সুবিধামতো কোণ বেছে নিলেন। মুখে রইলেন মি. শিয়াল আর একজন শিকারি। মহিলা দুজনকে নিরাপদ স্থানে বসিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর বিটারদের কাজ।

সে এক মহা হইচই ব্যাপার। মিসেস সিনহা ভয়ানকভাবে উৎসাহী। হাতির ওপর দড়ি ধরে সামনে পেছনে দুলছেন। মুখে কিন্তু হাসিটুকু লেগেই আছে।

বিটারের দল মশাল জ্বালিয়ে বিচিত্র চিৎকারে জঙ্গল কাঁপিয়ে তুলল। তার সঙ্গে শোনা যায় মাহুতগুলোর অনর্গল অশ্রাব্য দুর্বোধ্য ভাষায় হাতির সঙ্গে আলাপচারি। এইভাবে যখন বিটারের দল সেই ঘাসের মধ্যে হাতি দিয়ে মাড়ানো নাকার কাছাকাছি— হঠাৎ শুঁড় উঠিয়ে সবগুলো হাতি গুরগুর আওয়াজ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গেই গোঁ গোঁ শব্দ। একটা বেশ বড়ো বাঘ অপূর্ব ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে একপাশ থেকে জঙ্গলের আর একপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা একটা গাছের তলে সমবেত হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হালকা ধরনের কিছু খেয়ে নিলাম। মিসেস সিনহা অমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তা ছাড়া বিটারদের আর প্রয়োজনও ছিল না। অনাবশ্যক কতকগুলো আনাড়ি লোক সঙ্গে রাখাও বিপজ্জনক— কাজেই তাদের বিদায় দিয়ে কয়েকটা গাছে সারি সারি কয়েকটা খাটিয়া বেঁধেও দেওয়া

BanglaBook.org

হল। মেয়েদের সেইসব খাটিয়ায় উঠিয়ে দিয়ে সেই চোদ্দো পনেরোটা হাতিকে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করা হল। হাতিগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকবে— তার মধ্য দিয়ে একটা সূঁচও গলবে না। মিসেস সিনহা একটা বন্দুক নিয়ে, গাছের ডালে-বাঁধা খাটিয়ায় সমাসীন হয়ে পুলকে ডগমগ— হাসিতে ফেটে পড়েন আর কি! তাঁর সঙ্গে থাকলেন মি. দে— তিনি মাননীয়া অতিথিকে একলা ছেড়ে যেতে চান না। তাঁর হাতেও একটি রাইফেল।

হাতিগুলো অর্ধচন্দ্রাকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল— অরণ্যের অন্তঃপুরের দিকেই তাদের গতি! খানিক পরে আমরা জঙ্গলের মধ্যে ডুবে গেলাম। আমরা তিনজন যে হাতিটায় ছিলাম— সেটা একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি— তার দাঁত দুটোর ডগা সোনা দিয়ে বাঁধানো। গলায় সুন্দর বাহার-দেওয়া একটি মালা— প্রকাণ্ড কপালে জয়তিলক আঁকা। মাহুতের মুখেই শোনা গেল— এখানকার পর্ব শেষ হলেই হাতিটা চলে যাবে দূরদেশে বরাত নিয়ে। বিয়ের গল্পটাই বুঝি ফেঁদে বসে, এই আশঙ্কায় তাকে নিরস্ত করে আমরা এদিক-ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি চালাচ্ছি। কারণ বেলা আর নেই— বনে জঙ্গলে সন্ধ্যা একটু আগেই শুরু হয়ে যায়। নিতান্তপক্ষে গোধূলি লগ্নেও যদি ব্যাঘ্র মহারাজের সাক্ষাৎ মেলে, তাহলেই তার ললাটে তিলক পরিয়ে দেওয়া সম্ভব।

কিছুটা এগিয়ে একটা জলাভূমিতে ঢুকতেই আমাদের সেই হস্তীব্যূহ হঠাৎ একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে গেল— সঙ্গেসঙ্গেই বন কাঁপানো এক বিরাট গর্জন। হাতিগুলো যেন মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালাতে চায়— মাহুতরা দুর্বোধ্য ভাষায় তাদের অজস্র গালিগালাজ চালায়— অঙ্কুশ দিয়ে মাথায় আঘাত করে— কিন্তু তারা বেপরোয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ডোরাকাটা জানোয়ার লাফিয়ে আমাদের হাতিটার থুতনির নীচে কামড়ে ধরল। হাতি জানোয়ারটাকে চোখে দেখতে পেলেও তার পক্ষে শুঁড় দোলানো আর কান ঝাপটানো ছাড়া আর কিছুই করার উপায় ছিল না। বাঘ তার টুঁটি কামড়ে ঝুলছে আর হাতিরও প্রাণপণ চিৎকার। মি. সিনহা রাইফেল বাগিয়ে একবার এদিকে ধরছেন, আবার ওদিকে তাক করছেন— কিন্তু গুলি করার উপায় নাই। এত দুলছে যে বাঘকে aim করা যাচ্ছে না; আমার অবস্থাও তদ্রূপ— হঠাৎ হাতির গায়ে বা মাহুতের গায়েও লাগতে পারে। এই প্রাণান্তকর দোলায় শেষ পর্যন্ত গুলির থলিটাও সেই জলামাটিতে পড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত বাঘটাকে ঝটকা মেরে ফেলে দেওয়া গেল না দেখে হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে বাঘকে ধরার চেষ্টা করলে— সেইসঙ্গে এক প্রবল ঝাঁকানি। হয়তো চোখে মাটি জল কিছু পড়েছিল— তাতেই বেসামাল হয়ে ব্যাঘ্র বাবাজি জঙ্গলপূর্ণ জলাভূমিতে গড়িয়ে পড়লেন আর সেই অর্ধক্ষিপ্ত হস্তীপ্রবর তার প্রকাণ্ড দুটো দাঁত দিয়ে বাঘকে জলাভূমির মধ্যে ঠেসে ধরার চেষ্টা করতেই পিছলে গিয়ে বাঘটা কোথায় যে অন্তর্ধান করলে আর নো পাত্তা। অন্যান্য হাতিগুলো আগেই কে কোথায় পালিয়েছিল, তারা ক্রমে ফিরে এল— আমরাও ফিরে চললাম। ব্যাঘ্রপুঙ্গব যে বিরাট লাফ দিয়ে হাতির টুঁটি কামড়ে ধরেছিল— তার পরিবর্তে সে যদি হাওদার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে এক্সপার্ট

BanglaBook.org

শিকারি অর্জন সিং সমেত কলকাতাওয়ালা আমাদের দুজনেরই হাড়গোড় চুরমার করে 'বডি'র 'জিয়োগ্রাফি'ই বদলে দিত।

আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সন্ধের আগেই আর সবাই নিরাপদে সেখানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মিসেস সিনহাও বাদ যাননি! ফিরে দেখি মিসেস সিনহা ঘরবার করছেন।

জিজ্ঞেস করি :

—কী, স্বামী মশাইকে খুঁজে খুঁজে চোখে সর্ষপ পুষ্প দেখছেন কি?

দেখলাম কোনো উত্তর দেবার মতো অবস্থা তাঁর নেই।

মি. সিনহা বেশ গুছিয়ে বলতে জানেন। সব ঘটনাটা যখন বলছিলেন— কখনো তাঁর চোখ দুটো কপালে উঠে গেল— কখনো-বা হাত দুটো পিঠের পেছনে হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে সেই ব্যাঘ্র-সন্দর্ভ তিনি ফলাও করে বলে গেলেন।

মিসেস দে ভয়ে দু-চোখ বুজে 'মাগো রক্ষা করো' বলে দু-হাত কপালে ঠেকালেন। মি. ভটচারিয়া বলে উঠলেন— 'বাই জোভ— আজ একটা দারুণ ফাঁড়া কেটে গেল।' মি. শিয়াল একটু দেঁতো হাসি হেসে হাকিমি মেজাজে বললেন— 'আই সি!' মিসেস সিনহা কেমন যেন বিহ্বল— আমার দিকে চেয়ে একটিমাত্র আওয়াজ দিলেন :

—বাঘটা কোথায়?

—শ্বশুরবাড়ি ভাগল বা—

আমাদের মনের এই দুরবস্থার প্রেমনারায়ণ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখালেন :

—এমন কাছে পেয়েও গুলি করতে পারলে না? ভেরি সরি।

জবাব দিতেই হল :

—প্রেমনারায়ণবাবু,

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন মনের আকাশ ছেয়ে দিলে
এমন বাক্যবাণে।

রাত্রি গভীর।

নিদ নাহি আঁখি পাতে।

শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবি— মানুষ যে জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে! আজই তো একটা অঘটন কিছু হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কানে এল ঘুঙুরের আওয়াজ!

এদিকে মৃত্যুর হাতছানি— ওদিকে জীবনের আহ্বান।

আমার তাঁবুতেই, পাশের ক্যাম্পখাটে মি. হীরানন্দানী লম্বমান। তাঁর ভুঁড়িতে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে বলি :

—উর্বশী নৃত্য, শুনতে পাচ্ছেন?

হীরানন্দানী কানে একটু খাটো, তাই দু-হাতে দু-কানের পাতা মুড়ে শুনবার প্রয়াস পেলেন— তারপর মুখের হাসিকে কান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললেন :

—উলোক হনিমুন মে আয়া না— উসিসে নাচ লাগায়া। ছোড়িয়ে উ সব বাত আব নিদ যাইয়ে— কাল শিকার, ইয়াদ রাখিয়ে—

হীরানন্দানী আমাকে নিদ্রা দেওয়ার উপদেশ দিলেন বটে, নিজেই কিন্তু কর্ণে খাটো হয়েও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতেই পায়চারি— নেচে ফেলেন আর কি।

এমন সময় ওদিককার নৃত্য থেমে গেল। শুরু হল প্রাণ ঢেলে দেওয়া আবেগময় সংগীত। কথার সঙ্গে যেন সুরের বিয়ে। সুর যেন কথাকে রূপ দিয়ে কণ্ঠে উছলে পড়ছে।

BanglaBook.org

ক্রমে সেই সুরগুলি যেন আরও উপরে উঠে কোন মহাশক্তির চরণ ছুঁয়ে থেমে গেল।

আর এদিকে শুরু হল আমাদের হীরানন্দানীর আবেগহীন, ব্যাকরণ অশুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠের কালোয়াতি। যেন সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়ে দেয়।

এবার আমিই তাঁকে উলটে উপদেশ দিলাম :

—ইয়াদ রাখিয়ে— কাল শিকার হ্যায়!

তিনি বিনা বাক্যবায়ে দ-এর মতো শুয়ে পড়লেন।

হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকতেই, কীরকম গন্ধ পেয়ে বিছানায় উঠে বসি। রাত্রে তাঁবুর বাইরে যাওয়া নিষেধ— কাজেই চুপ করে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সকাল হতেই সন্দেহভঞ্জন হয়ে গেল। জানোয়ার সত্যিই এসেছিল! ‘বেট’ হিসেবে জোগাড় করা চারটে মোষের বাচ্চার একটিকে তুলে নিয়ে চম্পট।

BanglaBook.org

সুতরাং আবার শিকারের তোড়জোড়। এবার আর কেউ যাবে না। মি. সিনহা, শিকারি অর্জন সিং আর আমি একটা হাতিতে। মি. দে আরেকটা হাতির ওপর, সঙ্গে দু-তিন জন। জলার ধারে দুটো গাছে দুটো মাচা বেঁধে আমরা বন্দুক নিয়ে উঠে পড়লাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বেলা একটা নাগাদ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল— প্রভু তখন সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে জলাভূমিটা পার হবার চেষ্টায় ছিলেন। আমাদের

রেঞ্জের মধ্যেই। এমন সময় মি. সিনহা বন্দুক তুলেই ধাঁ করে এক গুলি— পর পর দু-বার। বাঘটা মুখ থুবড়ে জলের মধ্যে পড়ে গেল।

তারপরই শুরু হল আকাশ ফাটানো চিৎকার :

—শের মিল গ্যয়া— শের মিল গ্যয়া—

লোকজন মিলে গাছে বাঁধা মাচা জলে ভাসিয়ে বাঘটাকে তুলে আনা হল।

পরীক্ষা করে দেখলাম— বাঘের কপালে একটিমাত্র আঘাতের চিহ্ন। তাহলে গুলি একটাই লেগেছে— আর তাতেই কুপোকাত।

হাতির ওপর বাঘটাকে তুলে নিয়ে আমরা গজেন্দ্রগমনে ফিরে চলেছি। মি. সিনহার মুখে তৃপ্তির হাসি।

আমার মনেও তখন রং-এর নেশা— বাঘের তাজা রক্ত দেখে চোখেও যেন তারই ছোপ লেগেছে। বন্দুকটা বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে মি. সিনহাকে বলি :

—জলার মধ্যে ঢুকে পড়া বাঘটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

শিকারি অর্জন সিংকে নির্দেশ দিতেই সে মাহুতকে চালিয়ে দিতে বললে। ঘাসের জঙ্গলের কাছাকাছি হতেই সেই জলাভূমির এক প্রান্তে লম্বা ঘাসের মধ্যে আলোড়ন আর সঙ্গেসঙ্গেই বিদ্যুদ্‌বেগে ডোরাকাটা বাঘ ছুটে বেরিয়ে যেতেই আমার বন্দুক গর্জে উঠল— বাঘটা টাল খেয়েই সেই জঙ্গল ভেদ করে বিরাট লাফ। একরাশ ধোঁয়ার মতো চোখের সামনে দিয়ে উধাও। দ্বিতীয় গুলির অবসরও পেলাম না বা আর কোনো বাঘের টিকিও দেখা গেল না।

ফেরার পথে আমার বিমর্ষ ভাব দেখে মি. সিনহা আমাকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললেন :

—আপনি দেখে নেবেন, বাঘটা চোট খেয়েছে— নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

—এটা নিছক অনুমান। অনেক সময় মারাত্মক আঘাত না পেলে, বাঘ যদি বহুদূর পালিয়েও যায়, বেশ কিছুদিন পরে হয়তো তার ক্ষতস্থান পচে ওঠে, আর তাতেই সে অক্কা পায়। এও দেখা গেছে, জখমি বাঘ চেটে চেটেই তার ঘা সারিয়ে তোলে— আবার বহাল তবিয়তে তার অবাধ রাজত্ব চালায়। এ-রকম বাঘ আমি পেয়েছি। তবে, এটার আশা আমি আর করি না।

সিংহগরবে গরবিনী মিসেস সিনহার প্রাণে স্ফূর্তির জোয়ার— কণ্ঠে হাসির তরল তুফান— কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘুরে ফিরে একটা 'রানি দুর্গাবতী নাচ'-এর ভঙ্গি দেখিয়ে দিলেন।

সিংহদন্তও আজ আর ঢাকা পড়তে চায় না— খুশির দাপটে, আলিবাবা নাটকের আবদাল্লার নাচের 'পোজ' দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যে কোথায় লাগে ন্যাপা বোস!

মিসেস দে-র মুখে এক ঝলক হাসি :

—মিষ্টি মানুষের মিষ্টি বউ।

মি. দে পোঁ বাজিয়ে দিলেন :

—দুটিতে চমৎকার জুটি।

—এবার আমার ছুটি করে দিন।

বলেই আমি উঠে পড়লাম। হাতজোড় করে মি. সিনহাকে বলি :

—আপনারা ট্রফি পেলেন। এবার রানার্স-আপ-এর মেডেলটা পেলেই বাড়ি চলে যাই।

পরদিন ভোরেই ক্যাম্পে বেশ শোরগোল লক্ষ করলাম। কী ব্যাপার? —না, আকাশে শকুন উড়ছে কিনা, তাই নিরীক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

লোকের ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল— একটা শকুনেরও দেখা নেই। সেদিন তো গেলই— পরের দিনও কোনো শকুনকে উড়তে দেখা গেল না। গুলিখাওয়া বাঘ তেমন জখম না হলে অনেক সময় অনেক মাইল দূরে চলে যায়— পাত্তা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরাও এদিকে ওদিকে সম্ভাব্য সব জায়গাতেই খুঁজে দেখি। আশ্চর্য, এই দু-দিনের মধ্যে আর দ্বিতীয় বাঘের সন্ধান নেই। যেন, সবগুলো বাঘই ধর্মঘট করে একযোগে চম্পট দিয়েছে।

নেহাত গ্রহের ফের! নইলে, দু-দু-বার পেয়েও হারালাম!

বিশ্বাস

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

খোশগল্পের মাঝে জঙ্গলের কথা উঠতেই মুখুজ্জে বলতে লাগলেন : গত বৎসরের ঘটনা, কোয়ামবোটর থেকে তার এল, 'এখুনি রওনা হও, তিনটে মানুষকে বাঘে নিয়েছে।'

মুখুজ্জে মশাইয়ের শিকারকাহিনি মানে সত্যি খাঁটি ঘটনা। আমরা গুছিয়ে বসলাম,

মুখুজ্জে মশাই বলে চললেন :

শিকারের তোড়জোড় আমার প্রস্তুতই থাকে, যেকোনো একটা ছুটি পেলেই শহর ছেড়ে পালাই। কালবিলম্ব না করে টিকিট কিনতে পাঠিয়ে দিলাম।

কোয়ামবোটরে যখন এসে পৌঁছোলাম, তখন বেলা চারটের কাছাকাছি। বন্ধু তাঁর কারবারের লরি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ঘণ্টাখানেকের ভিতর কারখানায় এসে উপস্থিত হলাম।

জঙ্গলে যাবার জন্য গোরুর গাড়ি ঠিক করা ছিল। হাতে কিছু শুকনো খাদ্য দিয়ে বন্ধু বললেন, 'মা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ো, এখন তোমার সঙ্গে ঘরোয়া কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যেতেও হবে অনেকটা পথ, আলো থাকতে থাকতে সব বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া ভালো। একটু সাবধানে চলো বাপু, মানুষখেকো বাঘ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আছে। বাঘিনীর চরিত্র তেমন সুবিধার নয়, আবরু মানে না। দিনের বেলাতেই খোলা জায়গায় লোকজনের সামনে বেরিয়ে আসে। "Shoot to kill" কথাটা মনে রেখো।'

ভদ্রাচার সম্বন্ধে বন্ধুর উদারতায় বাধিত হলাম। বাস্তবিকই সংসারের যাবতীয় জীবের কুশল জিজ্ঞাসা করার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না।

ব্যস্ততার তাড়ায় গাড়িতে উঠে বসলাম। কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়োয়ানকে বললাম, চালাও।

পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে চলেছি। ঘণ্টাখানেক ধরে চাকা চলেছে, যাবতীয় হেঁচকা সহ্য করে গন্তব্য স্থানের অপেক্ষায় বসে আছি। শেষ পর্যন্ত গাড়ি জঙ্গলের দিকে ফিরল। গাড়োয়ানও চারদিকে ফিরল। গাড়োয়ান চারদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, 'এইখানেই দুটো মানুষকে নিয়েছিল।' সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ মনে হল। রাইফেলে টোটা ভরে নিলাম। হাই ভেলসিটি (high velocity) ভরা বন্দুক হাতে আসতে একটু হামবড়া ভাব এসে গিয়েছিল। তাগমারি সম্বন্ধে আমি একটি নামকরা ব্যক্তি, সুতরাং মনের এইরূপ পরিবর্তন দূষণীয় ভাবা উচিত নয়।

এক কদম, দুই কদম করে গাড়ি খাড়াইয়ের দিকে উঠছে, গতি অতি মন্থর। অনেকটা পথ এসে পড়েছি, অথচ মাচান বাঁধার লোকেদের সঙ্গে দেখা নেই। জঙ্গল এদিকে ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে আসছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক সেই যে শুরু হয়েছে তার থামবার নামটি নেই। মাইলের পর মাইল একনাগাড়ে ওই ডাক স্বকর্ণে না শুনলে বোঝবার উপায় নেই, কেন মনে হয় বিপদ সর্বত্র ওত পেতে আছে।

জঙ্গলের রাস্তা 'Rolls Royce' চলার জন্য প্রস্তুত হয়নি, সুতরাং লেভেল সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ উঠতে পারে না। মাথা উঁচু করা, নুড়ির ঠোক্করে চাকার উত্থান ও পতন সমভাবে চলেছে। লোহা এবং পাথরের সংঘর্ষণে পাহাড়ের গায়ে যে শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছিল তা আধুনিক ধর্মান্ধ শহুরে লোক বোমা ফাটা ভাবলে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। হাওয়া অনুকূল হলে জঙ্গলে ওই ঠোক্করের আওয়াজ মাইলখানেক দূর থেকে শোনা যায়।

BanglaBook.org

রাস্তার বাঁ-দিকে চাকার হাতখানেক পাশেই গভীর খাদ। নীচে খানিকটা সমতল জমি দেখা যায়। সমতল জমির প্রান্তে ঘন ঝোপ। আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ওই ঝোপের দিকে।

ডগা নড়ছে এবং পিছন থেকে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ি ও ঝোপের মাঝখানে যে ব্যবধান, তা কতকটা নিরাপদ বলা চলে। ঝোপের তলায় যে জানোয়ারই থাক, জখম হয়ে তেড়ে এলেও আরেকবার গুলি চালানোর অসুবিধা ছিল না। নিশানার অহমিকা ও দিনের আলোর যোগ ঘটায়, একটা নল খালি করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম, আন্দাজেই গুলি চালাব ঠিক করে ফেললাম। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, বন্ধুর উপদেশ চাপা পড়ে গেল। বাঘের শিকারে এসে জঙ্গল ঘাবড়ে দেওয়া যে কতটা বোকামি তা আমি জানতাম, তথাপি ছেলেমানুষি কেন আমাকে পেয়ে বসল বলতে পারি না।

গাড়ি হেঁচকার সঙ্গে নিশানা করা চলে না। আদেশ অনুসারে গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে বলদ দুটোর সামনে দাঁড়াল। বন্দুক তুলে ট্রিগার (trigger) টিপতে যাব, হঠাৎ বলদের ঝটকায় নিশানা নড়ে গেল। ফিরে দেখি, বাঁ-দিকের বলদ রুখে দাঁড়িয়েছে, চাকা একেবারে খাদের কিনারায়, গাড়োয়ান কিনারার বলদটাকে রাস্তার মাঝখানে আনবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

গতিক সুবিধার নয়। ভরা রাইফেল নিয়েই রাস্তায় লাফিয়ে পড়লাম। চাকা ডিঙিয়ে আসতে হয়েছিল, টাল সামলাতে না পারায়, বন্দুকের ডগাটা মাটিতে গেল ঠুকে। মাছি (front sight) স্থানভ্রষ্ট হল কি না কে জানে। পরীক্ষায় দমে যাবার মতো কিছু পেলাম না বটে, কিন্তু রেডি (ready) ট্রিগারের উপর আঙুলের চাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, কী সর্বনাশ, ভরা বন্দুকের নল গাড়োয়ানের দিকে! ট্রিগার টিপলেই মানুষ খুনের দায়ে জড়িয়ে যেতাম।

আঙুল সরাতে গিয়ে দেখি, কল ঠিক চলেছে, তবে টোটা ফাটেনি। বন্দুক খুলে টোটা বার করে আনলাম। যা সন্দেহ করেছিলাম তাই ঘটেছে, শিকারের গোড়াতেই গলদ বাধিয়ে বসেছি। তাড়াহুড়োয় নতুন কার্তুজ ফেলে পুরাতনগুলি নিয়ে এসেছি।

ইতিমধ্যে আর একটি বিপদ এসে উপস্থিত। নিশানার লক্ষ্যস্থল থেকে দুটি বাঘের বাচ্চা, বেশি বড়ো নয়, বেরিয়ে এসে খোলা জায়গাটায় হাজির। হাওয়া ওইদিক থেকেই বইছিল, ডান দিকের বলদ সন্দিগ্ধ হয়ে বাঁ-দিকে ফিরতেই খাদ্য-খাদকের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেল। পরিচয়ের পালা যে দৃশ্যের সৃষ্টি করলে, তা slow-motion cine-camera-র ছবি ছাড়া বোঝাবার উপায় নেই। ডান দিকের বলদ জোত ছিঁড়ে সোজা সামনে ছুট দিলে। সঙ্গেসঙ্গে এক বগগা গাড়ি বলদসহ উলটে বাঁ-দিকের গভীর খাদে গড়াতে লাগল।

বাঘের বাচ্চা শিকারকালীন এইরূপ ঘটনা বোধ হয় কখনো দেখেনি। বলদসহ ওলটপালট খাওয়া গাড়ি তাদেরই দিকে তেড়ে চলেছে দেখে, তারা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। এই সময় ঝোপের ভিতর থেকে যে গর্জন শুনলাম, তাতে অতি-বড়ো সাহসীকেও একবার ইষ্টদেবতা স্মরণ করে নিতে হয়। আমার ভাগ্য ভালো, বড়ো বাঘ বেরিয়ে এল না।

গাড়ি গড়াতে গড়াতে একটি গাছের গুঁড়িতে আটকে গেল— বলদ চাল-খসা কুমড়োর মতো তখন গড়িয়ে চলেছে। মাধ্যাকর্ষণের টান শেষ পর্যন্ত তাকে সমতল জমির উপর নিয়ে এসে ছাড়ল। জন্তুটার হাড়গোড় বোধ হয় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই পারল না।

গাড়োয়ান এই সময় সামনের গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে নীচে নামতে লাগল। বাঘের মুখে এগোবার সময় আমাকে কাতরভাবে অনুরোধ করলে বন্দুক প্রস্তুত রেখে পিছু নিতে। ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্ধকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধের মতো।

টোটাহীন বন্দুক নিয়ে, তাড়া-খাওয়া বাঘের সামনে যাবার সাহস আমার ছিল না। আমি উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভাঙা ডাল ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়োয়ান বলদটার নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর পিঠ চাপড়ানো, আদর, তিরস্কার, পদাঘাত সব কিছুই চলল কিন্তু বলদ আর উঠে দাঁড়াল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে গাড়োয়ান উপরে উঠে আসতে লাগল। দু-চার পা উপরে ওঠে, পিছন ফিরে তাকায়, আবার সামনে অগ্রসর হয়— এইভাবে রাস্তায় এসে উপস্থিত হল।

দৃষ্টি তার করুণাপ্রার্থী নয় বরং ভ্রূ-কুঞ্চিত। আমার প্রতি কেমন একটা অবজ্ঞার আভাস পাচ্ছিলাম। খুবই স্বাভাবিক। প্রথম কারণ, আমার সাহসের পরিচয়; দ্বিতীয়, বলদটার দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী। সামান্য বকশিশের লোভে বেচারাকে বিরাট মূলধন হারাতে হল।

অতবড়ো ক্ষতির কারণ হয়ে, সান্ত্বনা দেবার সাহস ছিল না। গাড়োয়ান নিকটে আসতে বললাম, আমার টোটা নেই, শিকার হবে না, গ্রামে ফিরে চলো। গাড়োয়ান আমার বন্দুকের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসির পিছনে শ্লেষ মারমুখী হয়ে উঠেছিল। সে জানালে, গ্রামে ফিরবার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু চেপে গেল। অব্যক্ত যা রইল তা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হল না। লোকটা অধিক বাক্যব্যয়

BanglaBook.org

না করে সামনে এগোতে লাগল। মহাজনের পথানুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

মোড়ের পর মোড় ঘুরে চলেছি। কোথায় চলেছি, আর কতটা যেতে হবে, জানবার তাগিদ এলেও মনের কথা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। গাড়োয়ানের চলার ভঙ্গি দেখে বুঝেছিলাম, এ তল্লাটে ওকে থামিয়ে কথা বলা যাবে না।

গভীর খাদ অনেকক্ষণ পিছনে ফেলে এসেছি। আর খানিকটা এগোতে সামনে খোলা জমি পাওয়া গেল। রাস্তার উপরেই সদ্য-কাটা ডালপালা পড়ে রয়েছে। এতক্ষণে গাড়োয়ানের মুখ ফটল। সে জানালে, কাছেই মাচান আছে— লোকজনকে ডাকলেই পাওয়া যাবে। আশ্বাসবাণীতে মারাত্মক হাসি ক্ষমা করে ফেললাম। বার তিন-চার সিটি মারতেও কোনো উত্তর না পেয়ে— আমাকে অনুসরণ করতে বলল। একটু ঘোরাঘুরি করতেই মাচান খুঁজে পাওয়া গেল। লোকটার গা ঘেঁষেই প্রায় অনুসরণ করেছিলাম।

মাচানের কাছে এসে দেখি, গাছের গুঁড়ির চারধারে বিষাক্ত কাঁটা-বন। ওই কাঁটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় একবার সেপটিক হয়ে মরতে বসেছিলাম। ঠিক মাচানের নীচেই উই-এর ঢিপি, আশঙ্কাপূর্ণ গহ্বর গায়ে জড়িয়ে আছে। গহ্বরগুলোকে আমি যমের মতো ভয় পাই। কতবার যে ঢিপির কাছে বিভীষিকা দেখেছি বলতে পারি না। ঘটনাগুলি চলচ্ছবির মতো চোখের সামনে উপস্থিত হতে গাড়োয়ানকে আগে উঠতে বললাম। কথায় বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' তলায় যদি কিছু থাকে তো গাড়োয়ানকেই আগে নেবে।

গাছে ওঠার আদেশ এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পালিত হল যে, কীভাবে উপরে উঠে গেল দেখবার অবকাশ পর্যন্ত পেলাম না। ওদিকটা নজর রাখতে পারলে অন্তত কোন কোন ডালে পা দিয়ে উপরে গেল হিসাব রাখতে পারতাম, ওঠা সহজ হয়ে যেত। হিসাব না রাখলেও ওঠার তাড়া কম ছিল না, চোখ কান বুজে কোনোপ্রকারে মাচানে এসে পৌঁছোলাম। রাইফেলের বোঝা নামাতে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম।

মাচান অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বসবার জায়গায় একটিমাত্র এড়ো ডাল, অত্যন্ত সাবধানে না বসলে হঠাৎ নীচে পড়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। গাড়োয়ানের পাশে এবং আমার পিছনটায় আড়াল দেবার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। সামনে এবং আমার পাশে একেবারে খোলা।

শিকার যখন নেই, তখন কথা বলার বাধা ছিল না। অসমাপ্ত মাচান ও লোকেদের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলাম, কৌতূহল দমন করা সম্ভব হল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকগুলো গেল কোথায়?'

উত্তরে গাড়োয়ান আচ্ছা করে চিমটি কেটে ইশারায় কথা বলতে বারণ করলে। ছোটোলোক সুবিধা পেয়ে মনের সাধে নখ বসিয়ে দিয়েছিল। বিরক্তির উচ্ছ্বাস সরল ও সংগত হলেও আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, অকস্মাৎ কোনো একটা দুর্ঘটনার জন্যই সব পালিয়েছে। অধিকতর অশোভনীয় ব্যবহার সুনিশ্চিত জানতাম, তথাপি মহাজনের আদেশ অমান্য করে জিজ্ঞাসা করতে হল, 'কথা বলতে বারণ করছ কেন, বাঘ কাছে থাকলে তো মানুষের গলা শুনে পালাবে।'

BanglaBook.org

গাড়োয়ান কানের কাছে এসে, ত্বক ও জ্বিহার শোষণ শব্দের মধ্যে চুপি চুপি জানালে, এ মহল্লার বাঘ পালায় না, আরও কাছে আসে, দুষ্ট মানুষ বাছাই করে শিকার ধরে। প্রশ্নোত্তরে আমার উপর বিশেষ ইঙ্গিত ছিল, নিরুপায় হয়ে কৌতূহল সংযত করলাম।

ঠিক এই সময় ওজন করা, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ শোনা গেল; আগন্তুক পরিচিত, বাঘ কাছে এসে গিয়েছে। একটু পরেই হাড় ভাঙা আর মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। যেটুকু আড়াল ছিল তারই আশ্রয় নিয়ে গাড়োয়ানের গা টিপলাম। সে একই প্রথায়

জানাল, নীচে যা ঘটছে তা সে জানে।

নরভুক বাঘের নানা চরিত্রের ব্যাখ্যা শুনেছি, যে এসেছে, তার চরিত্র যদি বিগড়িয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে... বেশি আর ভাবতে হল না, আশঙ্কা বাস্তব হয়ে উঠল। পরক্ষণেই একাধিক জানোয়ার মাচানের তলায় এসে উপস্থিত। ঠিক আমাদের তলার ডাল দারুণভাবে দুলতে লাগল। বাঘ মাচানের উপরে আসার চেষ্টা চালিয়েছে— বার দুই ঝাঁকুনিতে ডাল ভেঙে গেল, তার সঙ্গে ভারী ওজনের শরীর— উই-এর ঢিপির উপর আছাড় খেল। পরমুহূর্তে সাপের ছোবল পড়তে লাগল একটার পর একটা।

নখী ও বিষধরের বোঝাপড়ার শেষ নিষ্পত্তি কোথায় দাঁড়াবে জানবার সুবিধা না থাকলেও, তখনকার মতো মাচানের মরণদোলা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘনঘটা করে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক বন্ধ, জঙ্গল নিস্তব্ধ। একটু নিশ্চিন্ত ভাব আসছিল, কিন্তু ধাতে সইল না।

মাচানের উপরে ঠিক আমার পিছন দিককার পাতা নড়া শুরু হয়ে গেল। সন্দেহ পিছু নিয়েই ছিল, তবু মনকে স্তোক দিলাম, টিকটিকি বা গিরগিটি হবে।

নড়া ক্রমান্বয়ে আমার জানুর পাশে উপস্থিত; সাংঘাতিক অনুভূতি, সাপ চলেছে গা-ঘেঁষে— কাঁধের উপর দিয়ে।

কপাল দিয়ে কালঘাম ছুটতে লাগল, কাঠ হয়ে বসে রইলাম। সরীসৃপ এগিয়ে চলল গাড়োয়ানের দিকে। পাতার আড়াল পেতেই থেমে গেল। লোকটার দুর্ভাগ্য, এই সময়টিতেই তার নড়ে বসা দরকার হল। কোথায় হাত রেখেছিল কে জানে, হঠাৎ উঃ করে উঠল, বললে বিছে কামড়েছে। কাতরধ্বনিতে আমার রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। কানের কাছে মৃত্যু ডাক দিয়ে চলেছে, কতকটা হতভম্বের মতো হয়ে গিয়েছে! মিনিট পনেরো পরেই বিষের ক্রিয়া সাড়ম্বরে শুরু হয়ে গেল। যমে আর মানুষে ঘণ্টাখানেক ধরে ধস্তাধস্তির পর গাড়োয়ান নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লোকটা মরল। আমি মড়া আগলে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

লোকটা অনেকক্ষণ মরেছে, পাতা নড়াও থেমে গিয়েছে। গাড়োয়ানের দারুণ ঝাপটাঝাপটিতে সাপ নীচে নেমে গিয়ে থাকবে। ঝিনঝিনির যাতনা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে ওঠায় মরিয়া হয়ে উঠলাম। যা থাকে কপালে হবে ভেবে, অতিসন্তর্পণে পা নাড়ালাম। কপালগুণে কিছু ঘটল না।

সময় কেটে যাচ্ছিল, গাঢ় অন্ধকার ভারী ওজনের মতো আমাকে চাপতে আরম্ভ করেছে। অকস্মাৎ গুরুগম্ভীর ডাকে ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠল, প্রেতলোকের সাড়া— ভূত-ভূত-ভূত! ডাকের সঙ্গে কে যেন ধাক্কা মেরে সামনে ঝুঁকিয়ে দিল। ঝাঁকুনির ঘোর কাটিয়ে দেখি গাড়োয়ান মাচানে নেই। চমকে গিয়েছিলাম, ধীরে গত রাত্রের ঘটনা মনে আসতে লাগল। যেখানে গাড়োয়ান বসেছিল, সেই জায়গাটা হাঁ হয়ে আছে। নীচে তাকাতে দেখি, উইয়ের ঢিপির উপর গাড়োয়ান চিত হয়ে পড়ে আছে, চোখ দুটো খোলা, কোটরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, দিনের বেলা দেখলেও ভয় লাগে।

BanglaBoi.org

বেলা বেড়ে চলেছে, কুলিরা কেউ নিতে আসেনি। রাস্তা দিয়েও লোক চলে না, অথচ কুপেতে যাবার নাকি এই একটিমাত্র পথ। বিবেচনা করে দেখলাম, সাপের কেল্লার উপর বসে থাকা অপেক্ষা রাস্তায় নেমে পড়া ভালো। বিপদে পড়লে অন্তত চোঁ চোঁ দৌড় মারতে পারব। সিদ্ধান্ত ঠিক হতেই মাচানের বাইরে পা বাড়ালাম। মনে পড়ল মাংস ছেঁড়ার কথা, সাবধানের মার নেই, ওদিকটা দেখে নেওয়া ভালো। সন্ধানের স্থান খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। নিকটেই একটি ঝোপের তলায়, মানুষের ছিন্ন হাত ও পায়ের শেষাংশ দেখতে পেলাম। নীচে নামবার আগে অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম, কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না। নিশ্চিন্ত হলাম, নরভুক কাছাকাছি কোথাও নেই। সাপের তাড়া যখন খেয়েছে তখন এদিকে ফিরবে বলে মনে হয় না।

মাচান থেকে নেমে এলাম।

একলা পথ চলতে হলে আত্মরক্ষার জন্য কোনো হাতিয়ার সঙ্গে থাকা দরকার। অকেজো রাইফেল কায়েমি করে পিঠে বেঁধে, এই মহল্লার স্বদেশি অস্ত্র খুঁজতে লাগলাম। খোঁজায় আন্তরিকতা ছিল, একটি মাচান-বাঁধা পরিত্যক্ত ডাল সংগ্রহ হয়ে গেল।

চলতে শুরু করলাম। ঠিক করে ফেলেছিলাম আর জীবনে কখনো শিকারে আসব না। ভারী রাইফেলের ওজনে প্রতিটি পদক্ষেপে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। দামি

BanglaBook.org

বোঝা ফেলেও দিতে পারছিলাম না, দিয়ে দিলেও একজনকে কৃতজ্ঞ করা যাবে। কৃতজ্ঞতার কথা মনে আসতে আপন মনেই হেসে উঠলাম, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের কথা এই সূত্রে মনে পড়ল, তিনি নাকি বলেছিলেন, 'বল কী, লোকটা আমার নিন্দা করছে? কই, আমি তো তার কোনো উপকার করিনি!' এমন একটা দার্শনিক সত্য সামনে থাকতে কেমন করে কৃতজ্ঞতার কথা মনে এল বুঝতে পারলাম না।

পথ চলতে চলতে চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। রাস্তা গোলমেলে ঠেকতে চমক ভাঙল। আনমনা অবস্থায় একটা চৌমাথা ফেলে এলাম না? মাচানে আসবার পথে বারোটি রাস্তার সঙ্গমস্থল তো চোখে পড়েনি। তবে কি ভুল পথে চলেছি নাকি? দ্বিমতের ফাঁক ছিল না। পায়ের তলায় দেখি স্লেট (slate) পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তা— একসঙ্গে দুইটি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে। পাথরের বুকে গাড়ি চলার দাগ গভীর হয়ে বসে গিয়েছে। দাগের উপরেই বাবলা, তাল বা বটগাছ, কোথাও বেড়ে উঠেছে, কোথাও মরেছে। আদিমকালের পথ আজ পরিত্যক্ত। দাগের উপর গাছের জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

চলার পথে রাস্তার রূপও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। উপরে ওঠা ও নীচে নামার জন্য ঝকঝকে সিঁড়ির ধাপ। আমি চলেছি, ভুল পথেই চলেছি। যেখানে গিয়েই উঠি লরি চড়ার সড়কের দিকে কোনো গ্রামে গিয়ে পৌঁছাব। চলার প্রধান উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে কোনো প্রকারে লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছানো, পেট ভরে ঠান্ডা জল খাওয়া। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, জল চাই।

অনেকটা পথ পাড়ি দেবার পর সামনে এড়োভাবে আর একটি রাস্তা দেখতে পাওয়া গেল। রাস্তার দু-ধারে বাবলা গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে আকাশস্পর্শী মন্দির-চূড়া দেখা যায়।

মন্দিরের সন্ধান যখন পেয়েছি তখন তৃষ্ণা নিবারণ হবেই। দাক্ষিণাত্যে দেবালয়-সংলগ্ন জলাশয় প্রতিষ্ঠা একটি অবর্জনীয় ধর্মানুষ্ঠান। জোরে পা চালিয়ে দিলাম। তে-মাথায় এসে মন্দিরের দিকে ফিরতেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হল। সামনে কয়েক হাতের ভিতর প্রকাণ্ড বাঘ, আপন মনে থাবা চাটছে। মুহূর্তে সম্মোহিতের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বাঘ মুখ তুলে তাকাতে চারিচক্ষুর মিলন ঘটল। উভয়ের দৃষ্টি অপলক, উভয়ে নিশ্চল। কার সঙ্গে দৃষ্টির আদানপ্রদান চলেছে জেনেও চোখ ফেরাতে পারছি না। হঠাৎ কোনো কঠিন পদার্থে মাথার পিছনটা ঠুকে গেল। ধাক্কায় টর্চ-লাগানো বন্দুকের ডগা সামনে এসে পড়েছিল। এর ঠিক পরের ঘটনা মনে নেই, ভয়ে বেহুঁশের মতো হয়ে গিয়েছিলাম।

ধাতস্থ হয়ে দেখি বাঘ নেই। আমি পাথরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কীভাবে এখানে এসে পড়লাম বলা শক্ত। খুব সম্ভবত সম্মোহিত অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতেই পিছু হাঁটছিলাম। পাশ ফিরতে নিকটেই কবাটহীন তোরণদ্বার দেখতে পেলাম— একটা কিছুর আড়াল দরকার হয়ে পড়েছিল, ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

সামনেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। উঠানের শেষে একটি ছোটো মন্দির, কবাট ভগ্ন, লোহার আঁকশিতে ঝুলছে। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারই এখন আমার আশ্রয়। ভিতরে

BanglaBook.org

ঢুকতে চামসে গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল— তার উপর অসংখ্য চামচিকের ডানার ঝাপট, ভিতরে থাকা গেল না।

বাঘের আড্ডায় মাটিতে থাকাও নিরাপদ নয়। উঁচু জায়গা খুঁজতে লাগলাম। পাঁচিলের উপর দৃষ্টি পড়ল, দেখতে কতকটা দুর্গপ্রাকারের মতো। কামান চালাবার গর্ত যখন আছে, তখন উপরে ওঠার পথও থাকা স্বাভাবিক। সামান্য চেষ্টাতেই পথ খুঁজে পাওয়া গেল। কামান তোলার রাস্তা চক্রাকারে উপরে উঠে গিয়েছে। গাছের ছায়ায় স্থানটি অসূর্যম্পশ্য হওয়ায় শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

বারকয়েক চেষ্টা করেও ওঠার সুবিধা করতে পারলাম না, গোড়ার দিকে কোনোপ্রকারে কৃতকার্য হলেও মাঝপথে যদি পা পিছলায় তাহলে ১৩, ১৪, ফুট উপর থেকে গড়াতে হবে। পাশে আল নেই, গড়ালে কোথায় এবং কীভাবে পড়ব তারও ঠিক নেই— প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত অবস্থা!

তৈরি পথ ছাড়তে হল। এদিকে আসবার সময় একটি অতিকায় লতা দেখেছিলাম, পাঁচিলের গায়ে লাগা ওই পথে ওঠা যায় কি না চেষ্টা করে দেখা দরকার। ছেলেবেলায় অনেকরকম বাঁদরামি করেছিলাম, জিমনাস্টিকের (gymnastics) কেরামতি কাজে লেগে গেল। খানিকটা উপরে উঠে দোল খেয়ে পাঁচিলের উপর এসে উপস্থিত হলাম।

রীতিমতো চওড়া পাঁচিল। পাঁচিল বললে ভুল হয়, পাঁচিলের ছাদ বলাই শোভনীয়। চার ধারে ভাঙা আগ্নেয়অস্ত্র ও নরকঙ্কাল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে; ওগুলো কোন ইতিহাসের নথি কে জানে! সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে, কেবল বাবলা গাছের জঙ্গল, কোনোদিকে জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

বাঘের ভয় ছিল না, রিফ্লেকটরে রৌদ্ররশ্মি পড়ায় নিশ্চয় ভড়কিয়ে পালিয়েছিল। তা না হলে, পাতে তুলে দেওয়া আহার বাঘ ফেলে পালায় না। এটা অভিজ্ঞতার কথা, সুতরাং নিশ্চিন্ত হওয়ায় বাধা ছিল না।

তৃষ্ণায় টাকরা শুকিয়ে গিয়েছে, জলের সন্ধান না পেলেও মন বেকার ছিল না, auto-suggestion-এর মতো জলপ্রপাতের ক্ষীণ কলধ্বনি শুনতে পেলাম। শব্দ মন্দিরের পিছন থেকে আসছিলাম। আশামরীচিকার মতো ধারণাকেই সত্য বলে ভাবতে লাগলাম। জলের ডাক ক্রমান্বয়ে এমনই বাস্তব হয়ে উঠল যে, পাঁচিল থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলাম।

ঠিক এইরকম শব্দ মহানন্দীর জঙ্গলে শুনেছিলাম। সত্যই অন্তঃসলিলা নন্দীকে স্নান করিয়ে বিরাট বাঁধানো পুকুরের দিকে বয়ে যেত। পুকুর থেকেই ঝরনার সূত্র— অধিকন্তু জল স্রোতস্বিনী হয়ে পাহাড়ের তলায় পড়ত।

প্রাঙ্গণের চারধারে পাঁচিল, জলাশয়ে যাবার পথ মন্দিরের ভিতর দিয়ে থাকা সম্ভব। অস্পৃশ্যদের বাধা দেবার জন্য পুরোহিত এইখানে দ্বারীর ন্যায় অপেক্ষা করত কি না কে বলতে পারে। শুচিতা সম্বন্ধে এদের দৃষ্টি প্রখর, সুতরাং ধারণা পরীক্ষা করে দেখা ভালো।

গাঢ় অন্ধকার ও উৎকট গন্ধ অগ্রাহ্য করে পুনরায় মন্দিরের ভিতর ঢুকলাম। দ্বারের সন্ধানে ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কতবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম বলতে পারি না। খোঁজার

BanglaBook.org

তাগিদ আমাকে উন্মাদের মতো করে তুলেছিল। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত চক্র লেগে গেল। দেওয়াল ধরে বসতে যাবার সময় হাতে লোহার কড়ার মতো কী ঠেকল।

চক্রের ঘোর সামলাতে কড়া ধরে টান মারলাম। মরচে-পড়া কবজার সংঘর্ষণ যে আওয়াজ তুলল তা জনমানবহীন আবেষ্টনীতে অস্বস্তিকর। শব্দ হলেও আশা তখন সতেজ হয়ে উঠেছে, দ্বারের সন্ধান পেয়েছি, শব্দের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম। উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম— সর্বশক্তি দিয়ে কড়া টেনে চললাম, কিছুক্ষণ সচেষ্ট থাকায়, অকস্মাৎ বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। সামনেই বিরাট জলাশয়, বাঁধানো পুকুর, স্ফটিক-জলে থই থই করছে।

ছুটে গেলাম পরম বাঞ্ছিতের দিকে। পানীয় জল এত মধুর হতে পারে কখনো কল্পনা করতে পারতাম না। সমস্ত রাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কেটেছিল, শরীর তেতে আগুন হয়ে গিয়েছে। অবগাহন স্নানের লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

জলে-ডোবা ধাপে পা পড়তেই, কে যেন তলা থেকে আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিলে। একসঙ্গে অনেকগুলি ধাপ পিছলে তলিয়ে গেলাম। অথই গভীরতায় এসে পৌঁছাতে অক্টোপাসের (octopus) মতো জীব চারধার থেকে ঘিরতে লাগল। স্পর্শ তাদের নরম কিন্তু বাঁধন কঠিন ও জ্বালাময়। বাঁচার আশা ছাড়িনি— বহু চেষ্টায় হাত দুটো খালাস পেতেই ভেসে উঠতে অসুবিধা হল না।

সিঁড়ির কাছেই উঠেছিলাম, দম তখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, পায়ে ভর দিয়ে ওঠবার শক্তি নেই। ধাপের উপর খানিকটা জিরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, যথাস্থানে সামান্য দেহ-ভার পড়তেই আবার পিছলে গেলাম। এইটুকু রক্ষা, প্রস্তুত ছিলাম বলে তলিয়ে যেতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিপদসংকুল কেন্দ্র থেকে দাঁড় সাঁতার কেটে শ্যাওলা উপড়ে ফেলতে হল। পাড়ে উঠে আসতে দেখি সমস্ত দেহে ঝাঁঝি জড়িয়ে আছে। সময়মতো উপরে উঠতে না পারলে হিংস্র উদ্ভিদ আমাকে নিঃশেষ করে ছাড়ত।

প্রাণ নিয়ে টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, দেহটা এলিয়ে দেবার জন্য একটি মনোমতো জায়গা খুঁজতে লাগলাম। নিকটেই আমগাছ, তলায় ছায়া ছিল— ধুলো পরিষ্কার করে শুয়ে পড়লাম। বেলা গড়িয়ে ঘুম ভাঙল।

ক্ষুধাগ্নি প্রবল হয়ে উঠেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গাছের ফল খুঁজতে লাগলাম। শুষ্ক তরু, গাছের ডগাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে— গাছে একটিও ফল নেই।

পুকুরের ওপারে অনেকগুলি আমগাছ দেখা যায়। এগুতে লাগলাম। পাড়ের দু-ধারেই ফলে ভরা নারকেল গাছ অনেক রয়েছে। উঠতে সাহস পেলাম না, বয়স পাহারায় ছিল, ভয় ধরিয়ে দিল। খানিকটা ঘোরাঘুরির পর রসালো ফলের সন্ধান পাওয়া গেল। পাকা আমগুলি সবই উপরের ডালে। মালকোঁচা মেরে গাছে চড়তে হল।

সুমিষ্ট ফলাহারে আরাম পাচ্ছিলাম। আস্বাদের দিকটা খেয়াল রাখবার অবসর পাইনি। ক্ষুধার তাড়নায়, পরিমাণ তখন প্রাধান্য পেয়ে বসেছে। ফলে শাঁসের চেয়ে আঁশের ভাগই বেশি— নিংড়ে ভিন্ন খাবার উপায় নেই। নিষ্কাশনে রস একেবারে স্রোতস্বিনী হয়ে উঠল। অতি-সভ্য কেউ কাছে থাকলে বলে বসত, এঃ গা-ময় মেখে ফেলেছে! সত্যের

BanglaBoi.org

ওইখানেই শেষ নয়— গা-ময় তো তুচ্ছ ব্যাপার, আসলে উপচে-ওঠা রস গাছ-ময় ছড়িয়ে ফেলেছিলাম। আহারে পূর্ণ তৃপ্তি আসার আগেই বিঘ্ন ঘটল, একটা দুটো করে পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে দিলে। প্রথমটা গ্রাহ্য করিনি, পরে কামড়ের কেন্দ্র বাড়তে লাগল, বসার জায়গায় তাকিয়ে দেখি ডালময় পিঁপড়েয় ভরে গেছে। গাছের উপর থাকা চলল না— নীচের ডালে পা দিয়ে নামতে যাচ্ছিলাম, দেখলাম পিঁপড়ের বিরাট বাহিনী তিন চার দিক দিয়ে উপরে উঠে আসছে— পা রাখবার আর খালি জায়গা নেই। আক্রমণকারী পল্টন চার ধার থেকে আমাকে ঘিরেছে— এখানে আর এক মুহূর্ত নয়— ডালের উপর থেকেই লাফিয়ে পড়লাম।

মাটিতে পড়ে আর উঠতে পারি না। মনে হল হাঁটু দুটো চিরকালের জন্যে জখম হয়ে গিয়েছে। যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলাম তার কাছেই যে সৈনাধ্যক্ষ আমার অপেক্ষায় বসে ছিল, কী করে জানব। রসসিক্ত চ্যাটচেটে কোট অনেকগুলি পিঁপড়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সেগুলিকে আলাদা করতে একটু সময় লেগেছিল, এর ভিতর একদল গাছের গুঁড়ি পরিত্যাগ করে আমার দিকে চলে আসতে লাগল। আমাকেও চলতে হল হামা দিয়ে, বালসুলভ গতি আধুনিক আর্টে কাজে লাগলেও আমি সুবিধাজনক বোধ করলাম না। পিঁপড়ের দল শনৈঃ শনৈঃ আমার নিকটে এসে পড়ছে— উঠে দাঁড়াতে হল। জখমি হাঁটু নিয়ে আর কত দ্রুত চলা যায়— পিপীলিকার দল ডিসিপ্লিন্‌ড (disciplined) চালে আমার পিছু নিয়েছে— গত্যন্তর না থাকায় বাস্তবিকই খুঁড়িয়ে ছুটতে লাগলাম— পুকুরের ও-পাড় কি হাতের নাগালে। এ পাড়ের মানুষ ও পাড়ের লোককে চিনতে পারে না। যাক, মন্দিরের কাছে আসতে ধড়ে প্রাণ এল। সর্বাগ্রে জামাটা ভালো করে কেচে শুকোতে দিলাম। জঙ্গলে রসের ক্রিয়া যে এতটা ভয়াল হয়ে উঠতে পারে ধারণা ছিল না।

মন্দিরের ভিতর যাবার উপায় নেই, চৌকাটের উপর বসলাম। কোনো কাজ ছিল না, আনমনা অবস্থায় পুকুরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ক্ষণে ক্ষণে চোখ আপনা থেকে দূরে পুকুরের ও পাড়ে চলে যাচ্ছিল। এটা বনবাসের পুরাতন অভ্যাস, আতঙ্ক নিয়েই থাকে, কান খাড়া এবং দৃষ্টিকে সতর্ক না রেখে উপায় নেই। কান বেশিক্ষণ বেকার অবস্থায় বসে থাকতে পেল না, পুকুরের ও পাড় থেকে হনুমানদের কর্কশ ডাক দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ও ডাকের অর্থ আমি জানি, ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

দেখতে দেখতে পাঁচিলের উপর গাছের ডালে সর্বত্র আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। বাঘ নিশ্চয় ভিতরে ঢুকে পড়েছে— তবে এদিকটার সঙ্গে বাইরের যোগ আছে নাকি? কিছুই বিচিত্র নয়; ধ্বংসের ক্রিয়া যেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে, সেখানে খানিকটা পাঁচিল ভেঙে গিয়ে বাঘের রাস্তা করে দিয়ে থাকবে।

শিকারির কৌতূহল এমনি জিনিস যে ঘটনাটি কী, না দেখে থাকতে পারলাম না। কপাট ঈষৎ ফাঁক করতেই বুড়ো আমগাছটার কাছেই দুই বীর হনুমানকে দেখা গেল— আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মল্লযুদ্ধে নেমে পড়েছে। উভয়ের পৃষ্ঠপোষকরা দূর থেকে কোলাহল শুরু করে দিয়েছে।

সাধারণত এই জাত 'মরি কি মারি' সূত্রপাত বীরভোগ্যার দখল নিয়ে থাকে। মল্লযুদ্ধের

BanglaBook.org

কৌশল দেখতে লাগলাম, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এমনি ওস্তাদি প্যাঁচ কোনো কুস্তিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আঁচড়-কামড়ে উভয়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। উভয়েই নাছোড়বান্দা, একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত দ্বন্দ্বের রেহাই নেই! যার জন্যে এই মরণপণ সে কোন স্তরের সুন্দরী অনুমান করা শক্ত।

যুদ্ধের নিষ্পত্তি হল, দুর্বল চিত হয়ে শুয়ে পড়ায়— সোজা কথা, ছাড়লে আছি, মরলে গেছি। বিজেতা ভোগের দখল নেবার জন্য চলে যেতে, পরাজিত নিকটের আম গাছটায় গিয়ে উঠল।

জঙ্গল নিস্তব্ধ, বাঘের ভয় ছিল না; দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। বসে বসে আদিম বৃত্তির কথাই ভাবছিলাম। মানুষ বুদ্ধি ও সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে এদিকে কতটা অগ্রসর হয়েছে, বিচারসাপেক্ষ হয়ে উঠেছিল। ভোগ ও প্রেম, lust ও love-এর মাঝে যে সূত্র মিলন ঘটায়, তা কি নিরবচ্ছিন্ন এই আদিম প্রবৃত্তি নয়! প্রকৃতির দুর্দান্ত শক্তিকে যেভাবেই খোলস পরানো যাক, আসলে অন্তর্নিহিত রূপকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তবু ছদ্মবেশে সত্যের উপর মাথা খাড়া করে আত্মপ্রতারণায় সান্ত্বনা খুঁজে থাকি। আর অনেক কিছুই ভেবে চলেছিলাম, সব খেই ছাড়া, ঘৃণ্য কথা। চিন্তার অনির্দিষ্ট গতি বাধা পেলে হনুমানটা আমগাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে অযথা সমানে নৃত্য শুরু করে দিল। নৃত্যের তালও বিস্ময়কর, পিঠ, মাথা, নাক, কান, হাত সব একসঙ্গে চাপড়ে চলেছে। বেধড়ক তালের মাত্রার সঙ্গে সোমের কোনো সম্বন্ধ নেই। মাত্রা আপন মতলবে গড়ে উঠেছে। নৃত্যের কলাকৌশলেও কোনো বিশেষ চালের মিল নেই, এমনকী ব্রতচারী নাচের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না, বরং জ্বালার যাতনায় অতিষ্ঠতাই নৃত্যের রূপ নিয়েছে মনে হল। সূত্র সহজেই দৃশ্য হয়ে উঠল— যুদ্ধের লাল পিপীলিকার আবরণে কালো হয়ে গিয়েছে; ইস, লাখ লাখ রক্ত-শোষক বেচারার তাজা মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে!

নৃত্যের পালা অল্প সময়ের ভিতর শেষ হয়ে এল— হনুমানের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই— মাটিতে শুয়ে ছটফট করতে লাগল। পরের ঘটনা দেখবার সময় ছিল না। রাত্রিবাসের জন্য পাঁচিলের দিকে রওনা হলাম।

ছাদে বসে আছি, একান্ত একেলা— ফেলে-আসা চিন্তাস্রোত ধীরে বেগশীল হয়ে উঠতে লাগল। ভাবছিলাম বনবাসের কথা, স্বকৃত নির্বাসনের কথা—

আশ্রয়ের বন্দিশালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে, মৃত্যুর বরণডালা সাজিয়ে নিয়েই বার হতে হয়। তা পারছি কই, তবে কি এইখানেই আমার শেষ? ওই যে নরকঙ্কালগুলো অজ্ঞাত ইতিহাস জড়িয়ে পড়ে আছে, ওদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যই কি নিয়তি আমাকে এখানে টেনে আনল? অহমিকা ও আত্মশ্রদ্ধাকে যে মানুষ সকল কাজে পথপ্রদর্শক মনে করত, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে অবিচলিত চিত্তে কঠোর কর্তৃত্ব ব্যবহার করত, তাকেই অজ্ঞাতে হারিয়ে যেতে হবে? ভবিতব্যের পরিহাসে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, জঙ্গল থেকে বার হবার জন্য মনকে দৃঢ় করে তুললাম— 'মরি কি মারি'র আদর্শ আমার সিদ্ধান্তকে উৎসাহিত করে তুলল, কাল সকালেই এখান থেকে বার হব ঠিক করে ফেললাম। যে সময় আশ্রয়ের কারাগার থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যস্ত ছিলাম, সেই

BanglaBook.org

সময় পাঁচিলের ওপাশে, কামান তোলার রাস্তার দিকে, দেয়ালের গা ঘেঁষে একটি সরু ডালের উত্থান-পতন শুরু হল। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো হনুমান হবে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। এ সময় তো হনুমান গাছ থেকে নীচে নামতে পারে না।

শুধু হাতে বসে থাকা ঠিক নয়। একটি মোটা ও মজবুত হাড়ু মুড়িয়ে দোল-খাওয়া ডালের দিকে এগুতে লাগলাম।

কাছে আসতে দেখি, তাগড়া কালো প্যান্থার (Black Panther) আমার সন্ধানেই পাঁচিলের উপরে আসার পথ খুঁজছে। ডালের শেষের দিক পলকা হওয়ায় পাঁচিলের নিকটে এসেই নুয়ে পড়ছে। আমি সামনাসামনি এসে পড়তে— পিছু হেঁটে পাতার আড়াল নেবার চেষ্টা করছিল, ঠিক ডালে পা না পড়ায় নীচে আছাড় খেল। ভাবলাম আপদ গেছে— কিন্তু বিপদ যার পিছু নিয়ে থাকে তার নিশ্চিন্ত হবার অবসর কোথায়!

BanglaBook.org

বসবার জায়গায় ফিরতে যাব, পাশেই পাঁচিলের আলে দুটো কালো থাবা এসে হাজির। পাথরের উপর নখ না বসায়, জানোয়ারটা নিজেকে টেনে তুলতে পারল না— সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

আহার সন্ধানে বাঘের অধ্যবসায় অসাধারণ, বার বার আছাড় খেয়েও যে জীব সংকল্প পরিত্যাগ করে না, তাকে বিশ্বাস নেই। ভীত হয়ে পড়লাম, কোনোপ্রকারে কৃতকার্য হলেই তো আমি গেছি। জন্তুটাকে তাড়ানো দরকার, সহায় একমাত্র অস্থিদণ্ড— পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

সচরাচর বাঘের জাত আহত না হলে সামনে থেকে আক্রমণ করে না, উপস্থিত ক্ষেত্রে চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। আমাকে আলের পাশে দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বরং উপরে আসার চেষ্টা আরও বাড়িয়ে তুলল।

আমিও হাড়ের হাতিয়ার বাগিয়ে ছিলাম, জুতসইভাবে মাথাটা নাগালের মধ্যে পেতেই, সজোরে ব্রহ্মতালুর উপর এক ঘা বসিয়ে দিলাম— 'মরি কি মারি'র মার, কাজ এল। অস্ত্র ভেঙে গেল, তার সঙ্গে বাঘও পড়ল নীচে। মাটিতে পড়ে আর উঠতে পারে না। বহু চেষ্টায় যখন দাঁড়াল, তখন মাতালের মতো টলছে, ওইভাবেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

চলার ভঙ্গি দেখে বুঝেছিলাম, বাছাধনকে কিছুদিন ঝিমিয়ে থাকতে হবে। অস্থিদণ্ডের ভগ্নাংশ তখন হাতে রয়েছে, পরীক্ষা করে দেখি ভাঙা জায়গাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে, তার মানে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল, খুলিটা বোধ হয় চৌচির হয়ে গিয়েছে।

রাত্রি, উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। শুক্লপক্ষীয় চাঁদের উঁকি ঘন মেঘের আড়ালের পাশে দেখা যায়। ফুরফুরে হাওয়া বনফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে চলেছে— আবেষ্টনী রসভারাক্রান্ত। সুন্দর মূর্তিময় হয়ে উঠেছে, জঙ্গলের রূপে আমি মুগ্ধ। নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছি।

কেন দান, কাকে দান, কীসের অর্ঘ্য কিছুই জানি না, কেবল অন্তরে উপলব্ধি করেছি, দিতে হবে, পাওনা জমে উঠেছে। যার রূপে আমি বিভোর, তাকে নাগালের ভিতর পেলাম কই। বাস্তবকেই স্বপ্নের রূপ দিয়ে সাজিয়ে দেখি— নিজের কাছেই সান্ত্বনা খুঁজি।

জঙ্গলে জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। রাত ক-টা কে জানে। পাঁচিলের নীচে কঙ্কালভুক হায়না ডাক দিয়ে গেল, তার সঙ্গে ময়ূরের কেকারব। ময়ূর থেমে যেতে, হনুমান ও বাঁদরের কোলাহল শুনতে পেলাম, সব কয়টিই বনের রাজার বিবরণ-সংকেত।

অল্প সময়ের ভিতর গুরুগম্ভীর নাদে বাঘের ডাক জঙ্গলকে সচকিত করে তুলল। অভিসারের আয়োজন চলেছে। বাঘ স্বভাবত মৌনী— ডাকের অর্থ প্রেমিকার সান্নিধ্যলিপ্সা। ডাক ক্রমান্বয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

রাত বেড়ে চলেছে, ঘুম আসতে লাগল, তন্দ্রার ঘোরে কত শব্দ শুনলাম, কত কী দেখলাম তার বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই।

পরের দিন সকালের কাজগুলো সেরে নেবার জন্য নীচে নামতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় নিকটে একাধিক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ভিড় ক্রমান্বয়ে মন্দিরের দিকে চলে আসছিল। চিৎকার করে জানালাম, এদিকে মানুষ আছে।

BanglaBook.org

চিৎকার অপ্রত্যাশিত সুফল এনে দিল, বন্ধু আমার নাম ধরে জানতে চাচ্ছেন, তুমি কোথায়?

অনতিকাল পরেই দলবলসহ বন্ধু পাঁচিলের নীচে এসে উপস্থিত। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। কালক্ষেপ না করে উপর থেকে নেমে এলাম। দৃঢ় আলিঙ্গন দ্বারা স্বল্পভাষী বন্ধু দুর্ভাবনার কথা উজাড় করে বলে দিলেন।

আনন্দস্রোতে আর একটি ঘটনা জড়িত হল। বন্ধু হৃষ্টচিত্তে জানালেন এদিকে আসার পথে, কাছেই একটি প্রকাণ্ড কালো বাঘ মেরেছি, পিছনের লোকেরা নিয়ে আসছে। কালো বাঘের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, নিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকতে পারলাম না। বন্ধুকে টেনে নিয়ে গেলাম তাঁর শিকার দেখতে।

জানোয়ারের ব্রহ্মতালু ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গিয়েছে, পেটটা ফোলা, দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছে। আনন্দ চাপা দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। নিঃসন্দেহে বাঘটা কাল রাত্রেই মারা পড়েছে।

সত্য ঘটনা বলবার জন্য বন্ধুর দিকে ফিরে দেখি, তিনি গোঁফে চাড়া দিচ্ছেন, একেবারে ফোটো তোলার মেজাজ। বীরত্বের একাধিপত্যে এইরূপ একটি অশোভনীয় দাবি উপস্থিত হবে কল্পনাও করতে পারিনি। মেজাজের সঙ্গে রসিকতা বেড়েছিল— মুচকি হেসে বললেন, জংলি কি আর গাছে ফলে। গোরু খোঁজার মতো সারা জঙ্গল তোমার সন্ধানে দু-দিন ধরে ঘুরছি। বনবাস তোমার কাছে মোক্ষলাভের ব্যাপার।

রসিকতা গ্রহণের জন্য মন প্রস্তুত ছিল না, নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, ভদ্রাচারের আড়াল নেওয়া সম্ভবপর হবে না— সোজাসুজি জানালাম, তিনি মরা বাঘের উপর গুলি চালিয়েছেন। মাটির বাঘ মারতে গিয়ে ছাদের মানুষ শিকার করে ফেলেননি বলে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে হল।

শিকার সম্বন্ধে বন্ধু এমনই উদাসীন যে, অমন একটা ট্রোফি (trophy) হাতছাড়া হয়ে যেতেও কিছুমাত্র দুঃখিত হলেন না, বরং পিটিয়ে বাঘ মারার জন্য আমাকেই তারিফ করতে লাগলেন। দাবির ব্যাপার সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে জঙ্গলের অন্য ঘটনাগুলি বলতে যাচ্ছিলাম, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, ওসব হবে'খন, বাড়ি ফিরে চলো। গ্রামের খবর তো রাখ না, ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বাঘ আসলে পিশাচ, জন্তু নয়; তোমাকে নাকি বাছাই করে কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ ভাঙবার জন্যেই এদিকে এসেছিলাম। ফিরবার জন্য সকলে উন্মুখ হয়েছিল, বন্ধুকে অনুরোধ করলাম একটু দাঁড়াও, ভিতর থেকে রাইফেলটা নিয়ে আসি, ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

ভিতরে ঢোকবার পথে, আমগাছতলায় দেখি, হনুমানটা উপে গিয়েছে— কেবল তার হাড়গুলো পড়ে রয়েছে।

ঘটনাগুলি বানানো মনে করলে বলব, আমার ঘর-আলো-করা কালো বাঘের চামড়াটা দেখে এসো।

BanglaBook.org

সুন্দরবনের শেষপ্রান্তে

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সুন্দরবনের নাম কে না জানে? শিকারিদের তো কথাই নেই, সাধারণ মানুষের কাছেও তার গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু, যেজন্যে সুন্দরবনের এই নামডাক, সেটা হল এই বনের শ্রেষ্ঠ জানোয়ার— দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এই জাতীয় বাঘ ভারতের আরও কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায় বটে, কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ আকারেপ্রকারে সব চাইতে সেরা।

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ সমুদ্রের কাছে গিয়ে থেমে গিয়েছে— আর কদম বাড়াবার উপায় নেই। চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ, এই তিনটি জেলার দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে এক-শো আশি মাইল, প্রস্থে, উত্তর-দক্ষিণে ষাট মাইল হতে আশি মাইল। পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা, ইছামতী বা যমুনা। কালিন্দী, জয়মঙ্গল, মালঞ্চ, হরিণঘাটা, বলেশ্বর এবং আরও অসংখ্য ছোটো ছোটো নদী, খাল, নালা এই অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করে রেখেছে। এরাই ওই অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র পথ— এবং কলকাতার সঙ্গেও জলপথেই সংযোগ। শোনা যায়, আরব নাবিকরা সমুদ্রপথে যাতায়াতের সময় বঙ্গোপসাগরের তটরেখা বরাবর সবুজ বনানীর অঞ্চলকে নাম দিয়েছিল 'সমুদ্দম বন'।

সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া কেওড়া, গরান, গেঁয়ো গর্জন, হেন্তাল, বলা, ঝাউবন, গাব গাছ, হোগলা, গোলপাতার গাছ, ঝাপটা গরান ইত্যাদি গাছ জঙ্গলটাকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। সুন্দরবনের মাটির উপর ছড়িয়ে আছে একরকম ঘাস— নাম শূলো—

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দু-ইঞ্চি হতে বারো ইঞ্চি লম্বা হয়— তীক্ষ্ণাগ্র, পায়ে কাঁটার মতো ফোটে।

জঙ্গলে কেঁদো বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার), বন্যবরাহ, হরিণ (চিত্রল), 'হগ ডিয়ার' কদাচিৎ, অজগর, বহুজাতীয় সাপ ও কুমির। পূর্বে গণ্ডারও ছিল অপেক্ষাকৃত ছোটো, এক খড়্গাবিশিষ্ট— 'জাভা দেশীয় রাইনোসিরস'— 'রাইনোসিরস সুমাত্রানেসিস', এখন এ জাত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে মনে হয়। পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও দেখা যেত। পাখিও নানা জাতের। সাদা ও লাল বক, চিল, পানকৌড়ি, বড়ো বড়ো কুন্যা, শামুককুল, কার্লো, গোল্ডেন ক্লভার ইত্যাদি।

এই সুন্দরবনে শিকার করাটা নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুযোগ-সুবিধা পেলেই,

BanglaBook.org

ওদিকে ধাওয়া করতাম। বন্ধুবান্ধব নিয়ে শিকারপার্টি করা সম্ভব হত না বটে, তবু, স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ ইত্যাদি আমার বন্ধু আলতাফ হোসেনের তৎপরতায় সহজ হয়ে উঠত। আলতাফ হোসেন ওখানকার ডি. এফ. ও. লোকজনও হাতে আছে— জানাশোনাও প্রচুর, আর আছে একখানি লঞ্চ— যার সাহায্য ছাড়া ও অঞ্চলে যাতায়াত অসম্ভব। আলতাফ হোসেন নিজেও শিকারি। তার কাছে অনেক গল্পই শুনেছি। আমাকে এই অঞ্চলে শিকারে টেনে নিয়ে যাওয়ার মূলে তার চেষ্টা ও কৃতিত্ব কম ছিল না।

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলতে গিয়ে, তখনকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কথাই সব চাইতে আগে মনে পড়ে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাস। ভারতবর্ষে তখনও ইংরেজশাসন কায়েম— কিন্তু চতুর্দিকে একটা থমথমে ভাব। ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে বাংলাদেশে লিগশাসন চলছে। হিন্দু-মুসলমানে একটা তীব্র মনকষাকষি আর নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার পালা যেন আগামী দিনের লোমহর্ষক হানাহানি আর রক্তারক্তির সূচনায় উন্মত্ত। কিন্তু শিকারের রাজ্যে এই দলাদলি আর রেষারেষির বালাই নেই। শিকারিদের মধ্যে হিন্দুমুসলমান ইংরেজখ্রিস্টান এসব জাতিভেদ কেউ করে না। তাই, অন্যান্য অসুবিধা থাকলেও, শিকারক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গিয়েছে। হিরোশিমায় শোচনীয় ধ্বংসের কথা আলোচনায় আমরা সবাই মুখর হয়ে উঠেছি। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান বা তথাকথিত মৃত্যুর কথা নিয়ে আমার বালিগঞ্জের সান্ধ্য আসর বেশ গরম হয়ে উঠেছে— আবাল্যবন্ধু অনিমেষ টুক করে ঘরে ঢুকেই চুপ করে কানে কানে বললে— আলতাফ হোসেন!

নামটি শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম। আমার এই পাঁচমিশেলি বৈঠকখানার বাজারে তাকে নিয়ে আসা সমীচীন হবে না মনে করেই দাঁড়িয়ে পড়ি এবং সভার কাছে দু-মিনিটের সময় চেয়ে নিই।

বাইরে এসে দেখি, বন্ধুবর নীচে কামরার বারান্দায় একটি আরামকেদারায় গা হাত পা এলিয়ে শুয়ে আছেন— মুখে অর্ধদগ্ধ সিগারেট। ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন একটা জমাট মেঘ সৃষ্টি করেছে। সামনে এসে দাঁড়াতেই, আলতাফ হোসেন আদাব জানায়, তারপর মিষ্টি হেসে বলে— ভাই, এবার তোমার জন্য পাকা ব্যবস্থা করেছি। একেবারে লম্বা 'ট্যুর'— লঞ্চে করে সেই শেষ ঘাঁটি 'সুপতি' পর্যন্ত যাওয়ার প্রোগ্রাম। এবার চলো, একটা রেকর্ড করে আসা যাক। ক্যানিং-এ আমার লঞ্চ বিলকুল তৈরি।

তার কথা শুনে উল্লসিত হলাম বই কী। ঘরে বসে আর ক-দিন থাকা যায়। তা ছাড়া সুন্দরবনের প্রলোভনও কম নয়।

আলতাফ হোসেনের বিশ্রাম ও আহারাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে তখনকার মতো আবার সভায় যোগদান করি। কিন্তু একবার রসভঙ্গ হলে আর বুঝি তেমন জমে ওঠে না— তাই একে একে সবাই কেটে পড়েন।

সভা ভঙ্গ হল। আমিও আলতাফ হোসেনের কাছে গিয়ে জমে বসলাম। অনেক শলাপরামর্শের পর ঠিক হল আমরা পরদিনই রওনা হব। সঙ্গে দিন পনেরোর মতো খাবার যথা— চাল, ডাল, আটা, ঘি, ময়দা, সুজি, কিছু আলু, শুকনো ফল, স্টোভ,

BanglaBook.org

কেরোসিন ইত্যাদি আর গোটা তিনেক বন্দুক রাইফেল, পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্টিজ, বুলেট, কিটব্যাগ, ছোরা, ছুরি, দড়ি, সুতো সব কিছুই সংগ্রহ করে রাখা হল। সুন্দরবনের নদী ও খালের জল লবণাক্ত, কাজেই লঞ্চে কয়েকটা বড়ো বড়ো ড্রামে খাবার জল বোঝাই করে নেওয়া হবে, আলতাফ হোসেন সেকথা জানালেও, অধিকন্তু ন দোষায়— আমিও একটা বড়ো জলের ড্রাম, ঘটি, মগ নিতে ভুলিনি।

আলতাফ হোসেন ভোরেই ক্যানিং চলে গেলেন। কথা হল, আমরা বিকেলের গাড়িতে রওনা হয়ে সন্ধ্যার পরই ক্যানিং পৌঁছুব এবং রাত্রেই আমাদের লঞ্চ ছাড়বে।

সারা সকাল বেলাটা জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে কেটে গেল। অনিমেষের উৎসাহ মাঝে মাঝেই ভাটার দিকে যেতে চায়— সুন্দরবনের বাঘ নাকি নৌকোর ওপর থেকে মানুষ তুলে নিয়ে নদী সাঁতরে পার হয়ে যায়— নয়তো কুমিরের হাতে প্রাণ যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। তাতে উৎসাহ দিতে ছাড়ি না— আরে এত প্রাণের ভয় কেন? এবারের যুদ্ধে গিয়ে যদি সত্যিই যুদ্ধ করতে, তাহলে কি আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে? মনে কর না কনস্ক্রিপশনের আওতায় পড়ে সেই যুদ্ধেই চলেছ। আর প্রাণ যে যাবেই— তারই-বা নিশ্চয়তা কী? প্রাণ নিয়েও তো ফিরে আসতে পারো।

অনিমেষের নিমেষহীন চোখ। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

—বেশ, আমি তৈরি, একটুখানি সময় দাও, বাড়িতে ছুটি নিয়ে আসি।

—যাও, বেশি দেরি কোরো না, বারোটার আগেই এখানে আসা চাই।

আমার নিজের অবশ্য সেসব বালাই নেই— শিকারে যাওয়ার ছুটি আমার অনাদি অনন্ত কালের। সেই যৌবন থেকেই আমার পার্মানেন্ট ছাড়পত্র জোগাড় করা আছে।

অনিমেষ খুব তাড়াতাড়িই বাড়ি থেকে ফিরে এল। বেলা তিনটের সময় বালিগঞ্জ স্টেশনে— সেখান থেকে ট্রেনে ক্যানিং।

পোর্ট ক্যানিং। এখানেই লঞ্চ নোঙর করা আছে। লটবহর নিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছোলাম। আলতাফ হোসেন পরম সমাদরে তাঁর লঞ্চে তুলে নিলেন। তারপর আহারাদি, গল্পগুজব, নিদ্রা। রাত্রেই আমাদের লঞ্চ ছেড়ে দিলে। সেদিন ছিল চৈত্র মাসের দশ তারিখ।

এগারোই চৈত্র— বাসন্তী, গোসাবা হয়ে বাগনায় একটু অবস্থান। সেখান থেকে আমাদের লঞ্চ ক্রমে রায়মঙ্গল নদীতে প্রবেশ করে— তারপর চুকুরী খাল হয়ে হরিনগর সিভিল সাপ্লাই স্টেশন— তারপর কদমতলা। এখান থেকে একটু এগিয়ে যেতেই হরিণ দেখা যায়। তার পরদিন, অর্থাৎ ১২ চৈত্র, বুড়ি গোয়ালিনী পৌঁছোলাম। নদীর ভাঙা ভাঙা পাড়ে অসংখ্য কারলো পাখি— এগুলি 'টেবল বার্ড'— লম্বা অর্ধবৃত্তাকার ঠোঁট— খেতে খুব সুস্বাদু— কিছু গোল্ডেন ক্লোভারও দেখতে পাওয়া গেল। এরাও 'টেবল বার্ড'।

উৎসাহের অতিশয্যে ফায়ার করতেই কয়েকটা কারলো পাখি ঠিকরে পড়ে গেল। লঞ্চের সঙ্গে বাঁধা ডিঙি ভাসিয়ে খালাসিদের দিয়ে পাখিগুলো তুলে আনা হল— খাদ্যের একটা সুব্যবস্থা করা চাই তো! অনিমেষ পাখি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই তাকে ডেকে নিলাম।

—ওসব কাজের জন্যে অন্য লোক আছে, তুমি এসো দিকিনি— একবার দু-চোখ ভরে সুন্দরবনের সুন্দর দৃশ্যটা দেখে নাও— নইলে পরে আপশোস করতে হবে।

বুড়ি গোয়ালিনীতে লোকালয় আছে— আর আছে পাখির 'স্যাংচুয়ারি'। লর্ড লিটন নাকি এই 'স্যাংচুয়ারি' প্রবর্তন করেছিলেন— শামুককুল পাখির এত প্রাচুর্য ও প্রসিদ্ধি আর কোথাও নেই। লাটসাহেব নিজেও এর পরিদর্শনে আসতেন। শামুককুল পাখি সুখাদ্য নয়— একটা দুর্গন্ধ আছে এর মাংসে।

এখানে গ্রাম ও জঙ্গল পাশাপাশি— কিছু সুনিপুণ শিকারিও আছে। এ জঙ্গলে বাঘও পাওয়া যায় শুনলাম। শিকারির কথা উঠতেই ভাবলাম, একবার তাদের সঙ্গে মোলাকাত হলে মন্দ হয় না। আলতাফ হোসেনকে সেকথা বলতেই সে একজন খালাসিকে পাঠিয়ে দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও ফিরে এল, সঙ্গে দাড়িশোভিত এক নওজোয়ান— গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চোখে ক্ষুধিত দৃষ্টি। দেখেই মনে হল, জীবনের পরোয়া করে না— দুর্ধর্ষ সাহসী। নাম কুদরত খাঁ।

হ্যাঁ, নামের মতোই চেহারা বটে! তাকে জিজ্ঞেস করি— তোমাদের এ জঙ্গলে বাঘ আছে শুনলাম, শিকার-টিকার হয়?

মিশমিশে কলো কুদরত খাঁ-র ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝিকমিক করে ওঠে।

BanglaBook.org

—হয় বই কী! হামেশাই শের পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একবার যদি সে মারি করে, তবে আর তার রেহাই নেই।

—তোমরা কি খেদা কর, না মাচান বেঁধে শিকারই সুবিধে?

—না, না, সুন্দরবনে ওসব চলে না— আমরা ফন্দি করেই বাঘকে বন্দি করি— হয় বন্দুকের ফাঁদ পেতে, নয়তো মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে লুকিয়ে থেকে শিকার করা হয়।

—বন্দুকের ফাঁদ? সেটা আবার কী?

কুদরত খাঁ হো হো হেসে ওঠে, তারপর অঙ্গভঙ্গি করে বলতে থাকে— আপনি কিছু জানো না সাহেব— দেখবে, কেমন করে ফাঁদ পাতা হয়? —এই যে ধর, এই হল একটা ঘায়েল মানুষ— যাকে বাঘ মারি করেছে। আর এটাও নিশ্চয় জানো আপনি যে বাঘ আবার আসবে ওটাকে খেতে। সেই যাতায়াতের পথে একটা ফাঁদ পাতা হয়। গুলিভরা বন্দুকটাকে মারির ওপর আড়াআড়ি বসানো হয়— আর গোটাচারেক কাঠি আর কালো রঙের শক্ত সুতো খানিকটা—

—কালো রঙের সুতো কেন?

BanglaBook.org

—নইলে বাঘ দেখতে পাবে যে—

—বেশ, তারপর?

—তারপর বন্দুকের ঘোড়া তুলে তার সঙ্গে কাঠি আর সুতোর কপিকলের মতো তৈরি করে সুতোটাকে টেনে ওই যাতায়াতের পথের ওপর দিয়ে উঁচু করে বেঁধে রাখা হয়।

—কতটা উঁচু?

—বেশি উঁচু নয়— একটা পুরো বয়সের বাঘ ন-ফুট থেকে দশ ফুট। সেটা যখন চলে, তার কলজেটা মাটি থেকে সতেরো কি আঠারো ইঞ্চির মতো উঁচুতে থাকে—

—সব বাঘই তো অত বড়ো নয়— ছোটোও তো হতে পারে।

—নিশ্চয়ই হতে পারে— তবে হিসেবটাই আপনাকে বলে দিই—

—মেলা বকিসনি তো— তোদের সেই হিসেবটাই তো শুনতে চাই—

কুদরত খাঁ ডি. এফ. ও. সাহেবকে একটা কুর্নিশ করেই শুরু করে দিল— হুজুর, বাঘের সামনের পায়ের থাবা মাটির ওপরে যে ছাপ রেখে যায়— আমরা তার চান্দিকের মাপ একটা লতা দিয়ে মেপে নিই— তার দু-ফের নিলেই বাঘের কলজেটা মাটি থেকে কত উঁচুতে তা নিশ্চয় বুঝতে পারা যায়।

অনিমেষের চোখে যেন পলক পড়ে না— হাঁ করে শুনতে থাকে— যেন আজগুবি একটা কিছু শোনা গেল।

আলতাফ কনুই দিয়ে আমাকে ঠেলা দিতেই আমি তাকে বলি— কুদরত খাঁ ঠিক কথাই বলেছে। Double the perimetre of the footprint is the position of the heart—শুধু বাঘের নয়—মানুষেরও।

অনিমেষ সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের পায়ের পাতার চারদিকে একবার ভালো করে মেপে নিজের হৃৎপিণ্ডের উচ্চতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে— তার মুখেচোখে অবিশ্বাসের ছাপ। কুদরতের চোখেও তারই ছায়া।

মাপ করার ফিতে আমার পকেটেই ছিল। সেটা বের করে ফরফর করে খানিকটা ফিতে ছেড়ে দিলাম। অনিমেষকে তার ডান পায়ের পাতার চারদিক গোড়ালি ঘুরিয়ে মাপতে বলি। তারপর তার দ্বিগুণ করে দণ্ডায়মান অনিমেষের পায়ের কড়ে আঙুল থেকে বুক পর্যন্ত তুলতেই দেখা গেল, সেটা ঠিক হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেছে। কুদরতকেও পরখ করে দেখতে বলি। সে এসে সটান যেখানে ফিতে শেষ হয়েছে, সেখানে কান লাগিয়েই অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললে— ঠিকই তো কলজেটা ধুকপুক করতে লেগেছে যে!

কুদরতের কুদরত আছে বলতে হবে। তার কাছেই শুনলাম— দিন কয়েক আগে সে 'গান-ট্রিক' করেই একটা শোলা বাঘ খতম করেছে।

'গান-ট্রিক' এর কায়দাকানুন সবই জেনে নিলাম। তারপর আবার লঞ্চে যাত্রা শুরু। কুদরতের সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগল। তাকে আমাদের সঙ্গী করে নিলাম। অবশ্য মজুরি দিতে হবে— প্রত্যেক দিন দু-টাকা।

বুড়ি গোয়ালিনী ছেড়ে কপোতাক্ষ ও আরও দু-একটি অখ্যাতনামা নদী বা নালা পার হয়ে পাঙ্গাশিরা নদীতে ঢুকে পড়ি। এখানে coupe আছে। Fuel coupe—অর্থাৎ জ্বালানি

BanglaBook.org

কাঠের জঙ্গল। জঙ্গল ডাক হয়— যেসব গাছ বাতিল হয়ে যায়— তাতে চিহ্ন করা থাকে, সেগুলি ঠিকাদার ডেকে নেয়।

সেটা পার হয়ে মঙ্গলবার ভোরে আমরা ধোন্দল খালে পৌঁছে গেলাম। এখানে যথেষ্ট হরিণ— সবই চিত্রল। হরিণ শিকারে প্রবৃত্তি ছিল না— কিন্তু আহার্য হিসেবে একটা শিকার করা হল। একটিমাত্র L.G. shot-এই কাজ হয়ে গেল। বহু হরিণ চরে বেড়াচ্ছে— চোখ জুড়িয়ে যায়— এক একটা দলে ত্রিশ-চল্লিশটা করে থাকে।

সেদিন অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটে আমরা কয়টি ধুরন্ধর ধোন্দল ত্যাগ করলাম। মারিয়া ও আর একটা নদী অতিক্রম করেই জপনা গাং। এখানেও নদীপারের জঙ্গলে প্রচুর হরিণ। এরই পর বড়শিয়া নদী। ১৩ই চৈত্র আমরা পৌঁছোলাম ভাগড়া নদী; সেখান দিয়ে খেজুরিয়া খাল। এর আশেপাশে হেঁতাল ও বেতের জঙ্গল। সেখান থেকে ১৪ তারিখে পাঁঠাকাটা পৌঁছোলাম। এখানেও বেলা বারোটা পর্যন্ত বাঘের সন্ধান করা গেল।

আমরা লঞ্চে ক্রমেই সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করছি। চব্বিশ পরগনার অংশ অনেক আগেই পার হয়ে এখন খুলনা জেলার অংশে ঢুকে পড়েছি। এ সমস্তই এখন পাকিস্তানে। পাঁঠাকাটা থেকে আমরা যাব খুলনা জেলার শেষ প্রান্তে সুন্দরবনের সুপতি ফরেস্ট স্টেশনে।

১৫ তারিখে বেলা ন-টায় আমরা শরণখোলা ফরেস্ট স্টেশনে পৌঁছোলাম। এখানে কিছু পাখি শিকার করা গেল। এখানেই রাত্রিযাপন।

১৬ তারিখে আমরা পদব্রজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে থাকি। শরণখোলা থেকে তিন চার মাইল দূরে 'রগি ফরেস্ট'-এ পৌঁছোলাম। এইটুকু পথ যেতেই অনেকগুলো সাঁকো পার হতে হয়। প্রত্যেকটি সাঁকো পার হওয়াই বিপজ্জনক। 'রগি' ফরেস্ট স্টেশন বলেশ্বর নদীর ওপর। ওপারে পিরোজপুর— বাখরগঞ্জ জেলায়। এই ফরেস্ট স্টেশনের আশেপাশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সব চিহ্নই রয়েছে। প্রকাণ্ড অবজারভেশন পোস্ট— জাপানি বিমান আক্রমণের মহড়া নেবার জন্য বিমান-বিধ্বংসী কামান পাতার কাঠের মঞ্চ— সবই তখন বহাল তবিয়তে বর্তমান।

আলতাফ হোসেন করিতকর্মা লোক। তিনি লঞ্চে তাঁর সরকারি পরিদর্শনের কাজে বেরিয়েছেন— সেসব কাজও করে যাচ্ছেন আবার আমাদের সঙ্গে শিকারের আলোচনা এবং যেখানে যেটুকু সুযোগ-সন্ধান পাওয়া যায়, সেই খবরও জোগাড় করে চলেছেন। অনিমেষের আর কোনো কাজ নেই— রান্নাবান্নার তদবির করা, যেখানেই খাবার জলের খোঁজ পাওয়া যায়, খালাসিদের দিয়ে জল আনিয়ে টাটকা জলে ড্রামগুলো ভরতি করে নেয়, কারণ জল সাত আট দিন বাসি হলেই তাতে পোকা হবার সম্ভাবনা। হরিণ বা পাখি শিকার হলে সেসবের সদ্গতি— এই নিয়েই তার সময় কাটে— আর কারণে অকারণে কেটলিভরা চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিষম খেয়ে বিষম অনর্থ বাধায়। কুদরত গালে হাত দিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে।

আমিও একমনে শুধু এই চিন্তাই করে যাই সুন্দরবনে এসে নিজের হাতে একটা বাঘ মারতে না পারলে লোকসমাজে মুখ দেখাব কী করে!

BanglaBook.org

১৭ চৈত্র। আলতাফ হোসেনের ইনস্পেকশন প্রায় শেষ। ডিঙিতে করে আমরা আবার শরণখোলায় উপস্থিত হলাম। আসার পথে আরও কিছু পাখি শিকার করা গেল।

সেদিনই দুপুরে আমরা রওনা হলাম সুপতি ফরেস্ট স্টেশনের দিকে। এটাই আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল। এখান থেকেই আমরা আবার ফিরে আসব।

সুপতি ফরেস্ট স্টেশনেও 'মিলিটারি বেস' হয়েছিল— এদিক-ওদিক তার চিহ্ন দেখা গেল।

হ্যাঁ, জঙ্গল বটে। এমন ঘন আর জমাট জঙ্গল খুবই কম দেখা যায়। তেমনি শিকারও অঢেল। বাঘের ভয়ও খুবই বেশি। সেটা অমূলক নয়। কয়েকটি নিদারুণ অত্যাচারের অতি করুণ কাহিনি শোনা গেল। বাঘের কথা শুনে আমি প্রস্তাব করি, এখানেই একটা চেষ্টা নেওয়া যাক। আলতাফ হোসেন তার কাজকর্ম শেষ করে নিতে চায়, বলে— ব্যস্ত কী? তোমায় এমন জায়গায় নিয়ে যাব যে বাঘ তোমার মুঠোর মধ্যে এসে যাবে।

১৮ চৈত্র। আমরা সুপতি থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি কটকা খালে পৌঁছোলাম। এখানে লোকজন আসে না— আসাও খুব কঠিন। প্রচুর হরিণ দেখতে পাওয়া গেল। দুটো হরিণ শিকার করলাম। এখানে বনমুরগিও প্রচুর— কিন্তু সুন্দরবনে বনমুরগি শিকার করা হয় না। কুদরত খাঁ সবিস্তারে বুঝিয়ে বলে— ওখানকার স্থানীয় লোকজন ও শিকারিরা বনবিবির নামে মুরগি পুজো দেয়। বনবিবি হল বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমাদের লঞ্চ নোঙর করা ছিল। রেলিং-এ ভর দিয়ে রাইফেল হাতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম— হঠাৎ একটা বাঘকে নদী সাঁতরে পার হতে দেখা গেল। আমার লং রেঞ্জের রাইফেলের পাল্লার মধ্যেই— উপযুক্ত সময় বুঝে ট্রিগার টিপলাম। মুহূর্তে বাঘটা জঙ্গল পার হয়েই অদৃশ্য।

তবে কি ব্যর্থ হলাম? জঙ্গলে নামার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেই আলতাফ হোসেনের ঘোরতর আপত্তি।

—এ জঙ্গলে কেউ পায়ে হেঁটে শিকার করেনি— আপনি এ-রকম দুঃসাহস করবেন না।

আমার শিকারিজীবনের অভ্যাসটাই হচ্ছে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাই তার কথাটা আমার মনঃপূত হল না। দেখাই যাক না— কী হয়।

কুদরত আর দুই তিন জন সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। বনে প্রচুর হরিণ। একটা সদ্যনিহত হরিণও দেখতে পেলাম। বাঘের পায়ের চিহ্নও আছে। এখানে ঘাস বেশ পরিষ্কার— শূলো কম। কিন্তু ইতস্তত পায়চারি করে অথবা দূরে পায়ে হেঁটে বাঘ পাওয়া খুবই কঠিন— হয়তো সেই জানোয়ার আমাদের দেখতে পায়— কিন্তু আমাদের নজরের সামনে আসতে চায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করেও বাঘের দর্শন পেলাম না। কুদরতও অনেক চেষ্টা করে দেখল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন দুটো হরিণ শিকার করলেন।

ব্যর্থতার অবসাদ নিয়ে লঞ্চে ফিরে আসতেই অনিমেষ আমাকে অভ্যর্থনা জানায়।

—কী হল? এমন জঙ্গলেও বাঘ পেলে না? তোমাকে দেখেই ভেগে পড়ল নাকি?

মেজাজটা ভালো ছিল না— তাই বিরক্ত হয়েই জবাব দিলাম— তুমি তো গায়েগতরে বেশ বাগিয়ে নিয়েছ, তোমাকে সঙ্গে নেওয়াই উচিত ছিল— তাহলে হয়তো বাঘের

BanglaBook.org

নোলায় জল পড়ত।

আতলাফ হোসেনের প্রস্তাব :

—চলো, আর দেরি না করে, আমরা সোজা পাঁঠাকাটা ক্যুপে ফিরে যাই। ওখানে জোর কাঠের কারবার, অনেক মহাজনি নৌকো আসে, কোনোটা হাজার মণি, কোনোটা পাঁচশো মণি। ব্যবসায়ী, কাঠুরে ইত্যাদি বহু লোকজনের সমাগম। মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঘেরও ওখানেই আনাগোনা।

পাঁঠাকাটার নাম শুনেই অনিমেষের প্রাণে উৎসাহের জোয়ার— সে হাততালি দিয়ে ওঠে— বাঃ খাসা জায়গা। পাঁঠাকাটা হয় যখন, তখন খেতেও পাব। অনেকদিন খাইনি— হরিণের মাংস বড্ড চিমড়ে।

ডি. এফ. ও. তার উৎসাহের আগুনে এক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিলে।

—নামটাই পাঁঠাকাটা, ওখানে আপনার ছাগবৎসের কোনো সন্ধান মিলবে না।

২০ চৈত্র— আমরা পাঁঠাকাটায় ফিরে এলাম।

জঙ্গলে ঢোকাই খুব বিপজ্জনক। বাঘের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। সুদক্ষ গ্রাম্য শিকারিও অনেক ক-জনই সেখানে আছে। শিকার করাই তাদের পেশা। সবই মুসলমান। অভিজ্ঞতাও প্রচুর। পায়ে হেঁটে বা বন্দুকের ফাঁদ পেতে শিকার করে। কিন্তু কেউ জঙ্গলে যেতে চায় না। কে আর বেনাহক বাঘের হাতে প্রাণ দিতে চায়!

গোলপাতার চালান হয় এই ক্যুপ থেকে। ব্যাপারীরা সব হাত গুটিয়ে বসে আছে। সুন্দরবনের শিকারিদের মুরুব্বি ফকির এসে মাথায় লাল শালুর কাপড় বেঁধে মন্ত্র পড়ে— মুরগি ছেড়ে দেয়— বনবিবির কাছে মানত করে— কিন্তু তার সমস্ত কেরামতিই নিষ্ফল। বাঘের অত্যাচার ক্রমেই বাড়তে থাকে— প্রায়ই খবর আসে— কেউ-না-কেউ ঘায়েল হয়েছে।

এদিকে মহাজনি নৌকো সব সারি সারি বাঁধা। সরকারি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম বন্ধ— প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। দু-শো টাকা থেকে পাঁচশো টাকা উঠল একটা বাঘের মৃত্যুপণ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সুন্দরবনের এ অঞ্চলের বাঘগুলো কি তিরস্করণী বিদ্যায় সিদ্ধ? ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল? কীভাবে কখন যে তারা মানুষ উঠিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দেয়— কিছুতেই তার হদিশ মেলে না। মিস্টার আপরাইট নামে এক সাহেব প্রবেশনারি অফিসার সেসময় ওই অঞ্চলেই ছিলেন। তিনিও তাঁর সমস্ত সাহস ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে ব্যর্থ হলেন। এমনকী কী গান-ট্র্যাপ করেও কিছুই ফল হল না।

আমিও দু-তিন জন শিকারিকে সঙ্গে নিয়ে, সাহসে বুক বেঁধে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, আবার খালে খালেও বোটে ঘোরাঘুরি করি— সন্ধ্যার পূর্বেই লঞ্চে ফিরে আসি। কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?

কত আর বসে থাকা যায়? পাখি আর হরিণ শিকার করে মন ভরে না। যার জন্য এত কষ্ট স্বীকার, সেই মহাপ্রভুর দর্শন সুযোগসুবিধামতো না পেলে, ভাগ্যের দোষ দেওয়া ছাড়া উপায় কী।

আলতাফ হোসেনের কাছে একটা প্রস্তাব করে বসি,

BanglaBook.org

—কুদরতের কাছে শুনলাম, এখান থেকে মাইল দুই দূরে অনেক নৌকো একসঙ্গে রয়েছে, ব্যবসায়ীর দল, পেশাদার শিকারি আর লোকলশকরও অনেক ক-জন আছে, চলো না, ওখানেই আমরাও ভিড়ে পড়ি। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে। মি. আপরাইট আগ্রহের সঙ্গেই আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন, তিনিও আমাদের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

কাজেই আলতাফ হোসেন একরকম আমাদের চাপে পড়েই মত দিতে বাধ্য হলেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে একটা পাঁচশো মণি মহাজনি নৌকো জোগাড় করা গেল। অনিমেষকে সঙ্গে যাওয়ার কথা বলতেই সে নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বিমর্ষ উক্তি,

—কাজ কী বাপু— এত ঝামেলায় না গেলেই কি নয়? বাঘের রাজ্যে বাঘ আছে— ওদের পেছনে খামোখা লেগে কেন নিজের বিপদ ডেকে আনা— তার চাইতে লঞ্চে গিয়ে দিব্বি কয়েকদিন ভ্রমণ করা গেল। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

অনিমেষকে রেহাই দিলাম। আলতাফ হোসেন ডেপুটি রেঞ্জারকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে আমার সঙ্গে চলল। প্রবেশনারি অফিসার মি. আপরাইট, মানুষ হিসাবেও আপরাইট— বুক ফুলিয়ে আমার আগেই সেই মহাজনি নৌকোয় চেপে বসে।

পেশাদার শিকারি কুদরত খাঁ আমাদের সঙ্গেই বরাবর 'লাক ট্রাই' করে চলেছে যদি বাঘ শিকার করে পুরস্কারটা বগলদাবা করা যায়।

খালের জলে খানিকটা ছাড়াছাড়ি কয়েকখানা মহাজনি নৌকা ভিড় করে আছে। আমাদের নৌকাও সেখানে একধারে ভিড়ল। প্রত্যেক নৌকার সঙ্গেই একটি করে জালিবোট বাঁধা আছে।

সন্ধের আগেই সবাই নৌকোর পাটাতনের ওপরে ছোট্ট ঘরে কাঠের জানালা দরজা সব বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। দেখাদেখি আমরাও সেইমতো সতর্ক হয়ে থাকি। রাত অনেক হয়েছে— আর সবাই ঘুমিয়ে। আমার চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করি। হাতের কাছে পাঁচ ব্যাটারির টর্চলাইট আর ৪৫০/৪০০ বন্দুকটায় গুলি ভরে তৈরি হয়ে থাকি।

হঠাৎ একটা হইচই আওয়াজে চমকে উঠি। ঠেলা দিয়ে আলতাফ হোসেন আর আপরাইট সাহেবকেও ডেকে তুলি। কুদরত খাঁ নৌকার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়েছিল। সেও তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই বাইরে মাথা গলিয়ে দেখতে চায়।

নিমেষের মধ্যে আমিও জানলা খুলে টর্চের আলো সামনে ফোকাস করি। আশপাশের নৌকা থেকে, হা হুতাশ আর হইচই আওয়াজ শুনে আন্দাজমতো টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেলাম, বেশ খানিকটা দূরে একটা কেঁদো ডোরাকাটা বাঘ পাড়ের কাছে জলের ওপর দাঁড়িয়ে যেন হাঁপাচ্ছে— তার মুখে একটা জোয়ান মরদ।

এ অবস্থায় কী কর্তব্য, আলতাফ হোসেনকে জিজ্ঞেস করতেই সে মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়— না না, বাঘটা অনেক দূরে— এখান থেকে গুলি করে কোনো লাভ নেই— শুধু ওর মতলবটা লক্ষ করে যাও।

BanglaBook.org

কুদরত খাঁ বলতে চাইল— বাঘটা ওপরে উঠে যদি পালিয়ে যায়— কী করবেন? এখুনি গুলি করুন।

আলতাফ হোসেনের এক ধমকে সে চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল বাঘটা তার শিকারকে মুখে করে টেনেহিঁচড়ে পাড়ের ওপর উঠে পড়ল। এদিকে বিভিন্ন নৌকার ওপর যত লোকজন ছিল— তারা সবাই সমস্বরে এমনি একটা হইচই লাগিয়ে দিলে যে বাঘেরও বুঝি মাথার গোলমাল দেখা দিল। সে তার মুখের গ্রাস— সেই লোকটিকে পাড়ের ওপর কিছুটা দূর টেনে নিয়ে মাটিতে রেখেই পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

এদিকে রাতও শেষ হয়ে এসেছে। যে নৌকায় বাঘের হামলা হয়েছিল— সেখানে আমরাও নৌকা বেয়ে গেলাম, শুনলাম, বাঘটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জলে সাঁতার কেটে ছোটো জালিবোটে উঠেছিল— তারপর একসঙ্গে বাঁধা মহাজনি নৌকায় উঠে পড়ে। সেই নৌকার কাঠের জানালার ভিতরের হুড়কোটা বন্ধ না থাকলেও আলগা ছিল— পা চালিয়ে সেটাই ভেঙে ঢুকে পড়েছে।

কী আশ্চর্য, সাত সাতটা লোক ঘুমিয়ে ছিল, তার মধ্যে বেছে বেছে সব চাইতে তাগড়া জোয়ান লোকটিকেই বাঘ তুলে নিয়েছে। তারপর যে পথে আগমন, সেই পথেই

BanglaBook.org

নিষ্ক্রমণ— অতবড়ো একটা পাটজোয়ান মরদকে মুখে নিয়ে সাঁতরে পার হতে গিয়ে খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়, তাই টর্চের আলোয় তাকে হাঁপাতে দেখেছিলাম।

তখন বেশ ভোর হয়ে গিয়েছে। আমরা সবাই ও অন্যান্য নৌকারও অনেকে পারে উঠলাম। লোকটা খতম। বাঘের কামড় অনেকখানি বসে গিয়েছিল— জানোয়ারের চোয়াল দুটো বুঝি লোহার— তার নিষ্পেষণে লোকটার ঘাড় ভেঙে ঝুলে পড়েছে।

মিস্টার আপরাইট বললেন— গান-ট্রিক করেই এটাকে খতম করব।

কুদরত খাঁ-ও কুদরত দেখায়— মারির কাছে বাঘ না এসে যায় না—

আমার কিন্তু প্রস্তাবটা মোটেই মনঃপূত হল না— আলতাফ হোসেনকে বলি— না ভাই, এ-রকম ফন্দি করে বাঘ শিকারে প্রবৃত্তি আমার হয় না। তুমি তো জানো, আমি ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে তারপর শিকার করেছি। তুমি বরং এর কাছাকাছি একটা গাছে মাচান বাঁধার ব্যবস্থা করো। কিংবা কিছু দূরেই একটা গর্ত করে দাও, তার মধ্যে বসে থাকব— নিজের হাতে বাঘ শিকার না করলে আর মজাটা কী? আর না হয়, তান্ত্রিকের মতো মরা মানুষটার ওপরেই বসে আমি ব্যাঘ্র-সাধনা করব। শুধু তাঁর আগমনটাই চাই— হয় তিনি না হয় আমি— দুটোর মধ্যে একটা শেষ হয়ে যাক!

আলতাফের বিদ্রোহ ঘোষণা— না, কখনোই তা হতে দেব না— এর জন্য তোমার সঙ্গে যদি ফাটাফাটি হয়ে যায়— সেও ভি আচ্ছা।

তারপরই আলতাফ হোসেন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল— যা বললে— সেটা খুবই ঠিক, কিন্তু ওদিককার সুন্দরবনে মাচান বেঁধে শিকারের রেওয়াজ নেই। যাই হোক— তুমি আমার সম্মানিত অতিথি— তারপর তোমার বন্দুকও বহুদিন উপবাসী— যদি নিজের হাতে তার পিপাসা মেটাতে চাও— চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? অদূরে গর্ত করেই একটা টুল নিয়ে ওর মধ্যে বসে থাকবে, ওপরে ডালপালার আচ্ছাদন দিয়ে এমন করে ঢেকে দেব, বাছাধন বুঝতে না পারে— কি বল?

কুদরত খাঁ নিমরাজি ভাব দেখালে বটে, কিন্তু ডি. এফ. ও. সাহেবের আদেশ। কাজেই লোকজন জোগাড় করে বেশ একটা গর্ত করে ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলে।

বেলা পাঁচটায় আমি টর্চ ফিট করা হেভি রাইফেল নিয়ে গর্তে ঢুকে পড়লাম। ওপরটা প্ল্যানমতো ঢেকে দিলে। আর সবাই নৌকায় ফিরে গেল। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল— সারা রাত নৌকোয় জেগে থাকবে।

বসে আছি তো আছিই— প্রভুর দর্শন নেই। সুন্দরবনের বাঘ কি জাদু জানে?— সে কি ভেলকি দেখিয়ে আমাকে ঠকিয়ে যাবে?

বন্দুকটা ওপরে মাটিতে রেখে নীচে বসে আছি।

মনে মনে আরও চিন্তা করি, বাঘ যদি মাথার ওপর দিয়ে আসে, তাহলে? যা হবার হবে— সামনে, পেছনে, পাশে কড়া নজর রাখছি।

রাত প্রায় দুটো। ক্ষীণ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল, কী যেন একটা এগিয়ে আসে। বিরাট একটা হাঁড়ির মতো মাথা— সামনের দুটো পা সাঁতার কাটার মতো করে ধীরে ধীরে এপাশ-ওপাশ ফেলে মাতালের মতো টলতে টলতে সেই মারির কাছে এসে থামল।

BanglaBook.org

আমি টর্চ ফিট করা বন্দুক কাঁধে চেপে ধরলাম। তারপর ট্রিগারে আঙুল লাগিয়ে টর্চের বোতাম যেই টিপেছি— একরাশ আলোয় বাঘের সেই বিরাট মাথাটা অত্যন্ত পরিষ্কার আমার বন্দুকের নলের ঠিক সোজা পথে।

আলোর উৎসের দিকে তাকাতেই বাঘের গণ্ডদেশ স্পষ্ট চোখে পড়া আর গুলি ছোড়া একই মুহূর্তে।

জানোয়ারটা বিকট একটা গর্জন করলে বটে, কিন্তু সে ছুটেও গেল না, বা কোনো লাফও দিল না— শুধু ছিটকে একপাশে গড়িয়ে পড়ল।

বিচিত্র কী বেঁচে থাকার— তাই চুপ করে আছি।

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই সামনের নৌকাগুলোর যত লোকজন হট্টগোল লাগিয়ে দিলে।

কিন্তু রাত্রে কারো বাইরে আসার উপায় নেই— আমার অবস্থাটাও সেই অন্ধকূপ-হত্যার শামিল।

ভোর হতেই বন্দি জীবনের অবসান। সর্বাগ্রে ছুটে আসে কুদরত খাঁ— তারপর মিস্টার আপরাইট— সর্বশেষে আলতাফ হোসেন। সে চিৎকার করে বললে— সুন্দরবনের মাটিতে নেমে গর্তে ঢুকে এ ধরনের শিকার আজ পর্যন্ত ক-টা হয়েছে, জানি না শুনিওনি।

আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে সে বললে— শাবাশ ভাই শাবাশ! পুরস্কারের পাঁচশো টাকা তোমারই।

—না বন্ধু, তোমার টাকার পরিবর্তে আমরা বরং পরস্পর পাঁচশো আলিঙ্গন করি, এসে। তোমার মতো এমন একটা মুরুব্বি না থাকলে আমার দ্বারা কখনোই এ ধরনের শিকার সম্ভব হত না। তোমার খাঁটি বন্ধুত্বই আমার চরম পুরস্কার।

প্রবোধকুমার সান্যাল

কাহুভাগ জঙ্গলের খ্যাতি বিহারে কম নয়। গয়া জেলার মধ্যে যে জঙ্গলগুলি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন— যথা, রজৌলি, একতারা, জনকপুর— কাহুভাগ এদেরই একটি। বিশাল পর্বত, গহন আরণ্য, দুর্গম গুহা, লোকালয়হীন পার্বত্য উপত্যকা, বালুবহুল উপলখণ্ডময় জলধারা, এদেরই ভিতরে ভিতরে ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, প্যান্থার, লেপার্ড, হরিণ, শম্বর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই অরণ্যের ব্যাস ও দৈর্ঘ্য নির্ভুল হিসাব করা কঠিন— শোনা যায়, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত শত মাইল। যাঁরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি অরণ্য প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযোগ-সূত্রে গ্রথিত। অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে শ্রীহট্টের যোগাযোগ, সুন্দরবনের সঙ্গে নৈমিষারণ্যের। আমারও মনে হয় কথাটার সঙ্গে সত্যের ছোঁয়াচ আছে। ভারতবর্ষ অরণ্যময় দেশ এতে আর সন্দেহ নেই, মাঝে মাঝে প্রান্তর আর জনপদ, মাঝে মাঝে নদী ও পর্বতের ব্যবধান। এর জন্যে অরণ্যগুলির ভিতরেই কেবল আত্মীয়বিচ্ছেদ ঘটেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাগও হয়েছে— অর্থাৎ কেউ দক্ষিণী, কেউ গুজরাটি, কেউ বর্মি, কেউ-বা বাঙালি। বিহারে দেখেছি অরণ্যে অরণ্যে আত্মীয়তা। পালামৌ, হাজারিবাগ, কোডার্মা, গোমো, নিমিয়াঘাট, পরেশনাথ, রাজগৃহ, গয়া— রাষ্ট্রিক ব্যবধান ছাড়া এদের মধ্যে আর কোনো কথা নেই। দেওয়ানি মামলায় হাকিমের নির্দেশ মেনে নিয়ে ভাই ভাই যেন ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেছে; বিহারের অরণ্যগুলির ভিতরে আবহাওয়ার ঐক্য সহজেই বোঝা যায়— জল,

BanglaBook.org

বাতাস সাধারণ স্বাস্থ্য, মৃত্তিকার শুষ্কতা, মশা ও ম্যালেরিয়ার স্বল্পতা, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি, —অনেকের বিশ্বাস বর্মা ও সুন্দরবনের তুলনায় বিহার অনেকাংশে নিরাপদ— স্বাস্থ্যের দিক থেকে।

বিস্তৃত নদীবহুল অরণ্যে শিকারিদের অসুবিধা আছে। জানোয়ার সেখানে নির্লিপ্তভাবে বাস করে, পলি পড়া মৃত্তিকায় সাপের উৎপাত হয় প্রচুর, বিপদের সম্ভাবনা বেশি। সেইজন্য সুন্দরবনে আত্মরক্ষার সমস্যাটা বড়ো। শুষ্কমৃত্তিকায় দুর্ভোগ কম। বালুময় নদী, জল আছে কিন্তু কাদা কম। বিহারের জঙ্গলগুলি সেইজন্য যশোহর, খুলনা ও বরিশালের দক্ষিণভাগ অপেক্ষা কিছু 'ভদ্র'।

আমি শিকারি নই, যাঁরা আমার সঙ্গী, তাঁরাও নামকরা শিকারি কেউ নন। তাঁদের সব আছে, কিন্তু সাধ্য কতখানি তা আজও জানা যায়নি। বাঘ তাঁরা আজও মারেননি, সুতরাং এখনও তাঁরা 'আইবুড়ো'। শখ, একাগ্রতা, দুঃসাহস, কর্মশক্তি ও উৎসাহ আমাদের এই মহাদুর্গমে টেনে এনেছে।

কাহুভাগের অন্ধকার জঙ্গলে কণ্টাকাকীর্ণ ক্ষতবিক্ষত পথে যখন নামলাম রাত তখন অনেক। শীতে আড়ষ্ট, ভয়ে ভারাক্রান্ত, কৌতূহলে উৎকর্ণ— প্রথমেই লাঠিটা শক্ত করে ধরলাম। আমরা মাত্র পাঁচটি প্রাণী। হীরালালদার হাতে বন্দুক, নগেনবাবুর কাঁধে রাইফেল, ইমাম আলির কাছে স্পটলাইট, জংলির মাথায় ইলেকট্রিক মিটার। সকলের পিছনে আমি, আমার বাঁ-হাতে টর্চ। আমাদের মোটর অন্ধকারে এক জায়গায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তেওয়ারি রইল গাড়ির জিম্মায়।

আমাদের প্রথম বিস্ময় জাগল মানুষের গন্ধ পেয়ে। এই গহন অরণ্যে মানুষ! কিন্তু বিস্ময় কেন? এস্কিমোরা মানুষ, পশ্চিম আফ্রিকার নরখাদকরা মানুষ, নরমুণ্ডলোভী ফ্যাসিস্টরাও মানুষ— তবে এই শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে মানুষ থাকবে না কেন? কিছুদূর অন্ধকারে অগ্রসর হয়ে দেখা গেল, কয়েক ঘর দেহাতির বাস। তারা দিনের বেলা চাষ করে, গৃহপালিত পশু বিক্রি করে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর আর তাদের সাড়াশব্দ থাকে না। অনেকেই মাঝে মাঝে জানোয়ারের হাতে প্রাণ দেয়, অনেকে আবার বর্শা, বল্লম, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা জানোয়ারও বধ করে। রাত্রে যদিই-বা তারা ঘরের বার হয়, দল বেঁধে যায় হল্লা করতে করতে। শিকারি কোথাও এসেছে সন্ধান পেলে তারা সাগ্রহে সাহায্য করতে ছুটে আসে বকশিশের লোভে। একজনের ঘরের দরজায় এক প্রকাণ্ড শম্বর বাঁধা রয়েছে দেখা গেল। শম্বর হরিণেরই মাসতুতো ভাই— নিরীহ জীব, মারতে জানে না, মরতে পারে সহজে। ভারতবাসীর সঙ্গে ওদের প্রকৃতিগত ঐক্য। আমাদের দেখে কয়েকজন এসে দাঁড়াল, তারা আমাদের সঙ্গী হবে। আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিনে, যেন পরস্পর সকলেই বিচ্ছিন্ন, কেউ কারুকে চিনিনে। উপরে, নীচে, বামে, দক্ষিণে অন্ধকারের পর অন্ধকারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, সেই প্রাচীর ভিতরে ও বাহিরে একাকার, নিরাকার। আমরা সবাই এক শ্রেণিভুক্ত— কৃষ্ণকায় প্রেতের দল। হীরালালদা মিলিয়ে গেলেন জংলিদের মধ্যে, নগেনবাবু আর ইমাম আলির পার্থক্য গেল ঘুচে, আমার সঙ্গে বৃক্ষজটার প্রভেদ রইল না। যে আত্মীয়তা ছিল লোকালয়ে দিবালোকে, এই

BanglaBook.org

দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র, শঙ্কা ও সন্দেহে অবসন্ন প্রতি পদলেহন— কিন্তু উৎসাহে উল্লসিত প্রাণ, দুঃসাহসে দুর্জয় মন। আপন প্রাণচেতনা তখন স্পর্শ করতে পারি, নিবিড় করে অনুভব করতে পারি আপন অস্তিত্বকে— প্রতি রোমে রোমে প্রথম পুলক রোমাঞ্চ হয়ে উঠেছে।

অরণ্যের আকাশ সংকীর্ণ, তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে উজ্জ্বল নক্ষত্রদল। শাখায়-প্রশাখায়, লতায়-পাতায় শীতের তীব্র শীর্ণ বায়ু মর্মর শব্দে বয়ে চলেছে। চারিদিক অদ্ভুতভাবে নিস্তব্ধ। সেই স্তব্ধতা গভীরতর হয়, যখন শোনা যায় পক্ষীশাবকের মৃদু আর্তনাদ, কীটপতঙ্গের কাতরানি, কোনো জানোয়ারের বিচিত্র অস্পষ্ট কণ্ঠ। আকাশের তারার আলোয় হাতড়ে হাতড়ে চলেছি, কোনোদিকে কিছুই দেখছিনে— কিন্তু জানি, আমাদের পথের দুইপাশে অরণ্যে ঐশ্বর্যের সমারোহ।

শুক্লপক্ষের রাত্রে শিকারিদের গতিবিধির অসুবিধা। অরণ্যের মর্মে মর্মে যখন জ্যোৎস্না প্রবেশ করে, শিকারিকে তখন নিষ্ক্রিয়ভাবে মাচার উপর বসে থাকতে হবে। জানোয়ারের কান ভয়ানক উৎকর্ণ, চক্ষু তাদের সন্দেহে সজাগ। মানুষ নামক নূতন কোনো জানোয়ারের আবির্ভাব যদি অনুভব করে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে তারা গা-ঢাকা দেয়। জ্যোৎস্নালোকে তাই মানুষকে তারা অতি সহজেই আবিষ্কার করে ফেলে। কলিকাতা শহরের রাজপথে একটিমাত্র বাঘ দেখা গেলে যেমন সমগ্র শহরে চাঞ্চল্য জাগে, তেমনি অরণ্যে কোথাও মানুষের আবির্ভাব ঘটলে জানোয়ারগণের মধ্যে তেমনি চলে আন্দোলন। কেউ ঘোষণা করে দেয় গর্জনে, কেউ শব্দে, ছুটোছুটিতে। ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অনুভবশক্তি মানুষের অপেক্ষা তাদের অনেক বেশি। আত্মীয়তার আয়োজন তাদের অসামান্য। ব্যাঘ্রের চাতুর্য ও কুশাগ্রবুদ্ধি সর্বজনবিদিত। তবু তারা যখন প্রাণ দেয়, তখন বুঝতে হবে মানুষ তার অসতর্ক মুহূর্তের সুবিধা নিয়েছে। রাজরাজড়া, লাটবেলাট যখন বাঘ মারে, তখন তাদের প্রশংসা ও ছবি ছাপা হয় কাগজে কাগজে : কিন্তু শিকারিমাত্রই জানে এই হত্যাকাণ্ডে পৌরুষ নেই। প্রথমত, এইসব শিকারে শত শত লোক লাগিয়ে জঙ্গলকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে 'বিট' করা হয়; একদিকের পথ খোলা থাকে, সেই পথের উঁচু মাচার উপর বসে থাকেন নাড়ুগোপাল রাজকুমার; বাঘ যখন সেই পথ দিয়ে পালায় তখন ভালো একজন শিকারি তাকে প্রথম গুলি করে। বহু নামজাদা শিকারি আমার চেয়েও ভীতু— আমার চেয়েও দুর্বলদেহ। তারা শখের তৃপ্তির জন্য অরণ্যে যায়, সাহসের পরিচয় দিতে যায় না। একশত শিকারির ভিতরে একজনকে হয়তো পাওয়া যায়, যে প্রতিভাবান— জানোয়ারের গতিবিধি, রীতিনীতি ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যার পরিচয় আছে, যার আছে দুর্লভ সাহস, অজেয় প্রাণ, অসীম শক্তি ও বলিষ্ঠ স্নায়ুমণ্ডলী। সমগ্র ভারতবর্ষের শিকারিদের ইতিহাসে এইরূপ একজনমাত্র শিকারিকে দেখা গেছে, আমরা বাঙালিরা তাঁর জন্য গর্বিত, তিনি স্বর্গীয় কে. এন. চৌধুরী। অনেকেই জানে, চৌধুরী মহাশয় কখনো অসতর্ক জানোয়ার বধ করেননি। বৃহৎ লেপার্ড, ভীষণ রয়াল বেঙ্গল— এদের তিনি পাঞ্জা পাঠাতেন, আহ্বান করতেন সম্মুখ সমরে, সেই উন্মাদ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যখন চৌধুরী মহাশয়কে আক্রমণ করত, তখন তিনি তাকে বধ করতেন। এই বধ করার কাজ বড়ো কঠিন, কারণ প্রায়ই এক গুলিতে তারা মরে না। উদরে, পায়ে, পাছায়, এই সমস্ত স্থানগুলি বাদ দিতে

BanglaBook.org

হবে, কারণ এইসব স্থানে গুলি লাগলে বাঘ মরে না; মারতে হবে বুকে, শিরদাঁড়ায়, হাতের উপরিভাগে, কপালে কিংবা রগে। আক্রমণশীল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের সন্ধিস্থানে অকম্পিত হাতে লক্ষ্য স্থির করা, নিজের লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস, সাহসের প্রতি দৃঢ়তা, নার্ভকে অবিচল রাখা, অপরাজয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব— এই গুণগুলির জন্য কে. এন. চৌধুরী অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরণ্যই তাঁর উপরে প্রতিশোধ নিলে। তাঁর বিচারবুদ্ধিতে ঘটল মুহূর্তের ভুল। আহত মুমূর্ষু ব্যাঘ্রের চাতুরীর ফাঁদে তিনি ধরা দিলেন, কালাহান্ডির অজানা অরণ্যের গভীর গর্ভে তাঁর সেই ভুল চিরস্থায়ী হয়ে রইল। শিকারিদের জন্য একটি পরম শিক্ষা রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

পথের দিশা নেই, অন্ধকার থেকে চলেছি অন্ধকারে। সকলেই আমরা অন্ধ, কিন্তু ইমাম আলির চোখ দুটো জ্বলছে দপ দপ করে। সে একজন গুণী, কারণ অন্ধকারে সে

দেখতে পায়। দিনের বেলায় সে ঘুমোয়, রাত্রে জাগে। জানোয়ারেরাও তাই। রাত্রেই তারা বেশিরভাগ আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ইমাম আলি শিকারের নেশায় আবাল্য উন্মত্ত। জন্তু আবিষ্কার করায় তার আনন্দ, হত্যা করায় নয়। স্পটলাইটের আলোয় জন্তুর চক্ষুকে দিশাহারা করে দিতে সমগ্র গয়া জেলায় তার জুড়ি নেই। সে বকশিশও চায় না, অনুগ্রহও চায় না, তোষামোদও করে না, বিরক্তও হয় না। ইমাম আলি অদ্ভুত মানুষ।

মাঝপাথে হীরালালদা একবার থমকে দাঁড়ালেন। কাছাকাছি পৌঁছেই কানে কানে চুপি চুপি বললেন, শুনতে পাচ্ছ?

তাঁর গলার আওয়াজে যেন অজগর সর্পের নিশ্বাস শুনলাম। মুখ তুললাম, আমার চোখের তারার ভাষায় তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, দূরে অস্পষ্ট গর্জন! কাছাকাছি এসেছি। ভয় পেয়ো না, কঠিন করে হাঁটো।

তাঁর কথায় সেদিনকার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। এম. এ. পাশ করা একটি বাঙালির ছেলে রজৌলির জঙ্গলে এসেছিল শিকার করতে। সাহসী, বলশালী, পরিশ্রমী এক তরুণ। সঙ্গে ছিল লোকজন। তিন দিক থেকে জঙ্গল 'বিট' করা হল। ছেলেটি উঁচু মাচায় বসেছিল। এমন সময়ে সেই পথে এল বাঘ। ছেলেটির হাতে রাইফেল ছিল, বাঘ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। কয়েকটি মুহূর্ত, তার পরেই গুড়ুম। সঙ্গেসঙ্গে জঙ্গলের ভিতরে ঝটাপট শব্দ, সম্ভবত আহত ব্যাঘ্র পালিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে সাড়াশব্দ না পেয়ে লোকজন এসে দাঁড়াল। দেখা গেল, রাইফেলটা মাচার নীচে জঙ্গলের উপর পড়ে রয়েছে, ছেলেটির আধখানা দেহ মাচার ধারে ঝুলছে! সবাই গিয়ে তাকে ধরে নামাল, সে তখন বিড় বিড় করে কী যেন বকছে! শহরে এনে হাসপাতালে পরীক্ষা করা হল— ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চোখের সুমুখে বন্য ব্যাঘ্রের হুংকার তার স্নায়ুতন্ত্রকে আতঙ্কে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল; সেই অবস্থায় তার হাত থেকে রাইফেলটা খসে গিয়ে কেমন করে না জানি আপনাআপনি আওয়াজ হয়ে যায়। বাস্তবিক ভয়ার্ত ব্যাঘ্রের অরণ্যবিদারী গর্জন কাছে থেকে বরদাস্ত করা অসামান্য শক্তিমত্তার প্রয়োজন। ভগবতীপ্রসাদের কাছে শুনেছি, হ্যালেট সাহেবেরও এই অবস্থা ঘটে; তিনি পাগল হননি বটে, তবে পঁচিশ গজ দূরে বাঘ দেখেই তাঁর পরনের হাফ প্যান্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; সেই বাঘকে হত্যা করেন পার্শ্বোপবিষ্ট ভগবতীপ্রসাদ; কিন্তু গোপন বন্দোবস্ত অনুযায়ী মিস্টার হ্যালেটের নামেই সেটা চলে গেছে!

খানিকটা অবকাশ পাওয়া গেল, অরণ্যের ঘনিষ্ঠতা এদিকে কিছু কম। কোথায় যেন মহিষ আছে, তার গলার টুং টাং শব্দ কানে আসছে। আমরা ধারালো দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করতে করতে এগিয়ে চলেছি। কাছেই ছোটোখাটো আর একটা অড়হরের খেত পাওয়া গেল; অর্থাৎ লোকালয় আছে কাছাকাছি। চারিদিক বেষ্টন করে পার্বত্য অরণ্য, মধ্যস্থলে এই খেতখণ্ড। ছায়ার মতো আমাদের নিঃশব্দ গতি, খেতের ছায়ার জটলার ভিতরে আত্মগোপন করে চলেছি। দূরের গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। কালো রাত্রি দিগন্তে খাঁ খাঁ করছে।

ইমাম আলি হঠাৎ একটা ইঙ্গিত জানাল। মার্চ করা সৈন্যদের মতো আমরা সবাই মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পলকের ভিতরে রাইফেল ও বন্দুক উদগ্র! ইমাম আলি

BanglaBook.org

জানোয়ারের গন্ধে সজাগ হয়েছে। কোথায় জানোয়ার? কোনদিকে? কোন পথে? ইমাম আলি কি জাদুবিদ্যা জানে? অন্ধকারে কী উপায়ে সে জন্তু আবিষ্কার করে?

স্পটলাইটের মতো নির্ভুল রশ্মি গিয়ে পড়ল অড়হর খেতের মর্মস্থলে। আমার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত রক্ত উঠে এল চোখের তারায়! দেখলাম, মাত্র কুড়ি গজ দূরে তিনটি হরিণ। অড়হরের পাতা চিবোচ্ছে। আঃ, এমন দুর্লভ দৃশ্য জীবনে দেখিনি। আলিপুরের অথবা লাহোরের চিড়িয়াখানার আধমরা হরিণ নয়, দিল্লি থেকে রাজপুতানার পথে মাঠে-চরা হরিণ নয়— অরণ্যের হরিণ, পীতাভ নীল, সর্বাঙ্গে শ্বেতচক্র, কালো চোখে কাজলের রেখা টানা, কপালের শৃঙ্গশাখা— প্রাণময়, চঞ্চল, সুন্দর! ওরা যেন অরণ্যের প্রাণমূর্তি, যেন সফল স্বপ্ন, রহস্য ও বৈচিত্র্যের ওরা জীবন্ত প্রতীক।

গুড়ুম!!

মৃত্যুর ঝলকে আন্দোলিত হয়ে উঠল আকাশের তারকার দল, অরণ্যের নিবিড় নিস্তব্ধতা, বনদেবীর সন্তানবৎসল হৃদয়! যেন বন্দুকের টোটা আর অব্যর্থ সন্ধান ভুলে উলটো পথে আমারই বুকে এসে বিঁধল। মৃত্যুর আগে নিরপরাধ হরিণ যেন আমারই কাছে করুণ কণ্ঠে তার শেষ আবেদন জানিয়ে গেল। নিশ্বাস রুদ্ধ করে সেই মুহূর্তে নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করলাম— শিকারের জন্য আর আসব না অরণ্যে।

না, হরিণ মরেনি, কাঁচা-শিকারির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে! স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। টর্চের আলোয় কিছুক্ষণ রক্তের চিহ্ন খোঁজাখুঁজি করা হল, কিন্তু বৃথা, হরিণগুলো অক্ষত অবস্থাতেই পালিয়ে গেছে।

জনকপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করেছি। পথ অতি সংকীর্ণ; অনেক দিন বোধ করি এদিকে মানুষের সমাগম হয়নি, লতাপাতা আর আগাছায় পথ বুজে গেছে। আমাদের গাড়িখানা যেন এক অদৃশ্য সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে এসেছে। সম্মুখে, পিছনে সমস্তই একাকার; কেবল গাড়ির হেডলাইটের আলোর আভায় পথের দুই পাশে অরণ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর চলেছে। এটা বাঘের জঙ্গল— ইমাম আলি জানিয়েছে। কথাটা মিথ্যা বলে মনে হল না। আগের জঙ্গলে স্পটলাইটের আলোয় সহস্র সহস্র উজ্জ্বলন্ত মণিমাণিক্যের মতো জন্তুগণের উদ্ভ্রান্ত চক্ষু দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে তাদের চিহ্নও নেই। এখন একটা প্রাণীহীন বিচিত্র জগৎ। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সর্প, খরগোশ, শিয়াল, হরিণ— কিছুরই চিহ্ন নেই। কিছু নেই, তার কারণ এখানে বাঘের আবাস। হরিণের দল দেখলে জানা যায়, বাঘ সেদিকে থাকে না; তেমনি বাঘ থাকে যে জঙ্গলে আর কোনো জন্তু প্রবেশ করে না। বাঘ বড়ো সাম্প্রদায়িক, হিংস্র। সে মনে করে, অরণ্যটা তারই জন্য সৃষ্টি, তারই রাজ্যপাট, তারই শাসনে চলবে সব। শান্তিবাদী ভদ্র জানোয়ারের স্থান তার এলাকায় নেই। একমাত্র বানর ছাড়া আর কোনো জন্তু বাঘের জঙ্গলে পাওয়া যায়নি।

বানরের কথায় সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল। এইদিকেই এক জঙ্গলে 'আদমখোর' (man-eater) এক বাঘের ভয়ানক উৎপাত শুরু হয়। অনেকগুলি চাষি আর জংলিকে সে হত্যা করেছে। মানুষের রক্ত ও মাংস খাবার পর আর কোনো জন্তুর প্রতি বাঘের আসক্তি থাকে না; কারণ মানুষের রক্ত ও মাংসে লবণ আছে, সেইজন্য অতি সুস্বাদু

BanglaBook.org

—delicious! অতীব 'আদমখোর' বড়ো ভয়ংকর। তাকে ধ্বংস করতেই হবে। যাই হোক, সেই বাঘটাকে শিকার করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। বড়ো বড়ো শিকারি এসে হাজির। ইব্রাহিম নামক এক বৃদ্ধ মুসলমান পথপ্রদর্শন করে একে একে প্রত্যেকটি শিকারিকে সেই জঙ্গলের ভিতরে রেখে এল। প্রত্যেকবার একজন মাত্র। কিন্তু এই পর্যন্তই, পরের দিন দেখা যায়, শিকারির ছিন্নভিন্ন দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত! এইভাবে পাঁচ-ছয়জন নামজাদা শিকারি প্রাণ দেয় ও বাঘের উৎপাত বাড়তে থাকে।

সরকার ঘোষণা করলেন, হাজার টাকা পুরস্কার!

তখন একজন সাহেব এলেন। ইব্রাহিমকে খবর দেওয়া হল। ইব্রাহিম এসে বললে, তোমার মতো চারজন সাহেব প্রাণ দিয়ে গেছে, হাজার টাকার লোভে কেন প্রাণ দিয়ে যাবে? ওহে ইংরেজ, বাড়ি ফিরে যাও।

সাহেব নাছোড়বান্দা। সুতরাং ইব্রাহিম তাকে পথ দেখিয়ে সেই বিশেষ জঙ্গলটার দিকে ছেড়ে দিয়ে এল। সাহেব একাই জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। বেলা অপরাহ্ণ। আকাশের পশ্চিমে সূর্য, কিন্তু নীচে অরণ্যে তখনই অন্ধকার দল পাকাচ্ছে। সাহেব ভীত-দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ করলেন। প্রাণী কোথাও নেই। কীট, পতঙ্গ, শৃগাল, বন্যকুকুর, হরিণ— কোথাও কিছু নেই। তিনি দেখলেন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এক-একটা নরকপাল, কোথাও চর্বিত মনুষ্য-কঙ্কাল, কোথাও শুকনো রক্তের দাগ। চলতে চলতে দেখা গেল, এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গর্ত। বোঝা গেল, শিকারিরা এই গর্তের ভিতর নেমে লুকিয়ে বাঘের দিকে লক্ষ রাখত। কেউ মাচায় উঠে, কেউ গর্তে নেমে। সাহেব তাঁর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে অসীম সাহসে সেই গর্তের ভিতরে নামলেন। তাঁর বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এইখানে বাঘ আসে। নিকটেই ছোটো একটি জলাশয়। অরণ্যের জলাশয় বিপজ্জনক।

এমন সময় হঠাৎ বানর লাফাতে লাফাতে এল, একবার সাহেবকে লক্ষ করল, তার পরেই তীব্র কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল। লক্ষণটা ভালো নয়। সন্দেহক্রমে সাহেব গর্তের ভিতর থেকে উঠে নিকটবর্তী এক গাছের ডালে আরোহণ করলেন। তারপর কয়েকটি মুহূর্ত। দেখতে দেখতে এক বিশালকায় ব্যাঘ্র ছুটে এসে সেই গর্তের ভিতরে লাফ দিল। একটি নিমেষ! পরমুহূর্তেই গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

তিন গুলিতে ব্যাঘ্রের মৃত্যু!

বানরটার হঠাৎ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠল! সাহেবকে সে আক্রমণ করবার জন্য দৌড়ে এল। বটে, বানরের এত বড়ো স্পর্ধা!

গুড়ুম! — এক গুলিতেই বানরও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা। তখন লোকলশকর নিয়ে সেই বাঘ ও বানরের মৃতদেহ তুলে আনা হল। পরদিন ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল, বাঘটা ছিল অন্ধ! প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্যযোগে বানরটার সঙ্গে ছিল ব্যাঘ্রের বন্ধুত্ব। দুইজনের ষড়যন্ত্রে অতগুলি শিকারির প্রাণ গেছে! সাহেবের ডায়েরিতে এই বিচিত্র বন্ধুত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস লেখা আছে। প্রকৃতির ভাষা মানুষের নিকট চিরদিনই অপরিজ্ঞাত।

BanglaBook.org

অসাড় অবশ অবস্থায় বসে আছি। শীতের ঠান্ডায় গরম কাপড়চোপড়ের ভিতর থেকেও হাত-পাগুলো জমে গেছে। চক্ষু আমাদের সজাগ। শোনা গেল, তিরিশ মাইলের

ভিতরেও এখানে লোকালয় নেই। ভয়ে, সাহসে, আনন্দে, কৌতূহলে মনের অবস্থা জটিল। দুই পাশে অরণ্য এত উঁচু যে, হঠাৎ কোনো জানোয়ার অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করলে প্রাণ বাঁচানো কঠিন। এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে— গাড়ির ভিতর থেকে মানুষ তুলে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। গাড়ির হেডলাইটের রশ্মি দশ-পনেরো গজের বেশি দূরে যায় না— তার বাইরে সমস্তই আমাদের কাছে অজানা। পথের নানা বাঁক, নানা বাধা, নানা সমস্যা। মাঝে মাঝে ঝিল্লিরব, কোথাও কোনো কীট কোন অলক্ষ্য বৃক্ষের মর্মস্থলে দাঁত বসিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে— তারই একঘেয়ে শব্দ। কোনো পাখির ডানার একটা ঝাপটা, কোথাও শুকনো পাতার ভিতর দিয়ে গিরগিটির সরসরানি। মাত্র এইটুকুই— বাকি আর সমস্তই নিঃশব্দতার সমুদ্রের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; বন্দুকের গুলিও বোধ হয় সেই নীরবতাকে ভেদ করতে অক্ষম।

তবু একসময় ফুলের গন্ধে ফিরে পেলাম আমার পরিচিত পৃথিবীকে। আমিও অরণ্যেও, বোধ করি মর জগতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। একদা ভীষণ ভয়াল সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে যে এক ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রাত্রির ইতিহাস; তারপরে এক নূতন গন্ধ পেয়েছিলাম চিররহস্যময় অরণ্যের— শিকড়ের সঙ্গে মৃত্তিকার, বৃক্ষকোটরের সঙ্গে সর্পদেহের, লতাপাতার সঙ্গে পাখির ডানার, শাখাপ্রশাখার সঙ্গে জড়ানো জন্তুর নিশ্বাসের। যেন এই অরণ্যের জটায় জটায় বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীনের গন্ধ, যেন পৌরাণিক যুগের তপস্বীগণের গঙ্গাযাত্রার গন্ধ, মৃত্যুর পরপারে যেন কোন অজানা জীবনের গন্ধ। ফুলের গন্ধেও সেই কথা। একে আস্বাদ করিনি লোকালয়ের লোকযাত্রায়, এ ফুল ফোটে না কোনো উদ্যানে, এ ফুল নয় পৃথিবীর।

এর পরে কী পাব সেই সামগান-মুখরিত প্রাচীন তপোবন, বল্কলধারী সন্ন্যাসীর কাছে? যাদের আশ্রমপ্রান্তে পাব ব্যাঘ্র আর হরিণের অদ্ভুত সমন্বয়, হিংসা ও অহিংসার নিবিড় যোগসূত্র, সংহার ও শান্তির পরম সংগম?

এই গন্ধ কি আমাদের সেই পথে নিয়ে যাবে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কুমুদনাথ চৌধুরী

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারই পরিচিত কোনো স্থানে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হতে একটি ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়ে, সপ্তাহ-তিনেকের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজনে বড়ো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কাঠ-ভাঙা, ফুল কুড়িয়ে আনা, একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়। নিজে অলক্ষ্যে থেকে শিকার ধরার পক্ষে সেই ব্যাঘ্রটির বিশেষ সুবিধাজনক জায়গা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গোরুর গাড়ি সারি সারি আসে, সেইখানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন শুনলাম। তিনি বাঘিনী হলেও শিকারি কম ছিলেন না— গাই, বলদ, ছাগল, ভেড়া সবই উজাড় করেছিলেন। স্থানীয় শিকারি তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় সে তখন মৃত গোরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরছিল। কিন্তু বেচারা শিকারির কাছে যে কার্তুজ (cartridge) ছিল তা ফেটে গুলি বাহির হয়নি। বাঘিনী সেই যে চমকে পলায়ন দিলে তারপর আমরণ সে আর প্রলোভনে ভোলেনি বা ফাঁদে পা বাড়ায়নি।

শিকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটি স্টেশনে এসে আমার সঙ্গ ধরলেন। রাতদুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম। যাঁদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাঁরা পোঁটলাপুঁটলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের

প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস।

ভোর হতে-না-হতে আমরা মহাসমারোহে যাত্রা শুরু করলাম। প্রশস্ত রাজপথ—সুন্দর আধুনিক পথ। কিছুক্ষণ পরে ব্রিটিশ রাজ্যের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। অতঃপর হস্তীপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়ে পৌঁছোলাম। এর আগেই শিকার-সন্ধানে লোক জড়ো করে চারিদিকে পাঠানো হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থাপন হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্নরাজ্য। গোধূলির শ্যামচ্ছায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত হয়ে এল, তখন চারিদিক হতে সম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মতো আহ্বান-রব বারংবার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গলবাদ্য!

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ-ছয় দিনের বাসি খবর। যাই হোক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন। সংবাদ এল, সূর্যোদয়ের শুভলগ্নে খানিক দূরে বাঘিনী একটি স্ত্রীলোককে ভোগে লাগাবার উদ্যোগ করেছিল, পারেনি। সে কোনোরকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাঘ্রী একটি নালার মধ্য দিয়ে অন্য পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তার পায়ের টাটকা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে যে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তার পা থেকে ঝরে পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নালার পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে, সেইখান হতেই তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল।— কোথাও গড়িয়ে পড়া এক খণ্ড পাথর, কোথাও-বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া সুকুমার লতাগুল্ম, কোথাও-বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ। এই দেখেই পথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সত্বর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠেনি, কেননা স্থিরনিশ্চয় না হয়ে পা বাড়ানো আমরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিনি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়টি ছেড়ে সে অধিক দূরে অগ্রসর হবে না জেনে, নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট; তার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ দুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উঁচু একটা পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরও দুটি পাথরের ঢিবি, আর গুটিকতক গাছও ছিল। ঘাটের পথ থেকে দু-চারটি সরু গলি, এরই মাঝখান দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপর মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটিকতক গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এমনিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোনো অসুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হলেই যে লুকোবার সুবিধা হয়, শিকার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ চিত্তে যায়, দেখতে পায় না, সেকথা সহজে বিশ্বাস হয় না। মানুষের গন্ধ হয়তো-বা পায়, কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে সে-গন্ধও কম হয়ে আসে। আর যদি চুপচাপ বসে থাকা যায়, তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবার, ধরা পড়বার সম্ভাবনা বড়ো একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা

BanglaBoi.org

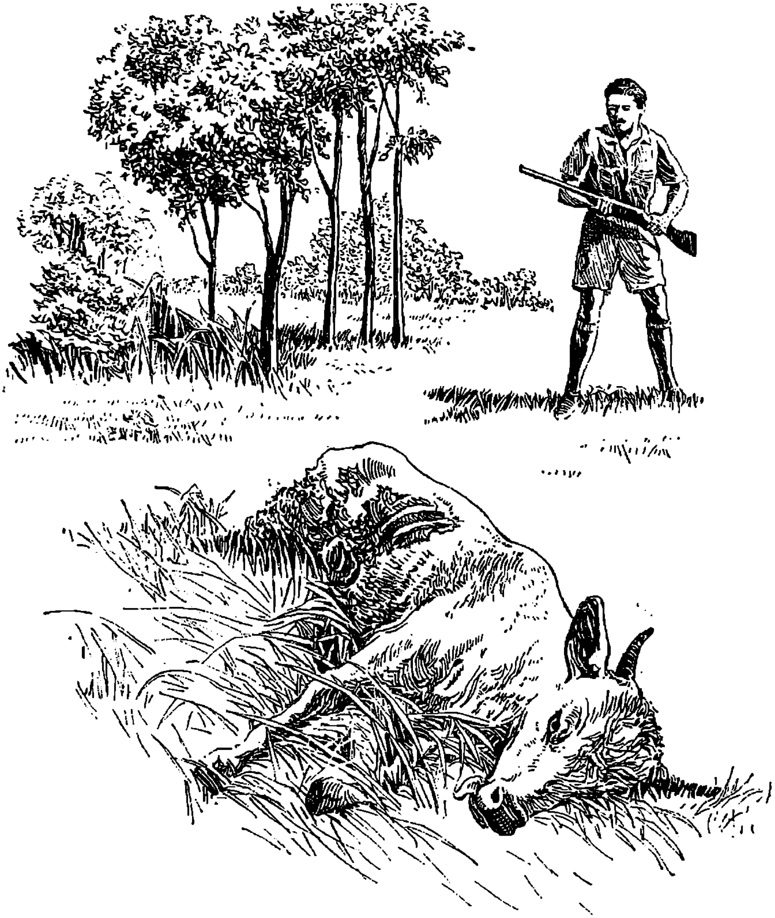

হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাজ, কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে শিকারির মজ্জা-পেশি ক্রমে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন কোথাও আর এতটুকু কাঁপে না, কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম, সেখান হতে চারিদিকে গাছপালা আর গলিঘুঁজির জন্যে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডান পাশে পাহাড়টা গড়িয়ে নামার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. Bকে একখানি ছোটো খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল আর সেইখানকার একজন গোঁটিয়া তার সঙ্গে ছিল। চট করে গাছে চড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, সে তারই মধ্যে অবলীলাক্রমে নিজের ঘুরবার ফিরবার সুবিধা করে নিত; কোনোরকমে আড়ষ্ট হত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাকও ছিল।

BanglaBook.org

প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষার পর বনের মধ্যে হতে যেসব শিকারিরা বাঘ তাড়া করে আনছিল তাদের শোরগোল শোনা গেল। আরও কিছুক্ষণ যাবার পর আমাদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম স্থূলাঙ্গী একটি ব্যাঘ্রী ত্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে। নিমেষের জন্য সে প্রস্তরস্তূপের ব্যবধানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই তার মস্তক আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা-মাত্রই আমি তার স্কন্ধদেশ লক্ষ করে বন্দুক ছুড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কী একটু শব্দ হয়েছিল তাতেই সে ঘাড় ফিরালে। গুলি তার কানের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল। তৎক্ষণাৎ সে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়াচড়া করলে না, তখন বন্দুকের যে নলটি খালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার পুরে কী ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শিকারিরা কয়েকজন পাহাড়ের মাথা হতে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে, আর বাকি কয়েকজন সম্মুখে কিছু দূরে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যবনিকাপতন না হয় ততক্ষণ এ সাবধানতা বিশেষ আবশ্যক।

BanglaBook.org

জয়গর্বে উৎফুল্ল আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। সংকেতসূচক বাঁশিটি বাজিয়ে দিলাম। তখনই চারিদিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সংকেতে মহানন্দ প্রকাশ করলে ও নিকটে এল। K. G. B. আর গৌটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্ররাজ-পত্নীর রাজযোগ্য অঙ্গাবরণ আর বর্ণের প্রশংসা করতে লাগলেন।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্যঙ্কে শয্যা রচনা করে দিয়ে, বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা করলে। আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গৌটিয়া গজরাজের পুচ্ছদেশে লম্বমান হয়ে তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে। কাছে গিয়ে দেখলাম বাঘিনীটি কৃশোদরী। তার চামড়াখানি বড়োই সুন্দর।

শিকার করে এমন সুন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়, তবে তাকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ যত্ন করতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চর্মশোধনকারী Messrs. Rowland Ward-এর নিকট ওই চামড়া লন্ডন শহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জার্মানদের অনুগ্রহে জাহাজডুবির অসম্ভাবনা ছিল না। এর আগে আর পরে যেসব পার্সেল পাঠিয়েছিলাম, সবগুলিরই পৌঁছানো সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হল, কিন্তু এ চামড়ার অনেকদিন কোনো সংবাদ না পাবার পর একদিন হৃদয়বিদারক সংবাদ এল যে, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্সেলটি হারিয়ে গিয়েছে! হায়, এমন বিজয়-আনন্দের পরিণাম যে এমন শোকাবহ হবে তা কে জানত! কিন্তু এ ক্ষতি পূরণ হবার উপায় ছিল না!

হীরালাল দাশগুপ্ত

শিকার শেষে ভোরের দিকে যখন জঙ্গল থেকে ফিরছি, তখন চোখ দুটি শ্রান্ত। মনের শ্রান্তিও কম নয়। একটা বাঘের উপরে দু-তিনটে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আর দু-তিনটে গুলি অন্তত ওর গায়ে লেগেছে। কিন্তু বাঘ খুঁজে আনা সম্ভব হয়নি। মোটরের মাডগার্ডের উপরে যে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ওটা একটা শম্বর। দুটো বন-শুয়োর দিয়ে এসেছি জঙ্গলের সাহায্যকারী লোকজনদের খাওয়ার জন্যে।

আমাদের শিকারের প্রথম পাঠ তখনও শেষ হয়নি। শস্ত্রচর্চার এই অধ্যায়ে থাকে প্রবল উৎসাহ আর প্রবলতর উত্তেজনা। নবী আখতার আমাদের অরণ্যের পথপ্রদর্শক, শিকারের পরিচালক এবং সমস্ত ব্যাপারটার ব্যবস্থাপক। কোথায় জানোয়ার পাওয়া যায় তার ঠাঁইঠিকানা ওর জানা আছে। এ ছাড়া মোদিয়া আর পুনোয়া—এই দুই পদাতিক, কখনো-বা ফাগুয়া, বনের নিত্যকার নূতন খবর জুগিয়ে নবী আখতারকে ওয়াকিবহাল করে রাখে। ওরা নবী আখতারের মতোই এই পার্বত্য অঞ্চলের আরণ্যক।

ওদের হালচালে মনে হয়, ওরা কোনো বিস্মৃত যুগে প্রতিদ্বন্দ্বী বাঘের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল। মনের কোথায় যেন লুকিয়ে আছে সেই প্রতিহিংসার জ্বালা। তাই শস্ত্রধারী শিকারিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বাঘের গুহাগহ্বর। শার্দূলের মতো নিঃশব্দে ওরা চলে। চলার কৌশলও ওদের আয়ত্তে আছে সেই জানোয়ার-জীবন

BanglaBook.org

থেকে। এজন্মে চারটে পা ওদের নেই। পা খসে গিয়ে সেখানে গজিয়েছে দুটো করে হাত।

সকালে ও অপরাহ্ণে ওরা পা টিপে টিপে এগুতে থাকে, জঙ্গলের ঝরনার দিকে। মহুয়ার আশেপাশেও থাকে ওদের তীক্ষ্ণ নজর। ঝোপের আড়াল থেকে বাঘ ওদের ভ্যাংচালে, ওরা ওই হাত দুটো দিয়ে টপাটপ গাছের উঁচু সরু ডালে চড়ে যায়। বাঘ রক্তচোখে তাকালে ওরাও জবাব দেয় চোখে চোখে। ওদের চোখ থাকে দিনরাত মহুয়ার নেশায় আরক্ত। বাঘকে ওরা ভয় নিশ্চয়ই করে, কিন্তু বাঘও যে ওদের দেখলে ভয় পায় না, এমন নয়। সুযোগ সুবিধা পেলে কেউ কারোর ঘাড় মটকাতে কসুর করে না। বাঘের ঘাড় মটকাতে মোদিয়াদের প্রয়োজন হাতিয়ার-বন্ধ শিকারির। সে-ব্যাপারে নবী আখতার ওদের উপযুক্ত মাধ্যম। শিকারি এসে জোটে নবী আখতারের কাছেই। সে নিজেও অদ্বিতীয় ধনুর্ধর।

তখন শুক্লপক্ষ। এই পক্ষে বাহিরের শিকারির আনাগোনা খুব কম। দৈবাৎ কোনো ভারী 'আমির আদমি' এসে ছাউনি ফেলে। লোকজন জুটিয়ে বাঘ শিকারের জন্য তৈরি করে কয়েকটা মাচা। প্রত্যেক মাচার কাছে ফাঁকাতে রাস্তার মতো জায়গায় বাঁধা হয় জ্যান্ত মোষ। কোনো ছেঁড়া কাপড়, কাগজের টুকরো, গাছের নূতন কাটা কোনো ডাল দেখতে পেলে মানুষের শয়তানি বুঝে নিতে বাঘের বিলম্ব হয় না। আড়াল থেকে বাঘ গাছের ডালে মাচার দিকে তাকিয়ে সরে যায়। হয়তো দূর থেকে মানুষের এই কাপুরুষোচিত ভণ্ডামির জন্যে 'হুম' করে গর্জন করে। বনের জানোয়ারেরা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে যায়। কিন্তু সন্দেহের কারণ না ঘটলে বাঘ এসে রজ্জুবদ্ধ মোষকে পাকড়াও করে।

তার পরের ব্যাপার অতি সংক্ষিপ্ত। কখনো বাঘ গুলি খেয়ে গড়াগড়ি যায়। হয়তো গুলিলাগা জায়গাটা প্রচণ্ড তেজে কামড়ে ধরে— কল্পিত অপরাধীকে সাজা দিতে। কখনো-বা বিরাট হুংকারে ছুটে যায় আততায়ীর সন্ধানে। নূতন শিকারি হলে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে পাগলের মতো। বাঘ উল্লম্ফনে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে। বন্দুকের শব্দে ঘুম-ভাঙা পাখি আর্ত চিৎকারে উড়ে যায় অন্য গাছে।

যখন বিষণপুরের পাহাড়চূড়ায় চাঁদ নিবু নিবু হয়, পাণ্ডুর চন্দ্রকলা আবছা মায়াজাল বিছিয়ে দেয় মহুয়াটাঁরে, যখন মহুয়াবীথি মদালস চোখে ঝিমিয়ে পড়ে, তখন কদাচিৎ একটি শিকারি এগিয়ে আসে গোবিন্দপুরের রাস্তা ধরে।

কমলপুরের পাহাড় থেকে বাঁয়ে। মোটর সন্তর্পণে গড়িয়ে চলে মহুয়া বনে। ওখানে মহুয়ার গন্ধে ভালুক আসে। হরিণ আসে। কখনো-বা হরিণের পিছু নিয়ে আসে বাঘ। নবী আখতার ছাড়া সে-বাঘের সন্ধান বড়ো আর কেউ পায় না। ঝরনার ধারে সন্ধ্যা-সকালে বাঘের পায়ের ছাপ পড়েছে কি না, সে-খবর রাখে নবী আখতার। বাহিরের শিকারিরা সে-খবর রাখে না।

কী বিশাল সুদূরবিস্তৃত এই মহুয়াটাঁর! মানুষ নাই, জল নাই, বন্ধুর প্রান্তর। শুধু খাড়া দুটো কান উঁচু করে লাফিয়ে চলে খরগোশ। কখনো চোখে পড়ে, কখনো অদৃশ্য হয় খাদের ভিতরে। প্রান্তরের কোথাও পিঠটা উঁচু হয়ে উঠেছে উটের মতো, কোথাও-বা

BanglaBook.org

নীচু। নালা খাদ গহ্বর। এই খাদ না থাকলে এই মহুয়া-লোভী জানোয়ারেরা শিকারির গুলি থেকে বাঁচবে কী করে! একসঙ্গে যে ধরা পড়বে সব গোষ্ঠী-গোত্র।

অসংখ্য মহুয়া তরু— অগণ্য। শত শত হাজার হাজার। চৈত মাসে উপর থেকে সারাদিন টুপটাপ করে ফুল ঝরে। সুগন্ধে ভরে যায় বন উপবন। কামিনী, জুঁই আর মতিয়ার গন্ধ নয়। বাতাবি ফুলের গন্ধও নয়। মিষ্টি গন্ধ। গন্ধে যেন নেশা ধরে। দিনে শোভা, সুবাস। রাত্রের অরণ্য সেই গন্ধে মশগুল। হঠাৎ পাতায় পাতায় বাতাসের শিহরন জাগে। বাতাস বয়ে নিয়ে যায় এই গন্ধ অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে।

আশ্চর্য প্রকৃতি। কোন শিল্পী গড়েছে একে? কার তপস্যা? কার কমল-কোরক-সদৃশ অঙ্গুলি পত্রপল্লবে বুলিয়েছে এই রং, পুষ্পে এই সুরভি? কার খুশির সাধনায় এরা পরেছে এই বেশ— বর্ণ— গন্ধ? কোমল দেহে এমন উপচে-পড়া তৃপ্তি? সবই আশ্চর্য। মহুয়া বনের ভিতর দিয়ে চলতে মনে হয় স্বপ্নলোকের পথিক আমরা। চলার সঙ্গী এই নিঃশব্দ তরুশ্রেণি। বুঝতে পারছি, ওরা সজীব, ওরা জীবন্ত। ওই রূপ, ওই বর্ণ, ওই গন্ধ, ওই মৌন তৃপ্তি— ওই ওদের ভাষা। ওদের আবেদন আসে অন্তরের অতলে।

সেদিন আমাদের ঘোরাফেরায় মহুয়ার নেশার ঘোর কেটে গেছে। এরা আমাদের পায়ে পায়ে চলেছে পথের সঙ্গী রূপে। এগিয়ে গেলে সঙ্গে যায়। পিছে যায় পিছিয়ে গেলে। তখন শিকার খুঁজব, না পাহাড়ের ভালে দেখব পাণ্ডুর চাঁদের টিপ-পরা চন্দ্রচূড়, না পুলকের আসর জমাব স্বপ্নলোকের এই বিহ্বল সাকিদের সঙ্গে!

হঠাৎ মনের ভিতরের হিংস্র জানোয়ারটা জেগে ওঠে বহেরা নবী আখতারের ইংরেজি বুলিতে : 'ব্যাক— ব্যাক!' নবী আখতার শিকার দেখেছে। একচক্ষু চন্দ্রকলা তখন চোখ বুজেছে। মহুয়াটাঁর পেছনে ফেলে এসেছি— সে বহু দূরে। ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে একটা অড়হরের প্রকাণ্ড খেত। অড়হর গাছগুলির এক প্রান্ত কাঁপছে। ওখানেই শিকার। জানোয়ারটা আলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে লুকিয়েছে খেতের প্রান্ত থেকে ভিতরের দিকে। কিন্তু শিকারি তাকে ছাড়ে না। টর্চ নিয়ে সন্ধান করছে অড়হরের ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ চলন্ত মোটরটা লাফিয়ে উঠেছে। মোটরের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিলাম। ধাক্কা সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। এমনি প্রায়ই ঘটে। কিন্তু মাথার ভিতর তখন ক্ষিপ্ত অজগরটা ফুঁসছে। সামনে বাঁয়ের দিকে ছুটছে একটা প্রকাণ্ড দেহ। রাইফেলটা তুলে ট্রিগার টেনে দিলাম। জানোয়ারটা লাফিয়ে পড়ল। আর উঠল না। ওটা একটা শম্বর। ও মানুষ মারে না। গৃহস্থের ফসল খায়। একপাল শম্বর সাবাড় করে ফেলে একটা ফসলের খেত, একরাত্রে। দরিদ্র চাষির প্রাণান্ত পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসল। সকলে লক্ষ্যভেদের জন্য সাধুবাদ দিলে। আমি খুশি হই না। আমি ভাবি, গুলিটি লেগেছে দৈবাৎ। তবু এমন নিখুঁত নিশানা! একটা বাঘ— নিদেন একটা ভালুক হলেও তো পারত!

সে যাই হোক। এবার আর মহুয়ার নেশা নেই। নেশা জমেছে রক্তের। সুরার চেয়ে তীব্র সে-নেশা। গাড়ি হাঁকাও— 'গো অন।' নবী আখতারের হুকুম। গাড়ি ছুটল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। পাহাড় আঁকাবাঁকা হয়ে ঘুরছে দক্ষিণে। বাঁয়ে কালী পাহাড়ি। ওদিকে প্রস্তরায়িত তর্জনী তুলে পাহাড়টা চলেছে মহাদেওস্থানের অরণ্য লক্ষ করে। মহাদেওস্থান!

BanglaBook.org

বড়ো গভীর ও অরণ্য। ওটা শ্বাপদের আলয়। কিন্তু বছরে একরাত ওখানে মহাদেবের ধ্যান ভাঙে। কত যুগযুগান্ত পূর্বের শিলাময় শিব। বছরে এক রাত! অমানিশার অন্ধকারে মিটমিট করে তাকান পূজারিদের পানে প্রসন্ন চোখে। ওখানে পূজার ডালি বয়ে সানুচর আসেন মকসুদপুরের রাজা। প্রদীপ জ্বলে। ডমরু বাজে। কবে কোন পিতৃপুরুষ সুদূর অতীতে স্বপ্নে পেয়েছিল তাঁর আরাধ্য দেবকে এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের আঁধারে। আজও তাঁর ডাক আসে শিবচতুর্দশীর অন্ধরাতে। ভুজঙ্গ তাঁকে পথ ছেড়ে দেয়! শার্দূলের চোখ ঝিমিয়ে আসে। ভক্তদের বিনিদ্র রাত কাটে দেবাদিদেবের ধ্যানে। অদূরে শেয়াল ডাকে প্রসাদের আশায়। হায়েনারা ওত পেতে আড়ালে চোখ মিটমিট করে। বিষণপুরের পাহাড়ের বাঁকে ওই প্রস্তর-তর্জনী উদগ্র হয়ে আছে মহাদেওস্থান নির্দেশ করে।

সামনেই আবার বন্ধুর উপত্যকা। কাঁটা-গুল্ম, ঝোপঝাড়, প্রস্তরখণ্ডে সমাকীর্ণ। গা এলিয়ে শুয়ে আছে রাস্তা জুড়ে একটা খুদে পাহাড়। কবে পাহাড় গর্ভে সঞ্চিত সাগর পাথর ভেঙে বেরিয়েছিল দিগ্‌বিজয়ে। আরও কাজ ছিল— ঊষর পাহাড়ের রুক্ষতাকে রসধারায় ভিজিয়ে গলিয়ে সেখানে প্রাণসঞ্চার করতে কোটি কোটি জীবাণুর বীজাণুর— আর প্রাণীর। আজ পানীয় জোগাতে তৃষিত বনানীর, তৃষাতুর ফসলের আর জলস্রোত নেই। আজ ওখানে পড়ে আছে ওই পাথুরে কবন্ধ।

আমাদের গাড়ি ওখানে পৌঁছুতেই পাহাড়-সংলগ্ন গভীর নালার ভিতর থেকে বেরিয়েছে একপাল বন্য বরাহ! কী দুর্ধর্ষ এই বরাহ। গায়ে ওদের অসুরের শক্তি। শৌর্যে ও বলিষ্ঠতায় বেপরোয়া। দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুর্জয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এরা নিঃসঙ্গ নয়, যেমন নিঃসঙ্গ বাঘ। বিশেষ ঋতুতে বাঘ ও বাঘিনী একসঙ্গে বিচরণ করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এরা একক। অন্য যেকোনো বাঘ তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকী তার নিজের শাবকও। কিন্তু এই মহাবলী বরাহ রাত্রে প্রস্তর-কঙ্করময় উপত্যকায় জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে চলেছে একসঙ্গে। যেমন চলে কুটুম্ব বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে সমাজবদ্ধ মানুষ!

সেই অন্ধরাতের বিভীষিকা-ভরা অরণ্যে মানুষ ও জানোয়ারের কোথায় যে ঐক্য, সে-গবেষণার মনোবৃত্তি তখন আমাদের ছিল না। ছিল না সে-দৃষ্টি, যে তাকাবে সৃষ্টির আদিম অরণ্যলোকে। তাকিয়ে দেখবে বিবর্তন-পর্যায়ে প্রাণশক্তির তৃতীয় প্রতীক বরাহকে।

মাথায় রক্তের নেশা। হাতে অধীর উদ্যত রাইফেল। সেটা গর্জন করল একটা দাঁতালো শুয়োরকে লক্ষ করে। বন্ধুর লক্ষ্য অপরদিকে। দুটো শুয়োর ছাড়া আর সবগুলো পালিয়ে গেল। মোদিয়া আর পুনোয়ার খুশির শেষ নেই। ওই শুয়োর দুটো কেটে কাল হবে ওদের মহোৎসব। বাজনা বাজবে। মেলা বসে যাবে পুরুষ ও নারীরা। তার সঙ্গে চলবে মহুয়া-চোঁয়ানো মদ আর উৎকৃষ্ট বরাহ মাংস।

গাড়িটা অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ওরা শুয়োর দুটো কুড়িয়ে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিচ্ছে। পরদিন ভোর হতেই মোদিয়াদের দলবল আসবে দড়ি আর বাঁশ নিয়ে।

বাঁয়ে কালী পাহাড়ির গম্বুজাকৃতি চূড়াগুলো নক্ষত্রের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিষণপুরের পাহাড়টা আর একবার ডাইনে মোড় ফিরছে। মনে হয়, আমাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রস্তরীভূত বিরাট অজগর পার্শ্ব পরিবর্তন করছে। এখনও ডান দিকটা

BanglaBook.org

নজরে আসছে না। এতক্ষণ যে জানোয়ারগুলো টগবগ করে বুকের ভিতর ছুটছিল, তাদের গতি মন্থর হয়েছে। তাই এই স্তব্ধরাতের অরণ্যায়তনে বিষণপুর পাহাড়ের শীর্ষদেশের ওই উদ্যত তর্জনী, কালী পাহাড়ি গম্বুজ একাকার করে নিঃশব্দে ভিড় করেছে অন্তরের গভীরে। সেখানে রক্ত নেই, হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, চাঞ্চল্য নেই। আছে অচপল অনিমেষ দাক্ষিণ্য। আশ্চর্য এই মানুষ আর মানুষের হৃদয়! ওখানে লুকিয়ে আছে একটি সুর, একটি অসুর। একজন উদাসী, একজন ভোগী। কিন্তু সেকথা থাক।

গাড়ি আবার ছুটেছে। একটা আলো জ্বলজ্বল করছে পাহাড়ের বাঁকে। এই আলো ধরা পড়েছে নবী আখতারের হস্তধৃত আলো-শিখায়। নবী আখতার বলছে, 'বাঘ— খুব হুঁশিয়ার!'

নবী আখতারের নির্দেশে ড্রাইভার গাড়িটাকে বাগাচ্ছে। শুয়োরের যাতায়াতের রাস্তার ঝোপের বাইরে মুখ রেখে ওত পেতে আছে বাঘ। হঠাৎ বাঘ চোখ বুজেছে অথবা মাথাটা ঘুরিয়েছে। নূতন শিকারি। উত্তেজনার সীমা নেই। দুই বন্ধু রাইফেল তুলেছি পাহাড়শীর্ষ লক্ষ করে। হুকুমের তর সইছে না। আর একবার চোখ দেখা দিতেই দুটো রাইফেল থেকে গুলি ছুটেছে। বাঘ লাফিয়েছে! আবার দুটো গুলি! দুটো জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড। এবারে গর্জন শুনতে পাচ্ছি।

গুলি নির্ঘাত লেগেছে। জঙ্গল লক্ষ করে আবার গুলি ছুঁড়েছি। রাইফেলের পুনঃপুনঃ গুমগুম আওয়াজ পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ধাক্কা খেয়ে ছুটেছে দূরদূরান্তে। এবারে আর গর্জন নেই। পাহাড় স্তব্ধ। অন্য যে জানোয়ারগুলো আহারের সন্ধানে আড়াল থেকে বনপথে বেরিয়ে পড়েছিল, তারা নিশ্চয়ই রাইফেলের আওয়াজে গা ঢাকা দিয়েছে। তা দিক। সেসব জানোয়ারে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের অপরিসর অবকাশ ফুরিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

বাঘটাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। একটি গভীর অনতিক্রম্য পাবর্ত্য নালা পাহাড়ের পাদমূলে আমাদের যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে আছে। ঘন ঝোপঝাড় আর কাঁটা জঙ্গলে সে-নালা দুরধিগম্য। ওখানে দিনের বেলা আশ্রয় নেয় বাঘ, বরাহ, ভালুক। ওই নালা পূর্বেও দু-বার আমাদের বাঘের সন্ধানে বাধা দিয়েছে।

ভোরের আর বিলম্ব নেই। একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে নিয়ে আসছে অরণ্যের স্নিগ্ধ বীজনে। দিনের বেলায় বাঘটা খুঁজে বার করে আমাদের পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম। সম্ভাবিত খরচপত্রও বুঝিয়ে দেওয়া হল। গাড়ি ছুটল আবার বিষণপুরের পাহাড়ের উত্তর দিকের কঙ্করাকীর্ণ রাস্তা ধরে। মহুয়াটাঁর পেছনে ফেলে, কমলপুর ছেড়ে, থালীর রাস্তা ধরে বহুদূর— পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে শহরের উদ্দেশে।

দুর্গাপ্রসাদ রায়

জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চলে ডুয়ার্সে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, বাইসন, হাতী, মহিষ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু— আবার হরিণ, সম্বর প্রভৃতি নিরীহ জন্তুতেও ইহার জঙ্গলগুলি পরিপূর্ণ। গণ্ডার, বাইসন, মহিষ, হাতী— ইহারা রক্ষিত জন্তু পর্যায়ে পড়ে। কারণ, অনাবশ্যক হত্যার ফলে ইহাদের সংখ্যা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। সুখের বিষয় এই যে, এখন ইহারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এই অঞ্চলে শিকারীর অভাব নাই, ভাল শিকারীও অনেক আছেন। চা-বাগানের জনৈক সাহেব এবং স্থানীয় শিকারীগণ মিলিত হইয়া প্রায় রবিবারেই শিকারে বাহির হন এবং অনেক শূকর, চিতাবাঘ এবং কখনো কখনো দু-একটি বাঘও মারা পড়িয়া থাকে।

একবার ২৫ শে এপ্রিল রবিবার এমনি একটি শিকারের দিন ঠিক হইয়াছিল। আমাদেরই বন্ধুমহলের চা-বাগানের কয়েকজন অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার সাহেব এবং আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী শিকারে যাইব স্থির হয়। ধূপগুড়ির নিকটবর্তী জঙ্গল সংলগ্ন একটি গ্রামের পাশে ইহার পূর্বের রবিবারে বিট করায় কয়েকটি শূকর মারা পড়ে, সুতরাং

BanglaBook.org

এই রবিবারেও এ জায়গায় যাওয়া সাব্যস্ত হয় এবং তদনুসারে প্রায় একশত কুলী গাড়ি করিয়া পাঠান হয়। কুলীদের এই শিকারে সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহ। প্রথমতঃ, ইহারা স্বভাব সাহসী ও শিকার প্রিয় এবং দ্বিতীয়তঃ, শূকর মাংস ইহাদের অতীব প্রিয় খাদ্য সুতরাং খবর পাইলেই ইহারা প্রস্তুত হইয়া পড়ে এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গল তাড়াইয়া বেড়াইতে বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বা নিরুৎসাহ বোধ করে না। সেবার আমাদের দলে প্রায় আটজন শিকারী ছিল, সুতরাং একটা বড় রকম জঙ্গলের অংশ বাছিয়া লইয়া প্রায় একশ' হাত পর পর আটজন শিকারী বন্দুক লইয়া দাঁড়াইবার পর বিট শুরু হইল। বহুদূর হইতে চীৎকার করিয়া ও টিন পিটাইয়া কুলীর দল শিকারীদের সম্মুখ দিকে আগাইয়া আসিতেছে, কোন জানোয়ার থাকিলে সাধারণতঃ ভয়ে শিকারীদের সম্মুখ দিয়া পালাইতে যাইয়া মারা পড়িবে তাই এইরূপ ব্যবস্থা। যাহা হউক, এমন সময় দূর হইতে ইশারায় কুলীরা জানাইয়া দিল যে, সম্ভবতঃ বাঘ বিটে আছে এবং আমাদের বন্ধু 'হ' যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, খুব সম্ভব সেই দিকেই বাঘ যাইবে। তদনুসারে 'হ' প্রস্তুত হইয়া রহিল। বাঘ ঐ পথেই আসিতেছিল এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই খুব সুবিধাজনক স্থানে আসিয়া পড়িত, কিন্তু হঠাৎ লাইনের অপর প্রান্তে বন্দুকের শব্দ হওয়ায় বাঘ সামান্য ঘুরিয়া 'হ'-এর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল এবং বন্দুকের শব্দ শুনামাত্রই চঞ্চল এবং কথঞ্চিৎ

ক্রোধান্বিত হইল তাহা বলাই বাহুল্য। যখন প্রায় ৬।৭ গজ দূরে বাঘ দেখা গেল, 'হ' তখন গুলি ছুঁড়িলেন। গুলিটি যদিও বাঘের গলার নীচের দিকে লাগিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ আহত করিতে পারে নাই। কারণ 'হ'-এর রাইফেলটি ছিল .৩৭৫ বোর ম্যানলিকার। এই জাতীয় রাইফেল দূরপাল্লায় সূক্ষ্ম নিশানা মারিবার পক্ষে খুবই উপযোগী, কিন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে আঘাত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী করিবার ক্ষমতা ইহার নাই, অবশ্য অদৃষ্টক্রমে যদি বাঘের মস্তিষ্ক বা চক্ষু ভেদ করে তবে স্বতন্ত্র কথা। .৩৭৫ কেন ২২ বোরের বন্দুকের গুলি যদি কোনপ্রকারে যে-কোন হিংস্র বলশালী জন্তুর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে, এক পা-ও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা থাকিবে না, কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিক সৌভাগ্য শিকারীর ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। গুলি লইয়াই বাঘটি ডিগবাজী খাইয়া পড়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলাইয়া উঠিয়া চক্ষের নিমেষে 'হ'-এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। বাঘটা খুব বড় নয়, সবেমাত্র যৌবনের সীমায় পৌঁছিয়াছে, আট ফুটের কিঞ্চিৎ উপর। একে বাঘের ৩০০।৩৫০ পাউণ্ড ওজন তার উপর প্রচণ্ড ধাক্কার সহিত উপরে পড়ায় 'হ' চিৎ হইয়া মাটিতে পড়ে। হাতের বন্দুক ছিটকাইয়া পড়িয়া যায়। 'হ'-এর পরবর্তী শিকারী 'বি. জি' বেশী দূরে ছিলেন না এবং এই ব্যাপার দেখিয়াই তিনি দৌড়াইয়া আসেন এবং তাঁহার দোনলা 'শট্-গান'-এর দুইটি গুলিই প্রায় এক সঙ্গে বাঘের পাঁজরে নিশানা করিয়া মারেন। কিন্তু হিংস্র জন্তুদের ক্রোধ ও জিঘাংসা অনেক সময় দৈহিক যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। বাঘ 'হ'-কে ছাড়িয়া এক লাফে 'বি.জি'র উপর পড়িল। 'হ' তখন উত্থানশক্তি রহিত, কারণ ইতিমধ্যেই বাঘ তাহার ডান হাতের উপরের দিক, ঘাড়ের দুই-তিন জায়গায় এবং এক পায়ের কিয়দংশ কামড়াইয়া, মাংস জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। 'বি. জি' ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া 'হ'-এর পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাঘ তাহার আসল আততায়ীকে মোটেই ভুলে নাই। সে এবার 'বি. জি'র বুকের উপর বসিয়া 'হ'-এর একখানি পা আবার চিবাইতে শুরু করিল। পরে 'হ'-এর মুখে শুনিলাম যে, বাঘ এক একবার 'হ'-এর পা চিবায় আর প্রচণ্ড গর্জন করে, আর তাহার মুখনিঃসৃত লালায় 'বি. জি'র চোখ মুখ ভরিয়া যায়। ৩৫০ পাউণ্ড বাঘ বুকের উপর বসিয়া গর্জন করিতে থাকিলে কাহারো ভাল লাগার কথা নয়, সুতরাং 'বি. জি'র তখনকার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অতীব সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত বাঘ যদিও প্রায় 'হ'কে পঞ্চাশ জায়গায় কামড়াইয়াছে, কিন্তু তখন পর্যন্ত শুধু মাংস ছিঁড়িয়া ফেলা ছাড়া কোন জায়গায় হাড়ে কামড় দেয় নাই এবং 'বি. জি'কে চড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর বসা সত্ত্বেও তার শরীরে কোথাও চোট লাগে নাই, কেবলমাত্র চোখের নীচে একটা সামান্য আঁচড় লাগিয়াছে। দ্বিতীয়বার যখন বাঘ 'হ'-কে কামড়ান আরম্ভ করিল তখন তাহার গর্জন পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে এবং 'হ'-এর নিকট পরে শুনিলাম যে, সে তখন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে— আজ 'হ' জীবিত এবং 'বি.জি' সুস্থ শরীরে পুনরায় শিকার করিয়া বেড়াইতেছে।

BanglaBook.org

বাঘের দ্বিতীয় আক্রমণে যখন 'হ'-এর প্রাণরক্ষার আর কোন আশাই ছিল না, সেই মুহূর্তে কোথা হইতে একটি পোষা মহিষ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিয়া বাঘটিকে চার্জ করিল এবং অমিতবিক্রমে শিং-এ উঠাইয়া লইয়া প্রায় পঁচিশ গজ দূরে নিক্ষেপ করিল। আশ্চর্য এই যে, পোষা মহিষ বাঘের গন্ধে দড়ি ছিঁড়িয়া পালায়, অবশ্য আক্রান্ত হইয়া নিরুপায় অবস্থায় দুই মিলিয়া বাঘ মারিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ গল্প শুনা গিয়াছে, কিন্তু পোষা মহিষ ছুটিয়া আসিয়া মানুষকে বাঁচাবার জন্য বাঘকে আক্রমণ করে, ইহা কখনও শুনি নাই। 'হ'-এর তখন জ্ঞান আছে এবং সে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু চলনশক্তিহীন। 'হ'-এর মুখে শুনিলাম যে, মহিষটি এমনভাবে তাহাকে বাঁচাইয়া বাঘকে স্থানচ্যুত করিল যে, একটু অসাবধান হইলেই মহিষের পদদলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বাঘকে ২৫ গজ দূরে ফেলিয়া আসিয়া, মহিষটি 'হ'-র পার্শ্বে ফিরিয়া আসিল এবং মাথা নীচু করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। বাঘ আবার একটু সামলাইয়া লইয়াই, ছুটিয়া আসিয়া মহিষের মাথার উপর পড়িল। মহিষও কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া পুনরায় শিং-এ ঠেকাইয়া বাঘকে বহুদূরে ঠেলিয়া লইয়া গেল। এ যাত্রায় মহিষটিও বিশেষরূপে আহত হইল এবং বাঘ মশায়ের শক্তিও প্রায় স্তিমিত হইয়া আসিল। সে তখন নিকটবর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া মাঝে মাঝে গর্জন করিতে লাগিল। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতে চার মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই, কারণ বাঘের মুহুর্মুহু গর্জন শুনিয়াই সমস্ত শিকারী সেইদিকে দৌড়াইয়া আসিতে থাকে এবং সকলে পৌঁছাইলে দেখা যায় যে, 'হ' প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, ক্ষতস্থানগুলি হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতেছে। 'বি.জি'

কিছু দূরে যাইয়া বসিয়া আছে, তাহার কোন আঘাত লাগে নাই, তবে বাঘের ধাক্কা এবং তৎপরে বুকের উপর বসায় সে কিছুটা আচ্ছন্ন মত হইয়া আছে।

তখন সকলে মিলিয়া সারি ধরিয়া নিকটস্থ ঝোপের দিকে যাইতেই বাঘের প্রচণ্ড গর্জন আরম্ভ হইল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই ঝাঁপাইয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু এবার 'এম. সি'র এক গুলিতেই সে ধরাশায়ী হইল। চামড়া ছাড়াইবার পর দেখা গিয়াছিল যে, প্রায় দশ-বারোটি গুলিই তাহার গায়ে লাগিয়াছিল।

তাহার পর তাড়াতাড়ি করিয়া উভয় শিকারীকেই হাসপাতালে পাঠানো হইল। বলা বাহুল্য 'হ' এবং 'বি. জি'র শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং সাহস যে অতুলনীয় ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

পোষা মহিষ মানুষকে বাঘের হাত হইতে এইভাবে বাঁচায় এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়, ইহা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

কুলীরা বলাবলি করিয়াছিল, 'সাহেব, মহিষ তোমার পূর্বজন্মের পিতৃপুরুষ ছিল, তাই তোমাকে ঐভাবে বিপদে রক্ষা করিল।'

(বানান অপরিবর্তিত)

বিপর্যয়

জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী

প্রভাতে তাম্বুর বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র আমাদের ‘খুঁজি’ ‘সাধুর বাপ’ দন্তপংক্তি উদ্ঘাটিত করিয়া হাস্যমুখে অভিবাদনপূর্বক করজোড়ে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। প্রভাতে এমন একজন ধর্মাত্মার হাস্যকৌমুদীচ্ছটা-সমুজ্জ্বল, বিকশিত-দশন-সুশোভিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সেদিন আমার শিকারের পক্ষে শুভদিন হইবে বলিয়া আশা করিলেও আমার আশা কিরূপ ফলবতী হইয়াছিল, তাহা পাঠক শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। যাহা হউক, সে অনাবশ্যক বাকচাতুর্যে আমাদিগকে খুশি করিবার চেষ্টা না করিয়া সংক্ষেপে যে সংবাদ আমাদের গোচর করিল, তাহা সুসংবাদ বটে এবং যথেষ্ট উৎসাহজনক। সে বলিল, বাঘে ঘোড়া মারিয়াছে এবং বাঘটা মড়ি লইয়া ঘুমাইতেছে— তাহাও সে দেখিয়া আসিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া শিকারীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি সুসংবাদ থাকিতে পারে? ‘শুভস্য শীঘ্রম্’— আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া লইলাম।

যে জঙ্গলে ব্যাঘ্রাচার্যের নিদ্রাসুখ উপভোগের সংবাদ পাওয়া গেল, সেই জঙ্গলটি তাম্বুর প্রান্তবাহিনী বিলের অপর পারে অবস্থিত। এই জঙ্গলের আকার কতকটা ইংরাজী Y অক্ষরের অনুরূপ। প্রথমে কিছুদূর জঙ্গল, তাহার পরেই একটি খাল। খাল পার হইবার অব্যবহিত পরেই জঙ্গলটির দুই শাখা দুই দিকে প্রসারিত। জঙ্গলগুলি বিলের ‘কাঁধী’র

banglabook.org

সন্নিবিষ্ট। আমরা এই জঙ্গলের কিনারায় উপস্থিত হইয়া হাতীর সারি করিলাম। কি প্রণালীতে ব্যূহ রচিত হইল, এখানে তাহার একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। দক্ষিণে আমি, আমার পরে কাকা, বাবা, দাদা মহাশয়, মহেশদা, মদনদা, নরেন্দ্র এবং সকলের উত্তরে তাউই মহাশয়। আমাদের হাওদা এইভাবে পরপর এক সারিতে সংস্থাপিত হইল। দুই দুই হাওদার ব্যবধানে তিন চারিটি করিয়া খালি হাতী (যাহাদের উপর কোন শিকারি অধিষ্ঠিত ছিলেন না) সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

এইভাবে আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে আমরা প্রায় খালের কিনারায় উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় আমি দেখিতে পাইলাম— বাঘ খাল প্রায় পার হইয়া যায় আর কি!— আমি যে একজন শিকারী বাঘ শিকার করিতেই এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, হাতে বন্দুক আছে, তাহা তুলিয়া অনায়াসেই বাঘটাকে মারিতে পারি, এবং তাহাই কর্তব্য, নতুবা শিকার অদৃশ্য হইতেও পারে, এ সকল কথা তখন আমার মনেও আসিল না। আমি সুযোগ ত্যাগ করিতেছি ইহা বিস্মৃত হইয়া, শিকার দর্শনেই আনন্দাভিভূত হইয়া তুড়ি দিয়া কাকাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'শিকার যে যায়; শীঘ্র মারুন।' কাকা তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলিয়াই গুলি করিলেন। হঠাৎ ডাক শুনিয়া ফিরিয়া হাতী থামাইয়া গুলি করিতে সম্ভবত গুলিটা একটু নড়িয়া গিয়াছিল। কাকা বাঘের পৃষ্ঠ লক্ষ করিয়াই গুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বাঘের পায়ের দাবনা ঘেঁষিয়া জলে পড়িল। কাকা তাহাতে দ্বিতীয়বার গুলি করিবার আর অবসর পাইলেন না! কাকা তখন আমার অমনোযোগের ও সুযোগ থাকিতে যথাসময়ে গুলি না করার ত্রুটির জন্য আমাকে তিরস্কার করিলেন; আমি আমার ত্রুটি অস্বীকার করিতে পারলাম না; অপরাধী ছাত্রের মতো নিঃশব্দে তাঁহার তিরস্কার পরিপাক করিয়া সংকল্প করিলাম খাল পার হইয়া পুনর্বার লাইন করিতে হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, খালের পরপার হইতেই জঙ্গলের দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত হইয়াছে। বাঘটাকে যেদিক দিয়া যাইতে দেখিয়াছি সেই দিকেই লাইন করিতে বলিলাম। কিন্তু তাউই মহাশয় তাহার বিপরীত দিক দেখাইয়া বলিলেন, 'বাঘ ঐদিকে গিয়াছে।' সেই দিকের জঙ্গল কম বলিয়া সেই জঙ্গলটি প্রথমে ভাঙ্গিয়া দেখাই সকলের যুক্তিসংগত মনে হইল। তখন আমরা লাইন করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জঙ্গল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আমরা জঙ্গলের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় একটি ছোপা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল। তাউই মহাশয় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সেই কম্পমান জঙ্গলের উপর চারি বন্দুক হইতে আটটি গুলি নিক্ষেপ করিলেন! সুতরাং ব্যাঘ্ররাজ সেই জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিলে তাহার পঞ্চত্ব লাভ তো সামান্য কথা— তাহার সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা হইয়া যাইত, ইহা অসংকোচে দৈববাণী করা যাইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঘ তখন সেখানে ছিল না; তবে জঙ্গলে নড়িবার কারণ কি? বোধহয় এই প্রশ্ন মুহূর্তের জন্য সকল শিকারীর মনেই উদিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সমস্যার মীমাংসা হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না, কারণ সেকেণ্ড দুই পরেই একটি হাঁড়িচাঁচা পাখী সেই ছোপার ঘন পল্লবদলের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সবেগে পক্ষান্দোলন করিতে করিতে উড়িয়া গেল; আর কিছুই

BanglaBook.org

দেখিতে পাওয়া গেল না। আমরা জানিতাম, জানোয়ার দেখিয়াই নিশানা করা উচিত; অন্ততঃ আমরা এইরূপই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা বলেন, জঙ্গল নড়িতে দেখিলে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গুলি ছুঁড়িতে হইবে। আমার মনে হয় এই কাজটি অধিকতর কঠিন তো বটেই, তাহার উপর শিকার করিয়া যে আনন্দ ও তৃপ্তি হয়, জঙ্গল নড়িতে দেখিয়া কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অদৃশ্য শিকারের উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণে সেই আনন্দ ও তৃপ্তি আসিতেই পারে না। জঙ্গল নড়িতে দেখিয়া শব্দভেদী নিশানায় বন্দুকের গুলি যদি শিকারের দেহে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই লক্ষ্যভেদ-কাহিনী উজ্জ্বলবর্ণ-রাগে রঞ্জিত করিয়া তৎসম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করিতে পারেন এবং তাহার উপর দীর্ঘকাল ত্রিকোণমিতি পরিমিতির গবেষণাও চলিতে পারে, কিন্তু এইরূপ শিকারে শিকারীর মনে লক্ষ্যভেদ-জনিত আনন্দের সঞ্চার হয় না। অমুক শিকারী ঝোপ নড়িতে দেখিয়া গুলি করিয়া বাঘ মারিয়াছেন শুনিয়া অনেকে বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ে বাহবা দিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কি অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা অদৃশ্য লক্ষ্যকে আহত করার ন্যায় দৈবায়ত্ত ব্যাপার নহে? লক্ষ্যভেদের এইরূপ সার্থকতায় অন্য কেহ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যক্রমে সে রসে বঞ্চিত!

যাহা হউক 'পর্বতের মূষিক প্রসবের' অর্থাৎ ব্যাঘ্রের উলম্ফনের পরিবর্তে হাঁড়িচাঁচার পক্ষান্দোলনে আমরা কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া সেই দিক হইতে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক অন্য দিকে 'লাইন' করিলাম। পূর্ববারের লাইনে যাঁহার যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল, এবারও তাহাই থাকিল, কেবল আমার স্থানটি কাকা অধিকার করিলেন। বাঘের পায়ে গুলির আঁচড় লাগিয়াছে, দুই হাওদার ব্যবধানে আমার স্থান-নির্দেশের ইহা একটি কারণ হইলেও, দ্বিতীয় কারণ এই যে, আক্রান্ত ব্যাঘ্র জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষিয়া পলায়নের চেষ্টা করিবে ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; আমিও দোষের দায় হইতে মুক্তিলাভের এই সুযোগ ত্যাগ না করিয়া স্বেচ্ছায় স্থান পরিবর্তন করিলাম। কারণ, সিদ্ধহস্ত বহুদর্শী শিকারীর নিকট হইতে বাঘ পলায়নে সমর্থ হইলে তাহা বাঘের সৌভাগ্য বা দীর্ঘায়ুর নিদর্শন বলিয়াই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা পাকা শিকারীর শ্রেণীতে প্রমোশন পান নাই, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহাদের হাত হইতে শিকার পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহা তাহার সৌভাগ্য বা দীর্ঘায়ুর নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে সাধারণতঃ প্রায় কেহই সম্মত হন না। শিকারের অদৃষ্ট বা পরমায়ুর কথা চাপা পড়িয়া শিকারীর অদৃষ্ট ও হস্তের অপযশের কথাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়, এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। সুতরাং স্থান পরিবর্তনে আমার ক্ষুব্ধ বা নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ ছিল না।

আমরা এই নূতন 'লাইন' করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আমাদের সম্মুখস্থ জঙ্গল বেশ প্রবলভাবেই আন্দোলিত হইয়া উঠিল। এইভাবে জঙ্গল দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, ব্যাঘ্রদেহের সংঘর্ষণে পাদপরাজি আলোড়িত হইতেছে, ব্যাঘ্রপ্রবর আমার সম্মুখ দিয়াই অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ববারের ব্যর্থতার কথা আমি এত শীঘ্রই বিস্মৃত হই নাই, এজন্য এবার আর কাহাকেও ডাকাডাকি করিলাম না এবং আমি স্বয়ং যে কার্য করিতে পারি সে ভার অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেও আগ্রহ হইল না। আমার ঠিক সম্মুখেই

BanglaBook.org

জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটি সংকীর্ণ অরণ্যপথ আড়াআড়িভাবে প্রসারিত ছিল। জঙ্গলের আন্দোলনে বাঘের গতি নির্ধারণ করা কিছুমাত্র কঠিন মনে হইল না। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, বাঘকে সেই সংকীর্ণ পথটি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সে সেই পথে পদার্পণ করিবামাত্র আমি তাহাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায়, আমি বন্দুক হাতে লইয়া ঘোড়া তুলিয়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, —বাঘ পথের উপর যেমন পদার্পণ করিবে সেই মুহূর্তেই গুলি মারিব।

কিন্তু দৈবের বিধান অলঙ্ঘনীয়, কোথা হইতে কোন কল্পনাতীত বিঘ্ন আসিয়া আমাদের সকল সংকল্প ব্যর্থ করিয়া দেয়, এবং অচিন্ত্যপূর্ব দৈবশক্তির প্রচণ্ড প্রতিকূলতায় আমাদের শক্তি-সামর্থ্য মুহূর্তে ব্যাহত ও চূর্ণ হইয়া যায়, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন দৈববিড়ম্বনায় সেই মুহূর্তে আমার হাতী হঠাৎ সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে ভূমিকম্পসঞ্জাত একটি ফাটলের ভিতর পড়িয়া গেল। রণজয়ের পূর্বমুহূর্তে যেন জননী বসুন্ধরা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কুরু-সেনাপতি অঙ্গরাজ কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিলেন।

আমি সে সময় আমাদের যে হাতীর উপর ছিলাম, তাহার নাম চমকতারা। চমকতারাকে সেই ফাটলের ভিতর পতনোন্মুখ দেখিবামাত্র আমার ধারণা হইল, সে একেবারেই উল্টাইয়া পড়িবে। আমি এই আকস্মিক বিপৎপাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হইয়া চক্ষুর নিমেষে বন্দুকটা নীচে নিক্ষেপ করিয়া হাওদার একপ্রান্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলাম। এইভাবে হাওদা ধরিতে যদি এক মুহূর্ত বিলম্ব হইত বা হাত ফসকাইয়া যাইত, তাহা হইলে আমি বোধহয় সম্মুখের দিকে ডিগবাজী খাইয়া হাওদা হইতে জঙ্গলের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইতাম, এবং বাঘটা সেই মুহূর্তে সেইস্থানে আসিয়া পড়িলে শিকারীকেই সম্ভবতঃ শিকারের বদন-কবলিত হইতে হইত! অবস্থাটা কিরূপ আরামজনক হইত, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

যাহা হউক হাতীর বুদ্ধি-কৌশলে অবস্থানটা তেমন সাংঘাতিক বিপজ্জনক হইবার সুযোগটি নষ্ট হইয়া গেল। কারণ, চমকতারা পতনোন্মুখ হইবামাত্র তাহার সুদীর্ঘ শুণ্ড প্রসারিত করিয়া তদ্দারা ফাটলের অপর পাড় অবলম্বন-পূর্বক সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, নতুবা আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটিত, তাহার উপর হাওদাখানিও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইত। কিন্তু এখানেই বিপদের সম্ভাবনা দূর হইল না; আমার সেই হস্তচ্যুত নল উঁচু করিয়া উদ্যতফণা বিষধর অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক সাংঘাতিক বিপদের সূচনা করিয়া সেই ফাটলের ভিতর বসিয়া রহিল! সেই সংকটময় মুহূর্তে আমি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঘ্রের অঙ্গশোভা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এবং তাহার প্রশস্ত ললাটতলে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ক্রোধ-প্রদীপ্ত দুইটি উজ্জ্বল অগ্নিগোলক ভাস্বর প্রভা বিকীর্ণ করিয়াও যে তাহার এই সুখসেব্য দ্বিপদ মিত্রটির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপের সুযোগ পাই নাই, এ অপবাদ দিলে তাহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। সে যে আমার গজস্কন্ধে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া পড়িল না, ইহার কারণ আমার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাহার মনে বোধহয় কিঞ্চিৎ করুণার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং অবজ্ঞাভরে হাস্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া

BanglaBook.org

থাকিলে আমার সেই 'সসেমিরা' অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সে নিশ্চয়ই 'অথান্ধকারং বন-পন্থানম্ দংষ্ট্রামযুখে সকলানি কুর্বন' একটু হাসিয়াছিল।

কিন্তু এই অবস্থায় অধিককাল থাকিতে হইল না। বাবা আমার অবস্থা দেখিয়া কি ভাবিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতার অভাব হয় নাই, ইহা সহজেই

বুঝিতে পারা গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়া বাঘটিকে গুলি করিলেন। গুলি তাহার কোমরের নিকট লাগিলেও তাহার উত্থানশক্তি রহিত করিতে পারিল না। গুলি খাইয়া সে তাহার সম্মুখস্থিত ভূমিকম্পের আর একটি ফাটলে প্রবেশপূর্বক সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে হাতীর পিঠে বাবার হাওদা ছিল তাহার নাম ভোলানাথ। বাবা যে সময় বাঘটাকে গুলি করেন, হাতীটা সেই সময় আমার পরিত্যক্ত উদ্যত-নল বন্দুকের উপর দাঁড়াইয়াছিল! হঠাৎ ভোলানাথের চরণস্পর্শে বন্দুকের ঘোড়া নড়িয়া গিয়া একটা শোচনীয় বিভ্রাট ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় সতর্ক করিবার জন্য কত চিৎকার করিলাম, কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'— আমার চিৎকার অরণ্যে রোদনবৎ হইল, কেহই আমার কথা কানে তুলিলেন না! যাহা হউক, দৈবানুকম্পায় কোন বিভ্রাট ঘটিল না, বাবার হাতী ভূ-বিবরশায়ী শার্দূলের অনুসরণ করিলে, আমি অনেক সাহস ভরসা দিয়া তিনচারিটা হাতী সেই স্থানে আনাইয়া, তাহাদের দ্বারা স্থানটি পরিবেষ্টিত করিয়া বন্দুকটা তুলিয়া লইলাম, কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। বাঘটা একবার নহে, দুইবার আমার সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল, অথচ দুইবারই তাহাকে মারিবার সুযোগ ব্যর্থ হইল! একবার স্বেচ্ছায় সুযোগ ত্যাগ করায় আর একবার দৈবের প্রতিকূলতায় সুযোগ নষ্ট হওয়ায়, মন এমন দমিয়া গেল যে, মনে হইতে লাগিল আমি হয়ত কোন দিনও বাঘ মারিতে পারিব না! ক্ষোভে, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে আমার দেহমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি ফাটল হইতে বন্দুকটা তুলিয়া লইতে লইতে বাঘটা ব্যাঘ্রলীলা সংবরণ করিল। আমি বিমর্ষভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

বাবা যেস্থানে বাঘটাকে গুলি করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাহার আহত অঙ্গ হইতে শোণিত নিঃসারিত হইয়া মৃত্তিকার কিয়দংশ সিক্ত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গুলিতে আহত হইয়া বাঘটা যে পথে ধাবিত হইয়াছিল, সেই পথে তাহার রক্তধারা ছাড়াইতে ছড়াইতে গিয়াছিল। সুতরাং সেই পথের সর্বস্থানেই রক্তচিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বাঘটা পঞ্চত্বলাভ করিলে আমি পথের সেই রক্তচিহ্নগুলি লক্ষ্য করিতেছিলাম, এমন সময় নরেন্দ্র হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বল তো, বাঘটা কে মেরেছে?' আমি তাহার এই প্রশ্নে ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'বাঘটা বাবা মেরেচেন। তাঁরই প্রথম গুলি, আর সে গুলি বাঘের গায়ে লাগতেও দেখেছি।' বাবার গুলি খাইয়া বাঘের দেহনিঃসৃত রক্তে যে স্থানটা ভিজিয়া গিয়াছিল তাহাও তাহাকে দেখাইলাম। আমার উত্তর শুনিয়া সে মুখ খুব গম্ভীর করিয়া চলিয়া গেল; তাহার মুখ কিজন্য যে সহসা নিদাঘাপরাহ্নের মেঘকান্তিবৎ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল সে রহস্য আমি তখন বুঝিতে না পরিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরে বুঝিতে পারি। ঘটনাটা এই—

বাঘটা ভূমিকম্পের ফাটল হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই নরেন্দ্রের হাতীকে আক্রমণপূর্বক পা কামড়াইয়া ধরে; নরেন্দ্র গুলি করায় বাঘটা হাতীটাকে পরিত্যাগ করিয়া ভূমিকম্পের ফাটলের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। মদন দাদাও আমার মতন ভূমিকম্পের ভিতর পড়িয়াছিলেন; বাঘটা ফাটলের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার

BanglaBook.org

হাতীর শুঁড় কামড়াইয়া ধরিল। সেই অবস্থায় হাতী ফাটলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বাঘ তখন শুঁড় পরিত্যাগ না করায় সে শুঁড়েই ঝুলিতে লাগিল। সেই সুযোগে মদন দাদা বাঘকে দুইটি গুলি মারেন; প্রথম গুলি খাইয়াই বাঘ হাতীর শুঁড় পরিত্যাগ করিল, দ্বিতীয় গুলিতেই তাহার ইহলীলার অবসান হইল।

নরেন্দ্রর ধারণা হইয়াছিল, সর্বপ্রথম তাঁহারই গুলি বাঘের গায়ে লাগিয়াছিল, তাহার পূর্বে আর কাহারও গুলি বাঘের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। এই জন্যই সে প্রথমে বাঘের দাবী করিয়াছিল। ঠিক এই ধারণার বশবর্তী হইয়া মদন দাদাও তাঁহার শিকার বলিয়া বাঘের দাবী করিয়া বসিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাঘের অধিকার লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময় বাবা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তোমরা ঝগড়া করিও না, বাঘ আমার।' এই কথায় নরেন্দ্র মনে করিল, বাবা বোধহয় ঝগড়া চাপা দেওয়ার জন্য মদন দাদার পক্ষাবলম্বন করিয়াই এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শিকার যে তাহারই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই নরেন্দ্র আমার নিকট আসিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা তাহার গোচর করিলাম; অতঃপর সে বোধহয় সে সকল কথা আর মনেও স্থান দেয় নাই।

আমরা তাম্বুতে প্রত্যাগমন করিলে বাঘের চামড়াখানি ছাড়াইয়া লওয়া হইল। চামড়া ছাড়াইয়া লওয়া হইলে মাংসের লোভে একপাল শকুন পড়িল। এই সকল শকুনি স্বাভাবিক সংস্কার-বলে বুঝিতে পারে, আমাদের অনুসরণ করিলে তাহাদের ক্ষুন্নিবারণের ব্যবস্থা হইবে, সুতরাং আমরা তাম্বু উঠাইবামাত্র শকুনির পাল তাম্বুর নিকট আসিয়া সংযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। আমরা যখন যেখানে তাম্বু স্থাপন করি, শকুনির পাল আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানেই আমাদের অনুসরণ করে এবং তাম্বু উঠিলেই তাহারা নিকটবর্তী কোন বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঘ মারা হইলে তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহর সীমা থাকে না। কারণ বাঘের সমস্ত মাংসই ইহারা খাইতে পায়, যেন ইহাদের জন্যেই আমাদের ব্যাঘ্র শিকার। বাঘের মাংসে উদর পূর্ণ করিয়া পরদিন ইহারা নদীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করে। যে শকুনি অধিক পরিমাণে বাঘের মাংস উদরস্থ করে, তাহার কেবল স্নান করিলেই চলে না— সে বুক পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া শরীর শীতল করে। দীর্ঘকাল জলে পড়িয়া থাকিলে প্রচুর মাংসাহারজনিত দৈহিক উত্তাপ প্রশমিত হইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইবে, এ শিক্ষাও বোধ হয় তাহাদের সহজাত সংস্কারের ফল।

রাত্রিকালে তাউই মহাশয়ের হাতীর একটি শাবক পিলখানা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাম্বুর সীমায় প্রবেশ করিয়া নানা উপদ্রবে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। তাম্বুর ভিতরে বাঘের তেলের একটি টিন ছিল, তাহা সে উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়, এবং চাল ডাল প্রভৃতি আহার্য দ্রব্যও কিছু কিছু নষ্ট করে। তাহার এই উপদ্রবে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; পোষা হাতীর শাবকগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত দুর্দমনীয় ও দুরন্ত হইয়া থাকে।

অদ্য যে বাঘ শিকার হইল, সে বাঘিনী; দৈর্ঘ্যে আট ফিট নয় ইঞ্চি।

(বানান অপরিবর্তিত)

গণ্ডার শিকার

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী

অনেক শিকারি মনে করেন শিকার করবার সময় জানোয়ারের ঘাড়ের উপর গিয়া না পড়িলে বাহাদুরী কিছু কম হয়। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত, কোন সময়েই কোন শিকারের একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়া হাতী লইয়া পড়া উচিত নয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা তো আছেই, অধিকন্তু হাতীর উপর হইতে খাড়াভাবে ঘাস কি ঝোপ-জঙ্গলে নীচের দিকে দেখা যায় না বলিয়া শিকার করা চলে না। একটু দূর হইতেই বরং তেরছা

ভাবে ভাল দেখা যায়; কাজেই শিকারীর একটু দূরে থাকাই ভাল। একবার এইভাবে বাঘের ঘাড়ে গিয়া পড়াতে, আমাদের পার্টির এক শিকারীর যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি—

বাংলা ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পের পর, কিংবা তার পরের বছর আমরা 'দুদুং-এর থলে' (থল একটি উলুখড় সমাকীর্ণ বহুদূর বিস্তীর্ণ জঙ্গল) শিকার করিতে যাই। সেবার আমাদের পার্টিতে মনুবাবু, মহেশবাবু ও আমি ছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল, থলে শিকার করিবার পর, সুসঙ্গ-এর মধ্য দিয়া পূর্বাভিমুখে সিলেটের দিকে কতকদূর অগ্রসর হইব। আমাদের বাহাদুরপুর কাছারীর নিকটবর্তী পোড়াপুঁঠিয়া গ্রামে, একটি অতি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ধারে আমরা প্রথমে 'ক্যাম্প' করি। এই জলাশয়টি এককালে বাহিত নদী ছিল, পরে উহার স্রোত বন্ধ হইয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে। যাহারা হাজারিবাগের হ্রদ দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বেশ ধারণা করিতে পারিবেন।

আমরা বরাবরই 'থলে' যাইবার পথে এই স্থানে দু-তিন দিন থাকিয়া হল্ট করিয়া যাইতাম। কারণ, ইহার নিকটেই লেপার্ডের খুব ভালো ভালো কয়েকটি জঙ্গল আছে। বহুদূর বিস্তীর্ণ স্বভাবসুন্দর এই জলাশয়ের তীরে সারি সারি তাঁবু পড়িয়া স্থানটিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিত। আমরা এই স্থানে দুই দিন থাকিয়া তিন-চারটি বাঘ মারিয়া 'থলে' চলিয়া গেলাম। আমাদের অঞ্চল 'থল' Hog-deer শিকারের একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

'থলে' বাঘের কয়েকটি বড়ো বড়ো প্রিয় ঘন জঙ্গল আছে। ঐসব জঙ্গলে অনেক সময়ই বাঘ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া 'থলের' নিকটবর্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনেক ছোট ছোট জঙ্গল আছে, তাহাতেও সময় সময় দুই একটি লেপার্ড পাওয়া যাইত। কিন্তু সেবার কি জানি কেন, বহু লেপার্ড আসায় এই সব জঙ্গল ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। যে জঙ্গলেই যাইতাম, দু-একটা করিয়া লেপার্ড পাওয়া যাইত। একদিন পাঁচটা পর্যন্ত পাইয়াছিলাম। সেবার বাঘের এত আমদানী দেখিয়া, আমরা বে-খবরেই নিকটবর্তী গ্রামসমূহের জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়া বেড়াইতাম এবং প্রতিদিনই দু-তিনটি করিয়া লেপার্ড পাইতাম। এই স্থানে সেবার চার পাঁচ দিনে চোদ্দ পনেরোটি লেপার্ড শিকার করা হয়।

এইরূপে একদিন 'চালিতাখালি' গ্রামের নিকটবর্তী কোন জঙ্গলে গিয়া একটি লেপার্ড পাই। ঐ স্থান আমাদের 'ক্যাম্প' হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ছিল। জঙ্গলটি বেশ ঘন এবং একটি শুষ্ক নালার মধ্যে অবস্থিত ছিল। লম্বায় প্রায় দুই ফার্লং এবং চওড়ায় কোন কোন স্থানে এক ফার্লং এবং কোথাও বা কিছু কম হইবে।

সেদিন আমাদের কি অযাত্রা ছিল যে বাঘটিকে কিছুতেই মারিতে পারিতেছিলাম না। আমরা তিনজনে উহার উপর বহু গুলি বর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না; কারণ একে ঘন নল বন, তাহার মধ্যে আবার খুব ঘন ঘন গুজার ঝোপ বিঘ্ন জন্মাইতেছিল। (গুজা একরূপ বুনো কাঁটা গাছ। ইহারা এক-একটি ঝোপের মত হয় ও ইহাতে সাদা সাদা ফুল হয়। ইহাকে ইংরেজীতে Bush rose বলে।) এক ঝোপ হইতে আর এক ঝোপে লাফাইয়া যাইবার সময়, snap shot ছাড়া নিশানার কোন সুযোগ পাওয়া যাইত না। (যে সব আওয়াজের সময় বন্দুকের নল জানোয়ারের দিকে রুজু করিয়া চোখ না বুজিয়াই

BanglaBoi.org

আওয়াজ করা হয় তাহাকে snap shot বলে। ইহাতে অনেক সময় বন্দুক বুকে লাগান যায় না। খুব অভ্যাস না থাকিলে এইরূপ shot মারা যায় না)। ক্রমাগত পাছে পাছে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে জঙ্গল অনেকটা পা'ট হইয়া আসিয়াছিল। যতই জঙ্গল পা'ট হইতে লাগিল, বাঘের বিক্রম যেন ততই বাড়িতে লাগিল। তখন আর সহজে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে বাহির হইতেছিল না। ঝোপের নিকট হাতীর মাথায় লাফাইয়া উঠিত। এইভাবে ক্রমাগত 'চার্জ' করিয়া পাঁচ-সাতটা হাতীকে বেশ ঘায়েল করিল। ইহার পর লাইনের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; মাহুতদের মনেও প্রবল ত্রাস উপস্থিত হইল। কোন কোন মাহুত 'পীরের বাঘ, মারিয়া কাজ নাই', কেহ বা 'ইহা দেবাংশী, ইহাকে মারা যাইবে না,' ইত্যাদি যাহার মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিয়া ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিতে লাগিল। স্থূল কথা, মাহুতেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ নানা উপদেশ দিতেছিল। আমাদের নিশানার উপর উহাদের বিশেষ আস্থা ছিল, কিন্তু এখানে ক্রমাগত বিফলতায় বোধহয় উহাদের মন দমিয়া গিয়াছিল। এরপর আমরা স্থির করিলাম 'বীটার' হাতী ছাড়া আমাদের তিন হাওদা লইয়াই চেষ্টা করিয়া দেখিব। তদনুসারে হাওদা তিনটি পাশাপাশি করিয়া, আমরা এ-ঝোপ সে-ঝোপ, দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মহেশবাবুর হাওদা, রাজা জগৎকিশোরের 'শম্ভুপ্রসাদ' নামক দাঁতালের (tusker) উপর ছিল। বোধহয় 'শম্ভুপ্রসাদ' বাঘের ঘাড়েই পাড়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, অথবা কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ বাঘের ডাক শুনিয়া মহেশবাবুর হাওদার দিকে তাকাইয়া দেখি, বাঘ 'শম্ভুপ্রসাদে'র মাথায় উঠিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে; কিন্তু শরীরটা হাতীর কানের পাশ দিয়া ঝুলিতেছে। হাতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড কান দুইটা ফাঁক করিয়া মেলাইয়া দিয়েছে। (এইভাবে হাতীর কান ফাঁক করিয়া দাঁড়ানোকে কান ফাঁদাইয়া দাঁড়ান বলে।) সেই সঙ্গে মহেশবাবু, হাওদার সম্মুখে ঝুঁকিয়া 500 Express rifle দিয়া বাঘকে নিশানা করিতেছিলেন। হাতীর কানে বাঘ ঢাকা পড়িয়া গেলেও তিনি মনে করিতেছিলেন, বাঘকেই নিশানা করিতেছেন। আমরা এই অবস্থা দেখিয়া ক্রমাগত চেঁচাইয়া গুলি মারিতে নিষেধ করিতেছি; কিন্তু তাঁহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মহেশবাবু এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমাদের চীৎকার তাঁহার কানে পৌঁছে নাই। তিনি দম্ করিয়া হাতীর কানেই গুলি করিয়া বসিলেন। বন্দুকের আওয়াজে বাঘ হাতী ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া আর এক ঝোপের ভিতর ঢুকিল। এদিকে মাহুতও 'আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। দেখা গেল, Express-এর shell গুলি, হাতীর কানে লাগিয়া কাটিয়া টুকরা-টুকরা হইয়া গিয়াছে ও তাহারই কয়েক টুকরা মাহুতের পায়ে বিঁধিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মাহুতের জখম মাত্র চর্মভেদ করিয়াছিল, কিন্তু হাতির কান ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দৃষ্টে মহেশবাবুর মুখ চুন হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতী সরাইয়া নিয়া হাওদা খুলিয়া ফেলা হইল। হাতীর কানের বড়ো বড়ো শিরা হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। হাওদা বদলাইতে যে সময় লাগিল, আমার মনে হইল, ইহাতে বুঝি দু-তিন ঘটি রক্ত পড়িল। ইহার পর হাতীকে 'ক্যাম্পে' লইয়া গিয়া নদীতে

BanglaBook.org

ফেলিয়া লোহা পোড়ার দাগ দিয়া, তবে রক্তস্রাব বন্ধ করা হয়। অজস্র রক্তস্রাবে হাতীকে সেদিন একটু অবসন্ন বোধ করায়, এক বোতল No. 1 ব্রাণ্ডি একেবারে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পরদিন হাতীর আর বিশেষ কোন দুর্বলতা অনুভব করি নাই। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত খুব কম হইলেও এক কলসী রক্ত পড়িয়াছিল। এত রক্তপাতেও ক্ষণিক দুর্বলতা ছাড়া, তার আর কিছুই অসুবিধা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হাতি ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার হইলে এ অবস্থায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মাহুতকে পাঁচ-সাত দিন ক্যাম্প হাসপাতালেই থাকিতে হইয়াছিল। বেচারা আরোগ্যলাভ করিয়া আড্ডাস্থিত অন্যান্য মুসলমানদিগকে খুব বড় একটা 'খোদার' সিন্নি দিয়া ভোজ দিয়াছিল। তবে এই অর্থ মহেশবাবুর পকেট হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না।

বাঘটি এইভাবে আমাদিগকে 'নাকাল' করিয়া, পরে আর কিন্তু মোটেই কষ্ট দেয় নাই। বোধহয় সে তখন মনে করিয়াছিল, 'আর কেন, তোমাদের যত ক্ষমতা দেখা গেল, এখন অস্ত্র ত্যাগ করিলাম।' তবে ভীষ্মদেবের মত সে কাহাকেও 'শিখণ্ডি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। লেপার্ড হইলেও, ইহা মাপে প্রায় আট ফিট ছিল। এত বড়ো লেপার্ড সচরাচর খুব কমই দেখা যায়।

(বানান অপরিবর্তিত)

BanglaBook.org

হাওদায় বসিয়া শিকার

কুমুদনাথ চৌধুরী

'হাতী পর হাওদা', আবার তার উপর নিজে রাজার মত ব'সে শিকার করা তো খুব আরাম! হিমালয়ের তরাইয়ে, আসাম আর শ্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শিকার, এমন কি তিতির প্রভৃতি ছোট শিকার করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল— যেন লম্বা ঘাস আর শরের গভীর সমুদ্র!

এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আর এম্নি ঘন যে সম্মুখে যে সব প্রকাণ্ড হাতী শিকার-সন্ধানে আরোহীকে নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আড়াল ক'রে ফেলে। প্রতিপদেই গতিরোধ হয়। হাতীর পায়ের চাপে যে-সব ঘাস ভেঙে পড়ে, সেগুলো এম্নি মজবুত যে ভাঙবার আওয়াজটা পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে যেদিন আমি প্রথম শিকার-সন্ধানে গিয়েছিলাম, সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। এ যেন বিচালীর গাদায় হারানো সূচ খুঁজতে যাওয়া! তবে মস্ত এই প্রভেদ যে, এ ক্ষেত্রে যে খুঁজতে যায়, তাকে নিরাশ হ'তে হয় না। যার আশায় 'ঢুঁরত ফিরি' তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতীর উপর দোল খেতে খেতে তাক ঠিক রাখা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে আর তা ছাড়া ঢেউ এর মতো দোলায়মান ঘন ঘাসের মধ্যে কোন জানোয়ার চলে বেড়াচ্ছে, ভালো ক'রে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। হাওদা-শিকার ব্যয়সাধ্য। খুব কম লোকেরই এ রকম হাতী রাখবার সামর্থ্য হয়; আর যে দুচার জন রাখেন, তাঁরাও এ সব হাতীকে রীতিমতো শিক্ষা দিবার কষ্ট স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে গুটিকত রীতিমতো শিক্ষিত হাতী নিতান্তই দরকার। কিন্তু এ-রকম হাতী পাওয়া সহজ নয়। আর যদি পাওয়াই যায়, তা হলে তার দাম দিতে সোনার খনি নিঃশেষ করে ফেলতে হয়! তাই বা ক-জন পারে? হাওদা শিকারে কৃতকার্য হতে হলে এই রকম হাতী অন্তত ২৪।২৫ টি নইলে চলে না। কাজেই বুঝছ, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ যার নাই, তার ভাগ্যে এ শিকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শিকার ব্যাপারে বেশি উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শিকার করা তাঁরা গৌরবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বললেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহারে বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। কলপ দেওয়া কড়া কামিজ 'কলার' তাঁরা মুনি-ঋষির কৃচ্ছ্রসাধনের মতোই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য সনাতন স্বাস্থ্যকর খাদ্য অপেক্ষা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয় এক সময় কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল, এখন সে সকল তাঁরা নিত্য-নৈমিত্তিক করে নিয়েছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন! নিঃশব্দ-সঞ্চার মখমল-মোড়া 'মোটর'যান ব্যতীত চলাফেরা করতে তাঁদের মন ওঠে না! এইগুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যাত্মিক পরিমাপ। দৈহিক মাপটি তাঁদের ইংরাজ-দর্জির কাছে পাওয়া সহজ। এদের তরঙ্গায়িত বপুগুলি কোট-প্যান্টে ঢাকিয়া সুষ্ঠ করে রাখাই তাদের কর্ত্তব্য। কোথায় কখন কী ভাবে ঐ সৌন্দর্য্য ফেটে বেরিয়ে পড়বে তার জন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবার একজন রাজকর্ম্মচারী কোনও জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'রাজা, একটি সিগারেট খাবে কি?' আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি বলে উঠলেন— 'আমি শুধু হাভানা ব্যবহার করে থাকি'! হাভানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা অধিক দামী চুরুট। আজকালকার দিনে ম্যানিলা (manilla) আর মিউরিয়ার (muria) প্রভেদ বুঝতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার

BanglaBook.org

সদ্‌গুণের বিশিষ্ট পরিচয়! আর বিবিধ মদ্যের জাতি, গোত্র, গাঁই, কুলচি জ্ঞান যদি থাকে, তা হলে সে তো ইংরাজী কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে সমধিক গৌরবের বিষয়! বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এরা ছুরি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালোই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে পড়ে থাকায়, তার শিল্প, সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বশত সর্ব্বদা কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বাস করে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হীনস্বভাব হয়ে পড়েছেন। মাঝ হতে রাজোচিত মৃগয়া কৌশলের ও চর্চ্চার সমাদর চলে যাচ্ছে।

হাওদার উপরে শিকার করা কোন কোন শিকারীর অভ্যাস আছে তাঁরা অনেকগুলি করে গুলিভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান। তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমার মনে আছে একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাসবশত মারা যান। হাতী যখন উপরের দিকে উঠছিল বন্দুক গড়িয়ে পড়ায় গুলি বাহির হয়ে যায়। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যাস করিলে, একটি বন্দুকের সঙ্গে আর একটি তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্বদা ব্যবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায় নতুন অজানা বন্দুকের কাছে তা হবার জো নেই। আর একটি কাজ কখনো করো না! সম্মুখে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে, জন্তুটিকে যতক্ষণ স্বচক্ষে না দেখতে পাও ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। সম্মুখের ঘাস নড়ে উঠলেও জন্তুটি হয় তো তা হতে অনেক দূর কিংবা পিছনে পড়ে থাকে।

হাওদা শিকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে। —তার মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্ত্তি খেলে যার যেমন নাম উঠবে সেই ভাবে সাজান, কিংবা শিকারের দলপতি (আর সকলে যাঁরা নিমন্ত্রিত অতিথি)— তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন সেই মতো সাজান। এই সারি বাঁধাটা ধনুকের আকারে করা ভালো। পাশের জায়গা হচ্ছে শিকারের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। পতাকার সঙ্কেতে এগোতে পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিংবা সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। এর চেয়ে কিন্তু হাওদায় করে দু-একজন শিকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শিকার জড়ো করিয়ে নিলে বেশি সুবিধা হয়। কোথায় কী ভাবে এসব হাতী সারি বেঁধে দাঁড়াবে সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে যাতে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায় কিংবা এই সব হাতীর উপর এসে না পড়ে, সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দুইই কাজে লাগা দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে বাঘ গুড়ি মেরে ব'সে থাকার দরুন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যে, চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়; কেননা বাঘ যেম্নি এই হাওদাধারী হাতীটিকে দেখে আর অম্নি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসে সে বড় চমৎকার দৃশ্য! দেবতারা দেখলেও খুসী হ'য়ে যান। এ স্থলে শুধু হাতীটি নির্ব্বিকার হলে চলে না— শিকারীর গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই। তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে তো শিকার মরে না। আর সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধা করা চলে না। গুলি ছুঁড়তেই হয়; তা তোমার লক্ষ্য যেমনই হ'ক না কেন! গুলি ফসকে গেলেও এ সময় কাজ হয়! কেননা

BanglaBoi.org

শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়। কারো ক্ষতি করার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথাও একটা খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও এই ঘন ঘাস জঙ্গলে সে খবর জানতে দু একদিন চ'লে যায়। যখন দেখা যায় মস্ত মস্ত শকুন চক্র ক'রে ঘুরে ঘুরে উড়ছে অথচ ঘাসের মধ্যে নামছে না, কিংবা ভুঁয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনই বোঝা যায় খুনী ব্যাঘ্রটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে। এই দস্যুটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মাঠে গরু মোষ বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি। এই উপায়ে একবার চমৎকার একটি বাঘিনীকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা-শিকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া। হাতীর মত সাহসী সতর্ক জন্তুও কাদায় পা ব'সে যাচ্ছে দেখলে ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান রহিত হ'য়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কাল্‌কের ঘটনার মত আমার স্পষ্ট মনে আসছে। আমাদের হাতীর সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, গারো পাহাড়ের চোরা বালির মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। আমরা বন্য মহিষ আর জলাভূমির হরিণ শিকারে বেরিয়েছিলাম। পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর। খুব সম্ভব পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে পড়েছিল। যে জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা সযত্ন-রক্ষিত শাদ্বলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরা বালি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা তখনই শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কটস্থানে এসে পড়লাম। অনতিদূরে হাত চল্লিশ তফাতে শুক্‌নো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটি হাতী প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হ'তে লাগল। সবাই ভয়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে চলেছিল। যাদের পিঠে হাওদা ছিল সব চেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল তাদেরই। এই দলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটি হস্তিনী সর্ব প্রথম নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছিল। এই বুদ্ধিমতী বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ে উপড়ে নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে পা রাখবার ঠাঁই ক'রে নিতে লাগল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে অপর পাড়ে উত্তীর্ণ হ'ল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম ক'রতে হয়েছিল যে, তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হতে গিয়ে রাজা একটি হাতী হারালেন। সে পারঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল,— কিন্তু বৃথা! আস্তে আস্তে সে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল! মাহুত শুধু প্রাণ হাতে ক'রে সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শিকার ক'রতে গিয়ে প্রত্যেক শিকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীত মনে সাহায্য করা। যদিই বা শিকার নিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়, তা হ'লে শিকারকর্ত্তা এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল তবু কলহ ক'রে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষহানি করা কখনও উচিত নয়। একটুও মন ভারী না ক'রে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি গ্রহণ ক'রো আর মনে ক'রো, সেইটিই তোমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। স্বার্থপর, অসন্তুষ্টচিত্ত লোকেরই 'পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে'। নির্বোধ কিংবা মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। গেল বৎসর আমারই চাক্ষুষ এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল।

BanglaBook.org

খবর এল, একটি প্রকাণ্ড বাঘ বাথানের সব চেয়ে ভাল গোরুটিকে মেরেছে। তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হ'য়ে শিকার-শুদ্ধ এক শিমুলতলায় উঠেছে। আমরা সেদিন একটি আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শিকারকর্ত্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন, মারা পড়েনি। সেই জন্যে সেদিন আমরা নূতন আগন্তুকের খোঁজে আর গেলাম না। যদিও সহজেই এ কাজটা সেই দিনই উদ্ধার হ'তে পারত। আমাদের শিকারকর্ত্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ-সংস্কার বশতঃই হাতের কাজ শেষ ক'রে, পরের দিনের জন্যে অন্যটি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার— শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম ঔষধ, নিদান কালের বিষবড়ি, প্রয়োগ করবার ভার অন্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফল লাভ ক'রে আনন্দে তাঁবুতে ফিরে পরের দিনের অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় উৎসুক হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রে রহিলাম।

গরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লিখবার মত প্রসঙ্গ নয়। বিশেষতঃ তাহাতে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গোহত্যাকারীকে পাহাড়ে, মাঠে, খানাখন্দে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্য্যন্ত কোন কিনারা ক'রতে পারলাম না, তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হ'তে তিনটি হাতী কম প'ড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল। আমাদের শিকার-নেতা এই সময়টি বৃথা অপব্যয় না করে শিকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও প'ড়ে আসছিল। তাই আর একটিবার মাত্র খোঁজে বেরুবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে, তারই তীরে ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চার শ' আর প্রস্থে ১০০ কি ১৩০ গজ। দু'কোণায় জঙ্গলটি ক্রমে ফাঁক হ'য়ে এসেছে; গাছপালা বড় একটা ছিল না। বাঘ যে পথে আসছিল সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল। তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নূতন ক'রে বেঁধে হাতীর মুখ ঘুরিয়ে বিপরীত পথে যাত্রা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম। ঠিক ডাইনের দিকে খানিকটা খোলা ময়দান আর গোচারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিন হাওদায় তিন শিকারী ছিলেন। উভয় দিক হ'তেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে উত্তম উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হ'লে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০ গজ পর্য্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দু-একটি গাছের গুচ্ছ দেখা যচ্ছিল। সে যেন ঠিক ন্যাড়ার মাথায় অর্কফলার মত, —এদিকে ওদিকে খোঁচা খোঁচা শূয়োর কুঁচির মত খাড়া খাড়া! দুএকটি গাছ সমস্ত মাঠটির অনুর্ব্বরতা আরও যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধ'রে হাতীর সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হতে লাগল, চারিদিকে উত্তেজনার আভাস ততই দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হল। হাতীর হুঙ্কার, শুণ্ড আস্ফালন ও প্রহরী জমিদারের ভঙ্গী হ'তেই বুঝা গেল, বাঘ নির্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতীর সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে

BanglaBook.org

নিরাপদ, সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। হাতীগুলি যেমন দৃঢ়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হ'তে পলায়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ ন'ড়ে উঠতেই আমার সমস্ত শরীর যেন সজীব হ'য়ে উঠল। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। দু'এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য সুন্দর শার্দ্দূলরাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। তখন সে দূরে,— অনেক দূরে। সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরও কাছে এগিয়ে আসবে তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি এবং মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল—.৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল! ব্যাঘ্ররাজ কোথায়? কোথায় অদৃশ্য হলেন? না অদৃশ্য হন নি! বিরল তৃণরাজির মধ্য হ'তে দেখতে পেলাম তিনি ধরা শয্যা গ্রহণ করেছেন! বিশাল শরীর নিস্পন্দ; জীবনের চিহ্নমাত্র নাই! মাহুতকে হুকুম দিলাম, 'বাড়াও'। ডানচোখের উপর একটি সামান্য ক্ষতচিহ্ন, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক-মিশ্রিত রক্তধারা ব'য়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাড়!

(বানান অপরিবর্তিত)

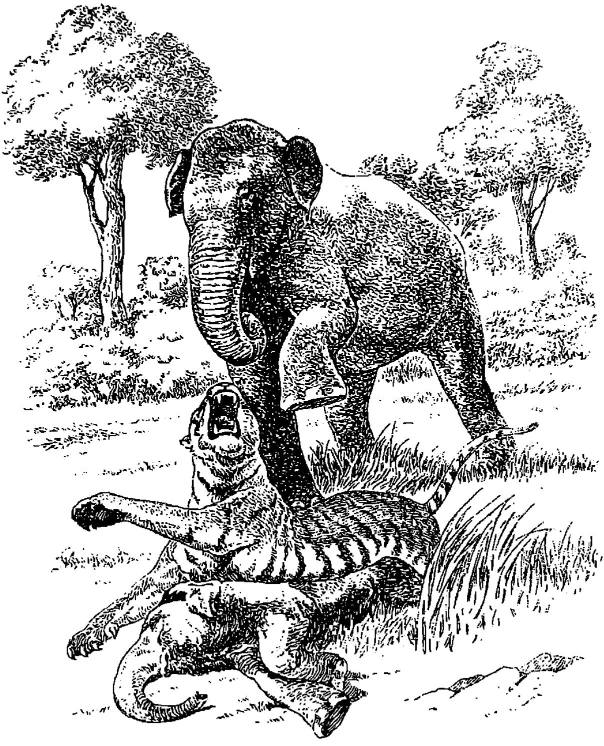

শিকারের কথা

ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ যাঁহারা পান, নিতান্ত নিরুৎসুক দৃষ্টি লইয়া চলিলেও বন্যজীবনে অতি বিস্ময়কর ঘটনা কখনও কখনও ঘটিতে দেখা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। যাঁহারা কল্পনার আশ্রয় না লইয়া অতি যথাযথভাবে এইসব ঘটনা সাধারণ সহজ জীবন-যাপন-পন্থী অথবা কেবল কল্পনা-বিলাসী ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত করেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীর লোকের স্বভাব-সুলভ হালকা সমালোচনায় উদ্‌ব্যস্ত বোধ করেন। মনুষ্য-জীবনের বাস্তব বৈচিত্র্যও যেমন সময় সময় কল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তেমনই বন্য-জগতে এরূপ ঘটা বিস্ময়কর নহে। ইহা মনে রাখিলে আপাততঃ অবিশ্বাস্য ঘটনাও অন্য দৃষ্টিতে দেখা চলে। কর্মবিমুখ পাণ্ডিত্যাভিমানী বুদ্ধিজীবীর সাহায্যে অদৃষ্ট-জগতের রমণীয় ও মোহকারী চিত্র আমাদের দেশে নানা কারণেই সহজলভ্য হইলেও, পাশ্চাত্যদেশীয় জ্ঞানমিশ্রিত কর্মসাধন-পুষ্ট লোকের রচিত সত্য ও রসপুষ্ট রচনার পাশে সেইগুলির মেকি রূপ জ্ঞানী সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় না। লৌকিক জ্ঞানকে

BanglaBook.org

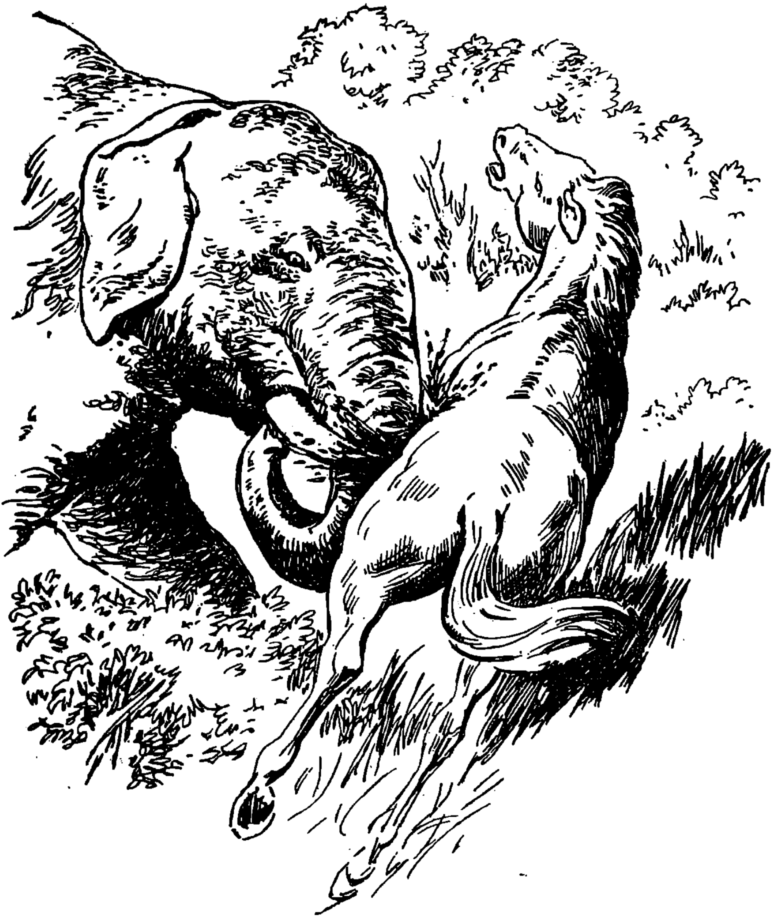

অনভিজ্ঞ লেখক যখন সাহিত্য পদবাচ্য করিবার অপচেষ্টা করিতে যান, তখন রচনাকে সাহিত্যরসিক ও বৈজ্ঞানিক দুয়েরই নিকট সমভাবে অস্পৃশ্য করিয়া তোলেন। সুতরাং পাঠকবর্গকে প্রথমেই সতর্ক করিব— এই প্রবন্ধে লিখিত ঘটনা সত্যই ঘটিয়াছে, তবে এই সংকলনে প্রকাশের জন্য অসাহিত্যিক ও অবৈজ্ঞানিকের লেখা হওয়ায় তাহা যেন অসত্য বলিয়া উপেক্ষিত না হয়। এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত ঘটনা কাল্পনিক মোহগ্রস্ত দৃষ্টি লইয়া দেখা নহে, ভরা বর্ষায় আসামের বনের ভিতর হাতী শিকারের চেষ্টায় ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তির কষ্টার্জিত দৃষ্টিতে দেখা সত্য ঘটনার বর্ণনা।

বহু কারণে লেখকের হাতী সম্বন্ধে উৎসাহী হইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছে। এতদিন

BanglaBook.org

পর্যন্ত হাতীর প্রতি একটা মোহকারী ভালবাসার ভাব লইয়া চলিয়াছিলাম— যথেষ্ট উত্তেজক কারণ থাকা সত্ত্বেও জগতের লুপ্তপ্রায় বিরাট প্রাণীসমূহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই অতিকায় জন্তুগুলিকে সংহার করিবার ইচ্ছা আদৌ হয় নাই। এই প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ স্বাভাবিক বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়া কেন যে ইহাদের বিনাশে উদ্যত হইলাম, তাহার উল্লেখ এইক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এইটুকু বলা চলে যে, এই পরিবর্তন ঘটায়, হাতীর দলের ভিতর সাহস করিয়া গিয়া তাহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার সহিত বিশেষ পরিচিত হইবার আরও অধিকতর সুযোগ পাইয়াছি। হাতী শিকার করিতে গিয়া হাতীর ভিতর সহানুভূতির প্রাবল্য কিরূপে প্রাণের মায়ার কথা পর্যন্ত বিস্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার যে এক সুন্দর চিত্র দেখিয়াছি তাহারই বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

গত বৎসর ভাদ্র মাসে গারো পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার মি. মিত্র জানাইলেন যে রাংথিয়াম্রিয়া গিরিতে দুইটি 'গুণ্ডা' হাতি লোকজনের কৃষি ও গৃহাদি নষ্ট করিতেছে। এই সংবাদ পাওয়ায় তিনি উহাদিগকে বিনাশ করিবার হুকুম দিয়াছেন— হাতী মারিবার হুকুম থাকায় আমি উহাদিগকে বধ করিয়া দন্ত চতুষ্টয় লইতে পারি।

আজকাল 'রোগ' হাতীর সম্বন্ধে বিস্ময়কর ঘটনার নানাপ্রকার উল্লেখ সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রে প্রায়ই দেখা যায়। ইহাতে বাঙালী পাঠকের নিকট 'গুণ্ডা' হাতী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের বাস্তব ও অবাস্তব ধারণা জন্মায়। 'খুনে' হাতী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নূতন তথ্যের উল্লেখ করিয়া সেই ধারণার কোনও পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিব না। হাতী শিকারের অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহার পূর্বে মারিবার উদ্দেশ্যে দুইটি হাতীকে গুলি করিয়াছি এবং দুই ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ করিয়াছি। নূতন শিকারী না হইলেও হাতী শিকার আমার নিকট নূতন, সুতরাং নূতন শিকারীর সৌভাগ্যই বোধ হয় আমার সাফল্যের পক্ষে এযাবৎ সহায়ক হইয়াছে। যাহাই হউক, সাফল্যের আনন্দে সহজেই ধরিয়া লইয়াছিলাম, যদি হাতীর দেখা পাই, তাহা হইলে এ যাত্রাও সাফল্য সুনিশ্চিত।

'খুঁজি' পাঠাইয়া দিয়াছি, হাতীর নিশ্চিত অনুসন্ধান জানিতে। যথাসময়ে সংবাদ আসিল যে হাতীসিয়া গিরিতে হস্তী দেখা গিয়াছে। হাতীসিয়া গিরি সুসঙ্গ হইতে বাইশ-তেইশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত— গারো পাহাড়ের ভিতর। স্থানটি আমার পরিচিত। কিন্তু যে কারণেই হউক এখানে যে কয়বার যখনই উপস্থিত হইয়াছি এবং যতদিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছি, ততদিন এবং ততবারই বৃষ্টি পাইয়াছি। এই হাতীর সংবাদ আমি পূর্বেই জানিতাম। কিন্তু আমার জানা ছিল যে এই হাতীর সঙ্গে একটা হস্তিনীও থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র দুইটি দন্তী 'রোগ-এর' কথা শোনায় কিছু সন্দেহের উদ্রেক হইতেছিল। প্রথমে গারো পাহাড়ের পাদদেশে বনবেড়া নামক স্থানে মূল ছাউনী করিয়া, হাতি যে সকল লোকের বাড়ী ভাঙিয়াছে ও কৃষি নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের ভিতর যাহারা খুনী হাতী দুইটিকে নিশ্চিতরূপে চেনে, এইরূপ কয়েকজন লোক সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিলাম।

বনবেড়ার তাঁবুর স্থান হইতে হাতীসিয়া— যেখানে থাকিয়া হাতী শিকার করিবার কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। সেখানে নেপালীদের একটা গরু ও

BanglaBook.org

মহিষের বাথান আছে। পাহাড়ের উপর হইতে যে পথে তাহারা প্রত্যহ দুধ নামাইয়া আনে, সেই পথেই আমাদের যাইতে হইবে। শুনিলাম, দুইদিন হাতীর উৎপাতে দুধ নামান সম্ভব হয় নাই। আমরা নেপালীদের বাথানের নিকটেই কোন স্থানে থাকিব— নতুবা পানীয় জল পাওয়া কঠিন হইবে। আমাদের সঙ্গে কেবলমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভিন্ন অন্যান্য সমস্তই বনবেড়ার মুল ছাউনিতে রাখিয়া গেলাম।

নেপালীদের বাথানের কিছু উচ্চে আমাদের তাঁবু খাটাইয়া আস্তানা করিবার পর হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকায় এখানে হাতী শিকার করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ততক্ষণে হাতিও এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছে। পঞ্চম দিনে বারিপাত কিছু প্রশমিত হইলে আমরা খারনৈ নদীর অপর পারস্থিত খুসিগিরি নামক বস্তিতে

'আলডা' করিয়া শিকার চেষ্টা করিব স্থির করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলাম। বর্ষায় পাহাড়-পথ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর পিছল ও জোঁকের উৎপাতে পথ চলা অতি কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য গত চারদিন পাহাড়-বাসে কষ্টের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে নিজের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আস্থা জন্মিয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না। মধ্যে মধ্যে ঘন বনের আড়াল হইতে রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল, নব-জল-সিঞ্চনপুষ্ট গর্জনশীল ঝরনাগুলি তাহাদের জীবন্ত উল্লাসে প্রাণে পুলকের সাড়া জাগাইতেছিল। পথে এক জায়গায় সংবাদ পাইলাম যে, রাংথিয়াম্রিয়া গিরির জঙ্গলে কয়েকটা হাতী বাঁশ ভাঙিয়া খাইতেছে। হাতী কয়টি গত রাত্রিতে খুসিগিরির দিক হইতে পার হইয়া আসিয়াছে। আমরা আসিবার সময় পাঞ্জালী দিগকে (অর্থাৎ ট্র্যাকার দিগকে) রাংথিয়াম্রিয়া প্রভৃতি জায়গায় খোঁজ করিয়া খুসিগিরিতে যাইবার নির্দেশ দিয়াছিলাম; সুতরাং আমাদের আশা ছিল পাঞ্জালীগণ এখানকার সংবাদ অবশ্যই লইয়া যাইবে। আমাদের বেলা প্রায় দুইটার সময় খুসিগিরি বস্তিতে পৌঁছিলাম। গ্রামে কোনও লোক নাই, সব হাদাং-এ (অর্থাৎ ক্ষেতে) চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বর্ষার কয়মাস গারোগণ ক্ষেত পাহারা দিবার জন্য ক্ষেতের ভিতর মাচান (বোরং) বাঁধিয়া তাহাতেই বাস করে। ক্বচিৎ কখনও কখনও গ্রামে আসিয়া আবশ্যকীয় কার্য করিয়া যায়। একটি লোক তখন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহার নিকট খোঁজ পাইলাম, গত রাত্রিতে হাতি নদী পার হইয়া রাংথিয়াম্রিয়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্বে প্রাপ্ত খবরের সহিত ইহার মিল ছিল।

আজ বেশ রোদ উঠিয়াছে— খুসিগিরির এক ধার দিয়া খারনৈ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামগতিতে পাথরের উপর দিয়া আছড়াইয়া গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; আর অপর দিক হইতে একটি স্রোতস্বিনী ভীষণ বেগে পাথর ঠেলিয়া আসিয়া মিশিয়াছে খারনৈ নদীতে। সুন্দর জল, নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাথরের উপর বসিয়া ধ্যান করা চলে। যাহাই হউক আমরা তপস্বী নহি, সুতরাং এখানে শুধু ভালো করিয়া স্নান করিবার ইচ্ছা হইল। স্নান সারিয়া আমাদের জিনিসপত্র সব রৌদ্রে বিছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় এক পাঞ্জালী আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রায় দুই-তিন মাইল দূরে হাতীর খোঁজ হইয়াছে, আমরা যেন অবিলম্বে চলিয়া আসি।

উল্লেখ করা ভাল যে, ইতিপূর্বেই আমরা গ্রামস্থ পান্থশালার (নক্‌পান্থির) সম্মুখে পরিষ্কার প্রাঙ্গণে আমাদের জিনিসপত্র সব রাখিয়াছিলাম। গারো পাহাড়ে প্রায় গ্রামেই একটা উঁচু মাচান থাকে। সেটা গ্রামের অবিবাহিত পুরুষগণ এবং যে কোনও অতিথি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে গারোরা 'নক্‌পান্থি' বলে। নক্‌পান্থিটি পরিষ্কার এবং অন্য কোনও লোক না থাকায় আমরা তাহাতেই রাত্রিযাপন কল্পনা করিয়াছিলাম। নক্‌পান্থির সম্মুখে একটা কাটা গাছের উপর বসিয়া রোদ পোহাইতেছি, এমন সময় দেখি, প্রায় হাতখানেক লম্বা সবুজ রঙ-এর চেপ্‌টা মাথা এবং অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের একটা সাপ হাঁ করিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামড়াইতে আসিতেছে। লাঠির ঘায়ে সাপ মারা হইল। কিন্তু সাপটাকে সম্পূর্ণভাবে নিহত করিতে শ্রীমান্ বিমলকে পাঁচ-ছয় বার আঘাত করিতে হইয়াছে, এবং

BanglaBook.org

অবশেষে দুই-চার ফোঁটা কার্বলিক এ্যাসিডও ব্যয় করিতে হইয়াছে। সাপ মারিলে শিকার পাওয়া যায় এ সংস্কার থাকায় আমরা বিশেষ উৎফুল্ল হইলাম।

কালবিলম্ব না করিয়া আমরা হাতির উদ্দেশে রওনা হইলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। খারনৈ নদী প্রায় সাঁতার দিয়া পার হইয়া অপর পারে পৌছিয়া অন্য খুঁজিদ্বয় যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, সেখানে পৌছিতে প্রায় সাড়ে চারটা বাজিয়া গিয়াছিল। তাহারা একটা উঁচু গাছে বসিয়া হাতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। আমরা নিকটে আসিতেই আমাদিগকে চুপ করিতে ইশারা করিয়া তাহারা গাছ হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ইশারায় জানাইল হাতী অদূরেই আছে। আমরা বন্দুকে গুলি ভরিয়া প্রস্তুত

BanglaBook.org

হইয়াই ছিলাম, এখন উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। হাতী গা-ঢাকা দিয়া এত চুপ করিয়া থাকিতে পারে যে পাঁচ-ছয় গজ দূরে বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় নাই।

অতি সন্তর্পণে জিরীং পাঞ্জালী অগ্রসর হইতেছে আর তাহার পিছনেই চলিয়াছি আমরা। হঠাৎ একটা ছোট ডাল ভাঙার শব্দ হইল, আবার সব চুপ। পাঞ্জালী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শব্দের হেতু নির্ণয়ের চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্তে শিকারীর মনের কী ভাব তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা কঠিন। তখন নিজের হৃদ্স্পন্দনের দ্রুত শব্দ নিজেরই কানে ভয়ানক অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। আমরা চারিদিক লক্ষ্য করিয়া সুবিন্যস্ত ঘন বাঁশ বনের ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দুই-এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি, হঠাৎ জিরীং চুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। বুঝিলাম, সে হাতী দেখিয়াছে। হাতীটা একটা বাঁশ গাছের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু এমন কাদামাটি মাখিয়া রহিয়াছে যে, তাহার রং পাহাড়ের রং-এর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তারপর হাতীটা একেবারে পাথরের মতো নিশ্চল— সুতরাং হঠাৎ দেখিয়া বুঝিবার কোনও উপায় নাই। একটু নড়িলে বুঝিলাম, এটা পাহাড় কিংবা পাথর নয়, হাতীই ঠিক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও হাতীর দাঁত কিছুতেই দেখিতে পাইতেছি না। ঠিক আমাদের বাঁ-ধারেই একটা শুকনো পাথর-ঢাকা নালা গিয়াছে। বিমল তাহাতে নামিয়া হাতীটাকে খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়া আমাকে সেই দিকে যাইতে ইশারা করিল। আমি নালায় নামিয়াই হাতীটাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। তখন আজাম ও গাগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই হাতীই তাদের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে কিনা এবং ডেপুটি কমিশনার যে হাতী বধের হুকুম দিয়াছেন এই হাতীই সেই হাতী কিনা? তাহারা মাটি ছুঁইয়া শপথ করিল যে, এই হাতীই সেই বড়ো গুণ্ডা হাতী। তখন মুহূর্তকালমাত্র বিবেচনা করিলাম কোথায় গুলি করিব। হাতীটা তখন আমাদিগকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ অথচ বিরক্তিপূর্ণ ভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। অনুমান করিয়া ডান চোখের কিছু উপরে একটু বাঁ-দিকে কপাল ঘেঁষিয়া গুলি করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা এক ধাক্কা খাইয়া ঠিক উল্টা দিকে ঘুরিয়া যাইবার সময় পুনরায় এক গুলি করিলাম মাথায়। তখন হাতীটা, আমরা প্রথম যেখানে বসিয়া হাতী দেখার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেইদিকে ঘুরিয়া ঠিক হরিণের মতো বেগে পলায়নপর হইল। আমি আবার একটা গুলি করিলাম। এই গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা ঠিক যেন কাত হইয়া উল্টাইয়া পড়িল। আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পতিত হস্তী লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখি, হাতী সেখানে নাই—পতনের চিহ্ন রহিয়াছে বটে এবং বেশ খানিকটা রক্তও পড়িয়া আছে, কিন্তু হাতী নাই। প্রথম দুইটি গুলি তিরিশ গজ ব্যবধানে করা হইয়াছে, শেষের গুলি হইয়াছে প্রায় চল্লিশ গজ দূর হইতে। ইহার পূর্বে একটি হাতীকে ষাট গজ দূর হইতে মারা হইয়াছে এবং অপরটি প্রায় পনের গজ দূর হইতে। কিন্তু সেই দুইটি হাতীই প্রকৃতপক্ষে এক-একটি গুলিতেই নিহত হইয়াছিল! সুতরাং তিনটি গুলি খাইবার পরও হাতী মরিল না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু স্থির বিশ্বাস হইল আর একটু ঘুরিয়া দেখিলে হাতী এখনই নিকটে পাইব।

সঙ্গে দুই বন্দুকধারী ও দুই পাঞ্জালীকে লইলাম, অপর সকলকে বলিয়া দিলাম, তাহারা হাতির 'মলমে' (পথে) উত্তর দিকে গাছে বসিয়া যেন শব্দ করিতে থাকে। আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইলে যেন তাঁবুতে ফিরিয়া যায়। আহত হস্তীর অনুসরণ করা কখনও নিরাপদ নহে। বাঘের হাতে রক্ষা পাইলেও, অতি শক্তিশালী রাইফ্‌ল হইতে সময় মত গুলি করিতে না পারিলে আক্রমণশীল হাতীর হস্ত হইতে আমাদের ন্যায় মন্থরগামীদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। পায়ে হাঁটিয়া হাতি শিকারের সর্বাপেক্ষা বড় উন্মাদনাই এই যে, আপন জীবন পণ করিয়া এই শিকারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমার অপর সঙ্গীদ্বয়ও যথেষ্ট সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এই অবস্থাতেও কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। আমার রাইফ্‌ল কোনটাই হাতী শিকারের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল না— সুতরাং ইহাতে বিপদের মাত্রা অত্যধিক।

সময় বেশী ছিল না। পাহাড়ে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। বর্ষার নিবিড় বনরাজী পূর্ণ, পথ-হীন, পিচ্ছিল পাহাড়ে চলার অভিজ্ঞতা যিনি অর্জন করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করিবেন।

অতি নিকটেই অন্য হাতীর বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ শুনিয়া মনে হইল আহত হস্তী অপর হস্তীর দিকে গিয়াছে, ফলে দুইটিই রক্তের গন্ধে ও বারুদের গন্ধে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে। হাতীর পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি— ক্রমশঃ-নিবিড় বনানীর মধ্যে। সেখানে বোধ হয় মধ্যাহ্নেও রৌদ্র কখনও প্রবেশ করে না। মশা এবং নানাবিধ পচা গাছের দূষিত বায়ুতে অবস্থা আরও কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছিল। এ কয়দিন পাহাড়ে চলিয়া জোঁকের অবিশ্রান্ত উৎপাত গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। আমরা হাতীর পথে চলিতে চলিতে দেখিলাম, হাতীগুলি এক জায়গায় আমাদের মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দূর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে ঘন বন থাকায় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় নাই— অথচ হাতী চলার কোন শব্দও পাই নাই। প্রতি পদক্ষেপেই আশা করিতেছি এই বুঝি হাতীর দেখা পাই। এক এক জায়গায় আহত হাতীর পদস্খলনের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয়, হাতী খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, বুঝিবা সম্মুখেই শায়িত অবস্থায় পাইব। কিন্তু একটু চলার পরই ভুল ভাঙিয়া যায় যখন দেখি, আমরা যেখানে কষ্টে উঠিতে পারি এমন পাহাড়ও হাতী সহজেই পার হইয়া গিয়াছে। কোথাও গাছের পাতায় রক্তের দাগ, আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে বিদ্ধ দাঁতের দাগ দেখিয়া মনে হয় পতনোন্মুখ হস্তী কোনও রকমে দাঁতের সাহায্যে টাল সামলাইয়া লইয়াছে। এমন বহু চিহ্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছি, পরমুহূর্তেই আবার তাহার সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। এইভাবে কিছুক্ষণ অনুসরণ করার পর সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিলেন। সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে আর থাকাও সম্পূর্ণ নিরর্থক, বিপজ্জনক ও মূর্খতা বোধে কাঁটাবনে জামা, প্যান্ট ও হাত-পায়ের চামড়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কোনমতে খারনৈ নদীর ধারে আসিয়া বসিলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে পর্বত ও অরণ্য এক ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সবচেয়ে কষ্টদায়ক মশা, 'উনি' পোকা ও অন্যান্য নানাপ্রকার পোকার কামড়। পূর্বেই বলিয়াছি, জোঁকের কামড় গা-সহা হইয়া গিয়াছে। বর্ষায় সাপের উপদ্রব অত্যন্ত হয়। কিন্তু এখন যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহাতে কোনও ভীতিই আর মনে ছিল না! সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত ছিল না।

BanglaBook.org

এ অবস্থায় একমাত্র মনে হইতেছিল, যে উপায়েই হউক, যত শীঘ্র হয় তাঁবুতে পৌঁছিতে হইবে। সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া লতা-গাছ ধরিয়া কোনও মতে প্রায় এক ঘণ্টার পথ চলিয়া একটা পুরাতন পায়ে চলার পথ পাইয়া বাঁচিলাম। আর পথে বহুবার হোঁচট খাইয়া অল্প সময় পূর্বেই খুসিগিরি পৌঁছিলাম। আজিকার এই পরিশ্রম যে-কোনও অতি কঠোর পরিশ্রমীর পক্ষে আত্মপ্রসাদের ভাব আনিয়া দিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

রাত্রিতে আজ চা-পান ও দধি-চিঁড়া ভক্ষণ হইল। রন্ধন করিয়া খাওয়ার ইচ্ছা আর ছিল না। কিন্তু পাঁচ দিন পরে জলে না ভিজিয়া, পোকা জোঁকের উৎপাতে অতিষ্ঠ না হইয়া, সুখে সমস্ত রাত্রি গাঢ় নিদ্রা উপভোগ করিলাম নক্‌পান্থিতে শুইয়া। ইহার পূর্বে আমি কখনও নক্‌পান্থিতে বাস করি নাই। গারোদের মধ্যে ভয়ংকর চর্মরোগ হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যবহৃত এই সকল স্থানে থাকার কথা মনে হইলেই ভীতি ও ঘৃণার উদ্রেক হইত। কিন্তু আজ আর এসব কথা মনেও হয় নাই। আমরা যে সকল লোককে গাছে উঠিয়া থাকিতে বলিয়াছিলাম, তাহারা অনেক রাত্রিতেও না আসায় মনে করিলাম তাহারা রংথিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ নিশ্চয় রাত্রি কাটাইয়াছে।

পরদিন খুব প্রত্যুষে উঠিয়া কি ভাবে কার্য করা হইবে তাহার একটা খসড়া স্থির করা হইল। শিকারী দল হস্তীর যাওয়ার পথে অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে রংথিয়াস্রিয়া গিরির হাদাং-এ ফিরিবে। পাঞ্জালীর দল অন্যান্য সম্ভবপর স্থান খুঁজিয়া সেইদিন অথবা তার পরদিন সন্ধ্যায় রাংথিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ আসিয়া মিলিবে। চারিজন লোক দিয়া ছয় বেলার খিচুড়ীর মাল-মসলা, চায়ের সরঞ্জাম, কয়েকটা টর্চ, ঔষধের বাক্স, মশারী, দুইটা ত্রিপল এইরূপ সামান্য কিছু উপকরণসহ রাংথিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ পাঠাইয়া দিলাম। তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া দিলাম, গারোদের পরিত্যক্ত কোনও পুরাতন 'বোরং'-এ যেন তাহারা মালপত্র রাখিয়া, শুকনো কাঠ যোগাড় করিয়া জায়গা পরিষ্কার করিয়া রাখে।

অপর লোকগুলি ইত্যবসরে আসিয়া বলিল যে, রাত্রি হইয়া যাওয়ায় তাহারা রাংথিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ ছিল। দুইটি হাতী প্রথমেই তাহাদের গাছের নীচ দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। আহত হস্তী ধীরে ধীরে কষ্টে অনেকক্ষণ পরে তাহাদের পথেই ঠিক গাছের নীচে দিয়াই গিয়াছে— হাতির কপাল এবং শিরদাঁড়ার নীচে, পিছনে ডান দিক হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতেছে। হাতি খুবই আহত হইয়াছে। তাহাদের মতে হাতী আর বাঁচিবে না।

আমরা শীঘ্র আহারাদি সারিয়া ব্যবস্থামত রওনা হইলাম। বাকী সকলকে মালপত্রসহ খুসিগিরিতে রাখিয়া বলিয়া গেলাম, আমরা যদি কোনও চিঠি পাঠাই তাহা হইলে পত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা তাহারা যেন করে।

হাতীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বুঝিলাম, আহত হস্তী অপর দুইটির সহিত মিলিত হইয়াছে। পথে চলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যে, প্রথমত এইটি অপর দুইটির সহিত মিলিত হইতে চাহিলেও কেন যেন অপর দুইটি ইহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু একটা নরম এঁটেল মাটির মত কর্দমাক্ত স্থানের নিকট আসিয়া মনে হইল, হস্তিনী অপর হস্তীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহত হস্তীর সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রথমে সুস্থ

BanglaBook.org

দুইটি একটা নূতন পথ দিয়া অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। উহাদের মধ্যে গুণ্ডাটি আর ফিরে নাই, কিন্তু 'কুন্‌কী' (অর্থাৎ হস্তিনী) আসিয়া আহত হস্তীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান দেখিয়া ইহাও মনে হইল যে, রক্ত বন্ধ করিবার উদ্দেশে মাটি লইয়া আহত স্থানে দিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাটিতে শুঁড়ের চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইল উভয় হস্তীই শুঁড় দিয়া মাটি তুলিয়াছে। ইহার পর বৃক্ষপত্রাদিতে রক্তের চিহ্ন প্রায় দেখি নাই। এখন

হইতে এই দুই হাতীর পথ আর বিভিন্ন হয় নাই। অপর গুণ্ডাটি মধ্যে মধ্যে এই পথে চলিলেও প্রায় সময়েই অদূরেই এক স্বতন্ত্র পথে গিয়াছে। কখনও এই দুইটির আগে গিয়াছে—কখনও পশ্চাতে। দেখিয়া অনুমান করিলাম, অপর গুণ্ডাটি অতি অল্প সময় ইহাদের নিকট আসিলেও প্রায় সময়ই ভিন্ন পথে গিয়াছে। প্রায় চারি ঘণ্টাকাল হস্তীর পথ অনুসরণ করিয়াও

যখন হস্তীর দেখা পাইলাম না, তখন অসময় হইয়া যাইবে এই ভয়ে পূর্বনির্দিষ্ট 'হাদাং'-এ ফিরিবার কল্পনা করিলাম। পথে কোনও হাতীর শোয়া অথবা খাওয়ার চিহ্ন পাইলাম না। তাহাতে অনুমান হইল, হাতি সমস্ত রাত্রিই চলিয়াছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

এখন পর্যন্ত আমরা হাতির পথেই চলিয়াছিলাম সুতরাং লতা বল্লরীর বেড়াজালের

উৎপাত এতটা হয় নাই। পথ-চলা কতক পরিমাণে সহজই মনে হইয়াছে। তারপর হাতীর পথ ছাড়িয়া সোজা জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে। কত রকমের লতার বন্ধন, একটু অসতর্ক হইলে কোনটা গলায় জড়াইয়া যায়, কোনটা পায়ে লাগিয়া যায়, কোনটায় বন্দুক আটকাইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে নানা অদ্ভুত কাঁটার আঁচড়ে কাপড় জামা ও শরীর কাটিয়া গিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার দুর্ভোগ ভোগ করিতে করিতে পর্বতশিখরে মানুষের চলার পুরাতন পথ পাইলাম। এই পথ ধরিয়া হাতী 'হাদাং'-এ ধান খাইতে যায়। সুতরাং পথটা কিছুটা সুগম হইয়াছে। পাহাড়ে তিন-চার ঘণ্টা চলিবার পর, বিশেষতঃ শিকারের অন্বেষণে বাহির হইলে কেমন যেন একটা 'খুন চাপা' ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়— তখন শারীরিক কষ্ট ও শ্রম বড় একটা উপলব্ধিই হয় না। যখন 'হাদাং'-এ উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে। পাহাড়ের জঙ্গল কাটিয়া প্রায় খারনৈ নদী পর্যন্ত 'হাদাং' করিয়াছে। উপরের অংশে প্রায় সব জায়গায় হাতী ধান খাইয়া নষ্ট করিয়াছে। নীচের দিকের ধান বেশ আছে। দুই-একটা 'বোরং'ও হাতী ভাঙিয়া শেষ করিয়াছে। প্রায় সব গাছেই মাচান ও মই বাঁধা আছে, হাতীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

ধান পাকিয়া যাওয়ায় ধান সংগ্রহের জন্য গারো রমণীরা মাথায় ঝুড়ি ('খক' বা 'জোঙ্গা') বাঁধিয়া ঘুরিতেছে, কেহ 'বোরং'-এ বসিয়া ধান ভানিতেছে। বিস্তীর্ণ হাদাং-এ মোট সাত-আটটি বোরং। ক্ষেতে ধান, চিংড়া (খরমুজ), কাঠ, আলু, রাঙ্গী আলু, কার্পাস তূলা, চুকাই, কচু, মরীচ, ভুট্টা, কাংনী দানা প্রভৃতি লাগান হইয়াছে— মধ্যে মধ্যে মিষ্টি কুমড়া, লাউ, চাল কুমড়া প্রভৃতির গাছও আছে। গারো রমণীরা ধান কাটে না, পাকা শিষ বাছিয়া ছিঁড়িয়া লয়।

সংবাদ পাইলাম কোনও 'বোরং' খালি না থাকায় মুক্ত আকাশের তলে রাত্রিবাস করা ভিন্ন গতি নাই। জলও অনেক নীচে; জলের জন্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পথ নামিতে হইবে। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখানে এক বালতি জল আনিতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগিবে। সুতরাং সর্বপ্রথম স্থির হইল, আজ রাত্রিতেও চিঁড়া ভক্ষণ করা, কারণ জল আনিয়া রান্না করা অসম্ভব! জায়গাটাও অতি খারাপ, সেখানে বসিয়া রান্না করাও চলে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি এক বালতি জল আনার ব্যবস্থা করিয়া চা-পানের উদ্যোগ হইল। কতকটা বন পরিষ্কার করিয়া সেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হইল। ত্রিপল দিয়া সঙ্গের জিনিসপত্র ঢাকিয়া রাখা হইল। লেখা অনাবশ্যক, সন্ধ্যাসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মশা প্রভৃতির ভীষণ আক্রমণ শুরু হইল। আমি প্রতিষেধক হিসাবে প্রত্যহ কুইনাইন খাইতাম, কিন্তু সঙ্গীগণ পুনঃপুনঃ সাবধান করা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলেন। ফলে বাড়ি ফিরিয়া কেবলমাত্র আমিই 'ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া'র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, অন্য সকলেই অল্প বিস্তর ভুগিয়াছে। এমন কি গারোগণও বাদ যায় নাই।

ইতিমধ্যে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জালীগণ আসিয়া বলিল, যে তাহারা প্রায় তিন-চার মাইল দূরেই হাতী দেখিয়া আসিয়াছে। হাতী অত্যন্ত 'কাবু' (অর্থাৎ গুরুতররূপে ক্লিষ্ট) হইয়াছে। খুব ধীরে ধীরে চলে, কান অথবা ঘাড় নাড়াইতে পারে না, শুঁড় ও লেজ নাড়ায় না। হস্তিনী আহত হস্তীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর মধ্যে মধ্যে শুঁড় দিয়া আহত

BanglaBook.org

স্থানে মাটির প্রলেপ দেয় অথবা মাটি গুঁজিয়া দেয়। মানুষের শব্দ পাইলেই হস্তিনী মরিয়া হইয়া আক্রমণ করে। তাহাদের মতে, কাল সূর্যোদয়ের পর ছড়ার ধারেই হাতী নিশ্চিত পাওয়া যাইবে। এই সংবাদে শিকারের সাফল্যের আশায় যেমন উৎফুল্ল হইলাম, তেমনই আবার হাতীর জীবনের নূতন একটি পরিচয় পাইয়া কেমন একটি বিচিত্র অনুভূতিতে আবেশ-বিহ্বল হইয়া রহিলাম। বিচিত্র এই জগৎ! বিচিত্র প্রকৃতির লীলা!

এই গ্রামের গারোকে পূর্ব হইতেই নিযুক্ত করিয়াছি। সে পাঞ্জালীদের সঙ্গে ফিরিলে তাহার চেষ্টায় ও তাহার স্ত্রীর সৌজন্যে রাত্রির জন্য আমাদের মাথা গুঁজিবার স্থান জুটিল। উৎসাহে পাঞ্জালীদিগকে সমস্ত রাত্রি প্রচুর মদ্যপানে আপ্যায়িত করাইল। আমি সারা রাত্রি ভাবিতে লাগিলাম— ইহা কি সত্য যে হাতীর এক বুদ্ধি-মিশ্রিত মায়া আছে।

শিকারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভারে নয়ন-মন যেমন সার্থকতার পরিপূর্ণতা লাভ করে, তেমনই বনবাসী মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্ট জীবনযাত্রার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়লাভেরও যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

খুব সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইলাম। পাঁচজন পাঞ্জালী ভিন্ন দুইজন কুলিকে সঙ্গে লইলাম। কুলির সঙ্গে এক টিফিন-ক্যারিয়ারে দধি, চিঁড়া, গুড় ও ফ্লাস্কে জল এবং দুইটি টর্চ দিয়া দিলাম। যদি হাতীর পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে জঙ্গলে রাত্রি হয়, তাহা হইলে এই সব কাজে লাগিতে পারে।

যেদিকে হাতীর পলায়নের স্বাভাবিক গতি হইবে অনুমান করা গেল, সেই ঘাঁটিতে একজন বন্দুকধারীকে রাখিলাম এবং অপর দুই তিন ঘাঁটিতেও গাছে গাছে দুই তিনজন লোক রাখিয়া দিলাম। হাতী পলায়নপর হইলে তাহারা যেন সেই পথ হইতে ভয় দেখাইয়া হাতি ফিরাইয়া দেয়। বন্দুকধারী ভদ্রলোক গাছে উঠিতে পারেন না, বহু কষ্টে তাঁহাকে গাছে তুলিয়া গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে ভয়ে গাছ হইতে পড়িয়া না যান।

এইসব কার্য সমাধা করিয়া আমরা তিনজন পাঞ্জালী লইয়া হাতির উদ্দেশে হেমদাঙ্গি ছড়ার দিকে নামিতে লাগিলাম। সোজা পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া নামিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে সাজান বাঁশবন। নীচে ছড়ার শব্দ যাইতেছে। হঠাৎ একটা বাঁশ ভাঙার অস্পষ্ট শব্দ কানে আসায় একজন পাঞ্জালীকে গাছের উপরে উঠিয়া হাতীর সাড়া পাওয়া যায় কিনা দেখিতে বলা হইল। লোকটা ঠিক বাঁদরের মত সহজে গাছের উচ্চতম চূড়ায় উঠিয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে নামিয়া আসিয়া বলিল, কিছু নীচেই বড় দাঁতাল, 'গোগাবা', (অর্থাৎ গুলি খাওয়া) হাতীটা হস্তিনীর সঙ্গে ধীরে ধীরে আসিতেছে। দেখিয়া মনে হইল বড় হাতীটা দুই-একটা নলাগ্র ধীরে ধীরে শুঁড় দিয়া মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছে। হস্তিনী কিন্তু তাহার গাত্র সংলগ্ন হইয়া আছে এবং এক-একবার হাতীর মাথায় শুঁড় বুলাইয়া মাটি দিতেছে। পাঞ্জালীকে পুনরায় গাছে চড়িয়া চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া আমরা আরও নামিয়া গেলাম। পঁচিশ-তিরিশ গজ নীচে ছড়া দিয়া ধীরে ধীরে হস্তী অগ্রসর হইতেছে— হস্তী ও হস্তিনী উভয়কেই দেখিলাম। অপর পাশ দিয়া হস্তিনী উহার গা ঘেঁষিয়া

আসিতেছে। হস্তীর অন্য কোনও নড়াচড়া টের পাইলাম না, কিন্তু ক্লিষ্ট গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ধীরে ধীরে কান পর্যন্ত সমস্ত মাথাটা বাহির হইয়া আসিল।

শিকারে প্রায়ই প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্র গুলি না করিলে আর হয়ত গুলি করার অবসর পাওয়া যায় না। হাতির মর্মস্থলে গুলি করার সুযোগ ইহার চেয়ে আর হইতে পারে না— সুতরাং লক্ষ্য করিলাম। আমরা সোজা উপরে ছিলাম, সুতরাং গুলি করিতে হইলে মদস্রাবের ছিদ্রের উপর যে হাড় আছে তাহার কিছু উপরে করিতে হয়, কিন্তু আমার বন্দুকের গুলিটা 'সফট নোজ' ছিল। অবশ্য 'ম্যাগাজিনে' 'হার্ড নোজ' ছিল— বদলাইতে গেলে শব্দে কুফল হইবার আশঙ্কা। অপর রাইফেলেও দুইটিই 'সফট নোজ', সুতরাং মদস্রাবের ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে বাধ্য হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, হাতীকে উল্টাইয়া ফেলিতে এই গুলিই যথেষ্ট হইবে, তাহার পর দ্বিতীয় গুলি প্রয়োজন হইলে 'হার্ড নোজ' ব্যবহার করা যাইবে। কিন্তু গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাতি মাথা ঘুরাইয়া পলায়নপর হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি গুলি করা হইল। পাঞ্জালী গাছের উপর হইতে ডাকিয়া বলিল, হাতী উত্তর দিকে লোকেন্দ্রবাবুর পথে চলিয়াছে— সঙ্গে হস্তিনী আছে। খুব বিশ্বাস ছিল গুলির ধাক্কায় হাতি পড়িয়া যাইবে, তাহা না হওয়ায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

হাতীর পিছনে পিছনে যথাসম্ভব দ্রুত চলিলাম। চলা কি যায়? উঁচুনীচু পাহাড়ের পথ। এই সুবৃহৎ জন্তুগুলি যে দ্রুতগতিতে স্বচ্ছন্দে এই পথ দিয়া যায় তাহার আংশিক বেগে চলিতে পারিলেও হয়তো হাতীর নিকটে যাওয়া সম্ভবপর হইত। কারণ হাতী মধ্যে মধ্যেই দম লইয়া চলিতেছিল। কিছুদূর চলিতেই উত্তরের পথ হইতে চিৎকার শোনা গেল যে, হাতী সেইদিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হাতী ফিরাইয়া দিবার জন্য লোকেন্দ্রবাবু একটা আওয়াজ করিলেন। ইহা শুনিয়া হাতী ফিরিল বটে, কিন্তু আমাদের পথে নহে। হাতীর পথ অনুসরণ করিতে করিতে লোকেন্দ্রবাবুর গাছের দৃষ্টিপথবর্তী হওয়া মাত্র তিনি বলিলেন, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া, আহত গুণ্ডা ও হস্তিনী সেই পর্যন্ত আসিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল— বন্দুকের শব্দ শুনিয়া পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছে! হাতির কপালে দুই জায়গায় মদস্রাবের ছিদ্রের নিকট, কানের পাশে এবং শিরদাঁড়ার নীচে, এই কয়েক স্থান হইতেই রক্তপাত হইতেছে। পূর্বের ক্ষতস্থান মাটির প্রলেপে ঢাকা।

ইহার পর হাতীর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগিলাম। যেখানেই কাদা মাটি পাইয়াছে ক্ষতস্থানে তাহা প্রলেপ করিয়াছে— এখানেও মনে হইল হস্তিনী ক্রমাগত হস্তীর পরিচর্যা করিয়াছে। কত দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় হস্তী এইভাবে পার হইয়া চলিয়াছে তাহার অবধি নাই। কি শক্তিমান এই জন্তু! আমরা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও অসম্ভব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আশা সম্পূর্ণ ছাড়ি নাই।

বেলা সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলিয়া প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক স্থানে আসিয়া হাতীর সদ্য চিহ্ন পুনরায় পাইলাম— একটা জায়গায় কিছু পূর্বেই শুইয়াছে এবং হাতী এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে উঠিবার সময় দাঁতের উপর ভর করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে।

BanglaBook.org

এইস্থান হইতে অল্প দূর মাত্র গিয়াই হাতীর বাঁশ ভাঙার শব্দ পাইলাম। বৃক্ষবহুল স্থানের শেষে একটি তিন-চার হাত পরিমাণ নালা পার হইয়া হাতী একটা 'চাতালে' (অর্থাৎ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অপরিসর সমতল ক্ষেত্রে) ঘন সন্নিবিষ্ট নলবনে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা হাতীর পথে, নালার ধারে, দাঁড়াইয়া থাকিতেই সুস্পষ্ট নিঃশ্বাসের শব্দ পাইলাম। পাশেই একটা ছোট গাছ ছিল। একজন পাঞ্জালীকে তাহার উপর হইতে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নির্দেশ করিলাম। লোকটা গাছে উঠিয়া একটু পরেই সহসা নামিয়া আসিল। বলিল, হাতী দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছে। হস্তিনী আহত হস্তীকে আড়াল করিয়া আছে, আক্রমণোদ্যত হইয়া আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। লোকটা গাছে উঠিয়াই দেখে হস্তিনী আহতের ক্ষতস্থানে শুঁড় বুলাইয়া মাটির প্রলেপ দিতেছে। কিন্তু আমাদের শব্দ পাইয়াই হউক অথবা গন্ধ পাইয়াই হউক, সহসা উত্তেজিত হইয়া ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখনও হাতীর নূতন ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতেছিল; কিন্তু পুরাতন ক্ষতস্থান হইতে তখনও কিছু রক্তই হউক বা জলীয় কোনও পদার্থই হউক মিলিত হইয়া প্রলেপের মাটি ভিজাইয়া দিয়াছিল।

এমন সমতল জায়গায় এত ঘন-সন্নিবিষ্ট বনে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শিকার করিতে যাওয়া বিপজ্জনক হইবে। আমরা পাঞ্জালী ভাল নহে— সুতরাং একজন গারো পাঞ্জালীকে সম্মুখে রাখিয়াই হাতির অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু এই ধরনের বনে হাতীর অনুসরণ করিতে যাইয়া হঠাৎ এমন ভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে যে, শিকারী হাতী দেখিতে পাইবার পূর্বেই পাঞ্জালী হস্তী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং শিকারী সম্মুখে না থাকিয়া পাঞ্জালীর অনুসরণ করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত অন্যায় এবং বিপজ্জনক। নিরস্ত্র পাঞ্জালীকে এইভাবে বিপদের মুখে ফেলিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকা কোনও শিকারীর পক্ষে বর্বরোচিত কাপুরুষতা। অথচ নিজের জ্ঞানের অল্পতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকায় মূঢ়ের মত বৃথা স্পর্ধা করিতে পারি না। ভুল পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিলে শিকার নষ্ট ও অপমৃত্যু উভয়ই হইতে পারে। সুতরাং স্থির করিলাম, পাঞ্জালীকে গাছের উপর উঠাইয়া হাতীর দিকে ঢিল ছুঁড়িতে বলিব। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া আক্রমণ করিতে আসাই হাতীর পক্ষে স্বাভাবিক, তখন গুলি করিব। কিন্তু হস্তিনীও আসিতে পারে, সেইজন্য 'শট্ গানে' 'এস. জি' মার্কা ছর্‌রা ভরিয়া রাখিয়া অপর এক শিকারীর হাতে দিয়া বলিলাম, 'কুন্‌কী' আক্রমণ করিতে আসিলে তাহার পায়ে গুলি করিতে হইবে। পুনরায় পাঞ্জালী গাছে চড়িয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, হাতী দুইটাই একটু দূরে জঙ্গলের আড়ালে সরিয়া গিয়াছে— এখন আর তাহাদের শরীর দেখা যায় না। তখন দুইজন পাঞ্জালীকে উল্টা পথে যাইয়া ফাঁকা আওয়াজ করিয়া হাতীকে আমাদের পথে তাড়াইয়া দিতে বলিলাম, তাহা হইলে হাতী আমাদের দিকে অগ্রসর হইলে গুলি করার খুবই সুযোগ হইবে। পাঞ্জালীগণ চলিয়া গেলে একটা গাছের আড়ালে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা গাছ ভাঙার শব্দ হওয়ার পরই হস্তিনীর ভীষণ ক্রোধান্ধ একটা শঙ্খনাদ শুনিলাম। তাহার পর আর কিছুই শোনা যায় না। সব স্তব্ধ। স্থির হইয়া চাহিয়া আছি, হাতী আমাদের পথে

BanglaBook.org

আসে কিনা দেখিবার জন্য। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে— বনানী বিহগ-কূজনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, গাছের নীচে ছায়া দ্রুত ঘনতর হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় মনে হইল, বিরাট ভূতের মত কী যেন একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে গাছের নীচে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার মনে হইল যেন হাতী। ঠিক সামনা-সামনি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে— নিশ্চল। দুইটা দাঁতও যেন স্পষ্টই মনে হইল, কিন্তু আবার মনে হইল, বুঝি চোখের ধাঁধা, গাছের ডালে আলো পড়ায় অমন দেখা যাইতেছে। চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। দশ গজ অগ্রসর হইয়া একটা উঁচু জায়গায় যেই দাঁড়াইয়া দেখিতে যাইব, অমনি অতর্কিতে একটা শুকনো ডালের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় শব্দ ও সব অদৃশ্য। পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে দাঁড়াইয়াছিল হাতীটা অথচ আমি এবং সঙ্গীদ্বয় কেহই টের পাইলাম না।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জালীদ্বয় ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিল, তাহারা যেদিকে গিয়াছিল হাতিও সেইদিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ তাহারা সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র হস্তিনী তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সম্মুখে একটা গাছ থাকায় তাহারা রক্ষা

পাইয়াছে। হস্তিনী আসিয়াই গাছটা ভাঙিয়া ফেলে। ইত্যবসরে তাহারা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। হস্তিনী রাগে চিৎকার করিয়া কিছুদূর দৌড়াইয়া আসে। এই অবস্থায় বন্দুকধারী পাঞ্জালী গুলি ছুঁড়িবার অবসরও পায় নাই।

ইহার পর সেই রাত্রিতে গারো পাহাড়ের নিবিড় বনে কি কষ্ট পাইয়াছি তাহা লিখিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না।

পাঞ্জালী এই হাতীকে আরও অনেকদিন অনুসরণ করিয়াছে— শেষ সংবাদ যাহা দিয়াছে, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, হস্তিনী আহত সঙ্গীর সান্নিধ্য কখনও পরিত্যাগ করে নাই, মানুষের শব্দ শোনা মাত্র পাগল হইয়া আক্রমণ করিয়াছে।

এই শিকার-স্মৃতি বহুদিন মনে জাগিবে— আর স্পষ্ট হইয়া থাকিবে হাতীর এই মায়ার বন্ধনের দৃষ্টান্ত।

(বানান অপরিবর্তিত)

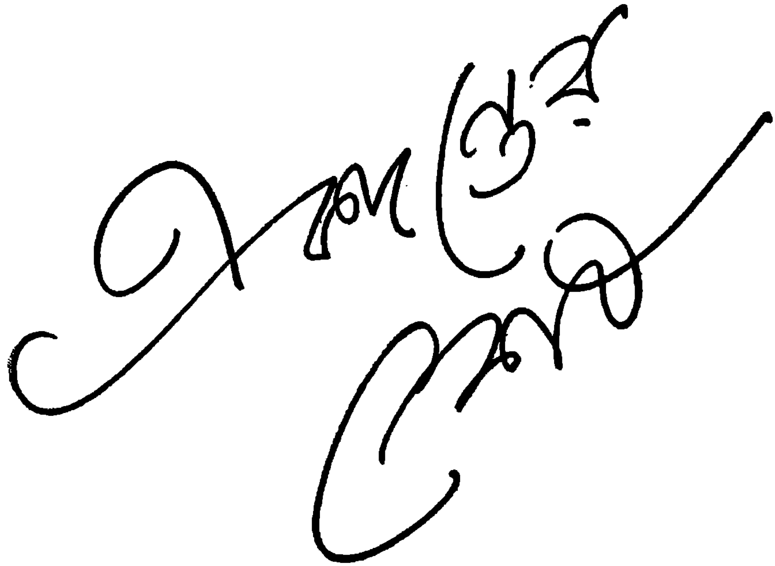

সুধাংশুকান্ত আচার্য

১৯৩৪ সালের ২৫ নভেম্বর আমার শিকার-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় দিন। ওইদিন সকালে ম্যানেজারবাবু এসে জানালেন যে, আমাদের এক গাড়ি কয়লা এসেছে এবং আজই গাড়ি খালাস করে না দিলে ডেমারেজ দিতে হবে। বাগানে যে কয়েকজন মোটর ড্রাইভার আছে তাদের সবারই জ্বর। একমাত্র ন্যাপা ভালো আছে, তাকে ছেড়ে দিলে সুবিধা হয়। অগত্যা ন্যাপাকে ডেকে কয়লা আনার কথা বলে দিলাম— আরও বললাম যে, সন্ধের দিকে তাকে ছুটি দিয়ে আমি নিজে বরং কয়েকবার গিয়ে অবশিষ্ট কয়লাগুলো নিয়ে আসতে পারব। ন্যাপা এ প্রস্তাবে রাজি হল না— সে বললে, তার বিশ্রামের দরকার নেই, সে একাই সমস্ত কয়লা নিয়ে আসতে পারবে। তবে শেষের দিকে শিকারের জন্য আমি তার সঙ্গে যেতে পারি। সে ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে গেল, আমিও মাঠের কাজ দেখতে লাগলাম।

বেলা প্রায় বারোটা। ন্যাপা এর মধ্যে দু-তিন বার কয়লা এনে কলঘরের কাছে নামিয়ে এসেছে। এবার দেখি কয়লাসুদ্ধ ট্রাক নিয়ে মাঠে এসে হাজির। আমি একটু বিস্মৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— ব্যাপার কি? সে বলল— আসবার সময় পথে দুটো বনগোরু— বাইসন দেখে এসেছে— এখন গেলে খুব সম্ভব পাওয়া যাবে। সমস্ত কয়লা যা বাকি ছিল তা নামানো হয়েছে, আজ না আনতে পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। তখনই

BanglaBook.org

লিমকে হাতি আনতে খবর পাঠালাম, ম্যানেজারবাবুকেও জানিয়ে দিলাম যে ন্যাপা াজ আর কাজে যেতে পারবে না— আমার সঙ্গে শিকারে যাচ্ছে।

মাঠ থেকে বাংলোয় ফিরে শিকারের জন্য তৈরি হয়ে নীচে আসামাত্রই দুজন লোক াদতে কাঁদতে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে তারা ফোঁপাতে ফাঁপাতে বললে যে, একদন্ত তাদের বস্তিতে এসে মহা উৎপাত আরম্ভ করে দিয়েছে— ধু তাই নয়, তাদের একজনের স্ত্রী ও আর একজনের এক আত্মীয়কে মেরে ফেলেছে। খুনি যদি আমি গিয়ে সকলকে রক্ষা না করি, তবে একদন্ত আজ কতজনকে মারবে তা লা যায় না! শুনে বড়ো কষ্ট বোধ হল, তবুও রাগের ভান করে বললাম— বেশ আমি াব কিন্তু খবর যদি মিথ্যে হয় তবে তার জরিমানা দুটো ঘাটী দিতে হবে। দ্বিরুক্তি না রে লোক দুটো স্বীকার করল। এর মধ্যে ইলিম হাতি নিয়ে এসেছে। তাকে বললাম— ই লোক দুজনকে নিয়ে ওদের বস্তিতে গিয়ে খোঁজ নাও সেখানে একদন্ত আছে কিনা। াকলে তার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখো— আমরা একটু পরেই আসছি।

ওদের বস্তি আমাদের বাগান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে। বেলা দুটোর সময় ট্রাক রতি হয়ে আমরা সেই বস্তিতে পৌছুলাম। ইলিম এসে জানাল যে এবারকার খবর ত্যি— সে নিজে একদন্তকে দেখেছে, এখন একটা বড়ো বেতঝাড়ের মধ্যে আছে।

আমাদের দুটো হাতির মধ্যে একটির নাম 'বিজয়সিংহ', অন্যটির নাম 'বালা'। আমি জয়সিংহের ওপর না উঠে বালার উপর উঠলাম— কারণ, নর হাতি দেখলে পাগলা ন্ডা হাতি ভয়ানক ভাবে charge করে। ইলিমকে আস্তে আস্তে বেতঝাড়ের মধ্যে ঢুকে

যেতে বললাম। বেতঝাড়ের ভিতর ঢোকা যে কত কঠিন ব্যাপার তা লিখে বোঝানো শক্ত। বেতের শিষ ও কাঁটা লেগে সবারই হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সঙ্গে ছিল খোকা ও গিরন— তারাও কাঁটার খোঁচায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এত কষ্ট করেও কিছু লাভ হল না। একদন্ত আগেই সেখান থেকে সরে গিয়েছে। হতাশ হয়ে জঙ্গল থেকে বের হব, এমন সময় গ্রামের লোকের চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড হাতি ধানখেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধান খাচ্ছে। এত লোকের হইচই সে যেন ভ্রূক্ষেপই করছে না। এতদিন যাকে দেখার জন্য এত জায়গায় ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি, আজ তাকে এমনি কাছে ভালো করে দেখতে পেয়ে, উত্তেজনায় আমার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। যদিও অভ্যাসমতো গুলি করার জন্য রাইফেল তখনই তুলে ধরেছিলাম, কিন্তু গুলি করা এ অবস্থায় সম্ভব নয়। তাই হাতি থেকে লাফিয়ে নেমে সবাইকে চুপচাপ থাকতে বলে রাইফেল নিয়ে ধানখেতের মধ্যে দিয়ে একদন্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। একটু পরেই বোধ হল হাতিটা আমাকে দেখতে পেয়েছে— কারণ, সে কান ফেঁদে শুঁড় তুলে ল্যাজ সোজা করে স্থির হয়ে একটু দাঁড়িয়েই আস্তে আস্তে দু-এক পা করে আমার দিকে এগুতে লাগল, মনে হল এবারে ঠিক চার্জ করবে। আমি তাকে সে-অবসর না দিয়ে, ধানখেতের মধ্যে একটা জংলি গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, তার বিরাট মাথা লক্ষ করে গুলি ছুড়লাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম হাতিটা একটু চমকে মাথাটা সরিয়ে নিল এবং আমাকে আক্রমণ না করে একটু ঘুরে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি রাইফেলে আর একটা গুলি ভরে তার বিরাট পাঁজরা লক্ষ করে গুলি করলাম এই মনে করে যে, সে যদি এখন আমাকে আক্রমণ করে তবে তাকে ফেরাবার জন্য তখনও আর একটি গুলি আমার রাইফেলে রইল। কিন্তু আক্রমণ দূরে থাকুক, আমার দ্বিতীয় গুলি খেয়ে অতবড়ো হাতিটা একেবারে উলটে পড়ে গেল— ঠিক যেন একটা বড়ো কালো পাথর কেউ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিলে। আমি আনন্দে তখনই আর একটা গুলি ছুড়লাম, কিন্তু এবারের গুলি হাতির গায়ে না লেগে আমার চার-পাঁচ হাত সামনের কতকগুলো ধানগাছ মাটিসুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে গেল। রাইফেলের নল যে এতখানি ঝুলে পড়েছে আমি তা মোটেই বুঝতে পারিনি। যা হোক, এইভাবে আর গুলি করা ঠিক হবে না মনে করে, ইলিমকে ডেকে বালার উপরে উঠে একদন্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এরই মধ্যে সে উঠে সামনের বাঁশঝাড়ে মাথা ঢুকিয়ে এমনভাবে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল যে, তার মাথাটা আর মোটেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা যখন প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে তখন ইলিমকে ওর সামনে যেতে হুকুম দিতে সে বললে— দাদা, সেটা ঠিক হবে না— অতবড়ো হাতি মরতে মরতেও যদি একবার চার্জ করে, তবে আপনাকে তো বাঁচাতে পারবই না, আমরাও কেউ বাঁচব না। তার চেয়ে বরং এখান থেকেই গুলি করে ওর মেরুদণ্ড ভেঙে দিন। কথাটা ঠিক বলেই মনে হল। মেরুদণ্ড লক্ষ করে একটি গুলি করতেই হাতিটা আস্তে আস্তে বসে পড়ল এবং শুঁড় আকাশের দিকে তুলে শব্দ করে ভগবানের কাছে যেন তার অন্তিম প্রার্থনা জানাচ্ছে মনে হল— সেই সময় পিছন থেকে তার মাথাটা দেখতে পেয়ে আর একটা গুলি করলাম। সঙ্গেসঙ্গেই সে

BanglaBook.org

মাথা নামিয়ে দাঁতটা জোরে মাটিতে বসিয়ে দিলে। প্রসিদ্ধ লেখক Rudyard Kipling লিখেছেন, হাতি মরার আগে ভগবানকে ডাকে। আমার এই ব্যাপার দেখে তাঁর সেই কথাটা সত্য বলে মনে হল। কাছে গিয়ে দেখলাম তখনও শুঁড়ের ডগাটা অল্প অল্প নড়ছে, আর একটা গুলি করে সব শেষ করে দিলাম। আমার হাতি 'বালা'র উপর থেকে তার উপরে লাফিয়ে উঠতে একটু অসুবিধে হল না। বালা সাড়ে আট ফিট উঁচু, কিন্তু একদন্ত যে 'বৈঠ' দেবার ভঙ্গিতে বসেছিল, তাতেও সে বালা থেকে বেশ উঁচুই ছিল। এতবড়ো হাতি নিরাপদে শিকার করবার আনন্দের আতিশয্যে আমি উচ্ছ্বসিতভাবে বললাম—

BanglaBook.org

ইলিম, এইরকম হাতিতে হাওদা চাপিয়ে শিকার করতে কী আনন্দ, —কিন্তু ইলিমের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে ফিরে চেয়ে দেখি, সে আর গিরন দুজনেই কাঁদছে।

তাদের দুঃখের কারণ বুঝতে পারলাম— পুরুষানুক্রমে তারা হাতি চালিয়ে আসছে— হাতিকে তারা নিজের জন বলেই জানে— তাই বন্য হাতি হলেও হাতির ওপর তাদের টান এত বেশি। যা হোক, ইলিম আমার কথার জবাবে বলল— ওর ওপরে হাওদা কষে শিকারে গেলে কিংবা চারজামা চড়িয়ে রাস্তায় বের করলে অতি চমৎকার দেখায় সত্যি, কিন্তু ওকে চালাত কে? ওর ঘাড়টা দেখছেন না? হাতিটার ঘাড়ের দিকে তখন লক্ষ্য গেল— দেখলাম, তার ঘাড় এত চওড়া যে আমি কোনোরকমেই দু-দিকে পা ঝুলিয়ে মাহুতের মতন করে তার ওপরে বসতে পারলাম না। এই অবসরে আমার হাতি দুটো খেতের ধান খাচ্ছে আর নষ্ট করছে দেখে, মাহুতকে হাতি সরিয়ে নিতে বললাম। কিন্তু সবাই আপত্তি জানিয়ে বলল, একদন্তর উৎপাতে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আজ থেকে যখন আর তার উপদ্রবের আশঙ্কা রইল না, তখন যে হাতির সাহায্যে আমি একদন্তকে মেরেছি, খেতের সমস্ত ধান সেই হাতিরই প্রাপ্য— আমি যেন তাতে বাধা না দিই। হঠাৎ ন্যাপা এসে আমার হাত ধরে টেনে বলল, দাদা, নেমে আসুন শিগ্‌গির। আমি নেমে পড়তেই সে বলল, হাতিটার ওপর নিশ্চয়ই দেবতার দৃষ্টি আছে, দেখুন না ওর পিতামটার— কপালটার দিকে চেয়ে? বিস্মিত হয়ে দেখলাম, সত্যি যেন কেউ এইমাত্র তার কপালের উঁচু জায়গার চারধারে ঘুরিয়ে এক নীল বৃত্ত রচনা করেছে। আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত দেখে কৌতূহলী জনতার মধ্যে অনেকে ব্যাপার কী জানতে চাইল। ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছি। দেবতার দৃষ্টির কথা তাদের কাছে কোনোরকমেই বলা চলে না। তাহলে একদন্তের দাঁত কাটা নিয়ে এক মহা গোলযোগের সৃষ্টি হবে। তাই— কিছু নয়— বলে সবাইকে নিয়ে সেখান থেকে সরে এলাম। এখন আমাদের অনেক কাজ বাকি; forest office-এ খবর দেওয়া, একদন্তর দাঁত কাটা, কবর দেওয়া। তাই কয়েকজনকে মৃত হাতির পাহারায় রেখে আমরা সবাই বাগানে ফিরে এলাম।

সেখান থেকে ranger-কে খবর পাঠিয়ে নিজেরা খাওয়া শেষ করে দাঁত কাটার যন্ত্রপাতি ও লোকজন নিয়ে যখন ফিরলাম, তখন বেলা আর বেশি নেই। এর মধ্যেই forest office-এর লোক এসে দাঁত কেটে নেবার অনুমতি দিয়ে গেল। এখানে একটা কথা বলা দরকার— সাধারণত proclaimed হাতি মারলে forest office-এর লোকে এসে নিজেরাই দাঁত কেটে নিয়ে যায় এবং ছ-মাস তারা খোঁজখবর নেয় যে ওটা সত্যিই proclaimed কিনা। ছ-মাসের মধ্যে আর যদি ওই অঞ্চলের পাগলা হাতির অত্যাচারের কোনো খবর না পাওয়া যায়, তখন সেই দাঁত এবং বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের টাকা শিকারিকে দেওয়া হয়। কিন্তু এই একদন্ত এতই সুপরিচিত ছিল যে তার আর শনাক্ত করতে দেরি হল না। Ranger তখনই আমায় দাঁত কেটে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে গেলেন। দাঁত কাটার কষ্টসাধ্য কাজটা আমি তাদের দিয়েই কাটিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু সবসময় তারা পরিশ্রম করে দাঁতের গোড়া অবধি না কেটে বাইরে যতটুকু থাকে সেইটুকু মাত্র কাটে বলে এই ভারটা নিজের ওপরই রাখলাম।

BanglaBook.org

তবে মুশকিল হল এই যে, আমরা কেউ জানতাম না দাঁত কাটা প্রথমে কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে। তাই যতটুকু বাইরে আছে তার গোড়া থেকে শুরু করলাম। হাতির দাঁতের গোড়া যে তার চোখ অবধি তা আগে জানা ছিল না। এদের দাঁত বাইরে যতখানি থাকে, ভিতরেও প্রায় ততখানি থাকে। দশ-বারোজন পালা করে সন্ধ্যা থেকে কাটতে আরম্ভ করে যখন দাঁত কাটা শেষ হল তখন ভোর। আমরা তিন-চারজন একসঙ্গে কাজ করতাম আর বাকি সাত-আটজন হাতির মৃতদেহের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করত, এমনকী ঘুমোতেও অসুবিধা বোধ করেনি। এমনি প্রশস্ত এবং মাংসল তার দেহ। হবে না

কেন! সে ছিল— স্বাধীন— পোষা জানোয়ারের বাঁধা বরাদ্দের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়নি— তাই তার দেহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই বেড়ে উঠেছিল।

মরবার সময় একদন্ত'র কপালে যে নীল বৃত্ত দেখা গিয়েছিল এই বিষয়ে বাবাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম। তিনি তার উত্তরে লিখেছিলেন যে, খুব সম্ভব এই হাতির মাথায় গজমুক্তা আছে। আমি যেন মাথাটা কেটে ভালো করে খোঁজ করি। কিন্তু তখন সে-উপায় ছিল না। কারণ, তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এর চার-পাঁচ বছর পরে বাবা ও মা বাগানে বেড়াতে আসেন, তখন বাবার সঙ্গে সেই একদন্ত'র কবর খুঁড়ে দেখা গেল— তার দেহ থেকে ধোঁয়া উঠছে ও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে। আমি আজও জানি না, এর কারণ কী। আবার তাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে এলাম। গজমুক্তার খোঁজ করা আর হয়নি। হাতিটা উঁচুতে বারো ফিটের ওপর ছিল আর দাঁতটা লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি এবং বেড়ের দিকে এক ফুট পাঁচ ইঞ্চি এবং ওর ওজন ছিল এক মণ পাঁচ সের।

প্যান্থার

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

একটা বাঘের উপদ্রব যখন অতিশয় বেশি হয়ে উঠেছিল তখন ময়ূরভঞ্জের কর্তৃপক্ষ তাকে মারবার জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময়ে আমার ঊর্ধ্বতন একজন সিভিলিয়ান সাহেব কর্মচারী ওই বাঘকে মারবার জন্য একটি রীতিমতো অভিযানের বন্দোবস্ত করেন এবং তিনিই অভিযানের নেতা হয়েছিলেন। বাঘের উপদ্রবের জঙ্গল এলাকাকে চার ভাগ করে তিনি এক ভাগ নিজের হাতে রাখলেন, অপর তিন ভাগ তিনজন শিকারিকে দেওয়া হল এবং ওই তিনজনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাগে জঙ্গলের মধ্যে আগে থেকে মাচান তৈরি করে সেইসব মাচানের কাছে মহিষ বা অল্প দামের ঘোড়া কিনে বাঁধতে লাগলাম, উদ্দেশ্য যে বাঘে কোনো মহিষ বা ঘোড়া মেরে গেলে মাচানে গিয়ে বসব, আর বাঘ পুনরায় মড়ির কাছে আসলে তাকে মারব। চার-পাঁচ মাইল অন্তরে অন্তরে আমাদের ক্যাম্প পড়ল।

BanglaBook.org

জঙ্গল থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে এক গ্রামে আমি তাঁবু ফেলে রইলাম। প্রত্যহ প্রাতে আর সন্ধ্যায় গ্রামের লোকেরা কয়েকজন একত্র হয়ে জঙ্গলে গিয়ে আমার বাঁধা মহিষটাকে ঘাস জল দিয়ে আসত।

এইরকম চার-পাঁচ দিন করার পর, একদিন প্রাতে গ্রামবাসীরা মহিষকে দেখে ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, পূর্ব-রাত্রিতে মহিষটাকে বাঘে মেরে রেখে গেছে। ওই সময়ে আমার ক্যাম্পে দুটো হাতি ছিল। আমি জনকয়েক লোক সঙ্গে নিয়ে একটা হাতিতে চড়ে মড়ির কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, মড়ির পিছন দিকের খানিকটা নরম মাংস বাঘ খেয়ে গেছে। তখন গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টি না হওয়ায় কঙ্করময় মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে। মহিষকে মারবার সময় বাঘের নখে স্থানে স্থানে মাটি খুঁড়ে গেছে বটে, কিন্তু শক্ত মাটিতে বাঘের থাবার সম্পূর্ণ দাগ মড়ির কাছে দেখতে পেলাম না। তখন আমি নিকটে বনের মধ্যে চারপাশে খুঁজে দেখতে দেখতে দেখলাম যে, একটা সরু নালার ভিতর ভিজে মাটিতে বাঘের পায়ের সদ্য চিহ্ন রয়েছে। নালাতে ঝিরঝির করে জল বয়ে যাচ্ছে, মহিষ মেরে রক্তমাংস খেয়ে বাঘ সেখানে জল খেতে এসেছিল।

ইতিমধ্যে আমার আদেশমতো সঙ্গের লোকেরা, মাচানের চারদিকে যে পাতার বেড়া দিয়ে মাচানকে আড়াল করে দেওয়া হয়, সেটাকে নূতন পাতা দিয়ে মেরামত করে দিল। আমি মাচানে গিয়ে বসলাম। সঙ্গের লোকেরা চলে গেল। মাহুতকে বললাম হাতিকে জঙ্গলের বাহিরে নিয়ে গিয়ে কোনো গাছের তলায় ছায়াতে রাখতে। সমস্ত দিন কিন্তু বাঘের দেখা নেই।

যখন ঠিক সূর্যাস্ত হয়েছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে, তখন দেখতে পেলাম বাঘ আসছে— বেশ বড়ো একটা প্যান্থার। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসছে, একটুও চলার শব্দ পর্যন্ত নেই। কয়েক পা এসে থামছে আর চারদিকে চাইছে। সোজা না এসে বক্র সর্পিল-গতিতে একবার এদিকে একবার ওদিকে সরে গিয়ে মড়ির দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ক্রমশ মড়ির খুব কাছে এসে, বিড়াল যেমন করে থাবা গেড়ে বসে, সেইরকম করে মাচানের দিকে মুখ করে বসল। সেই সময় আমি রাইফেল তুলে নিয়ে যেমন লক্ষ করতে যাচ্ছি, আমার অত্যন্ত সাবধানতা সত্ত্বেও রাইফেলের নলা একটা পাতায় লেগে একটু খুস করে শব্দ করল। শব্দ হতেই প্যান্থারটা চকিতে মুখ তুলে গাছের উপরের দিকে, অর্থাৎ মাচানের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল, কিন্তু আমি একটুও না নড়ে নিমেষ না ফেলে, তার দিকে চেয়ে রইলাম। অন্ধকার হয়ে আসছিল আর আমি পাতার বেড়ার পিছনে ছিলাম বলে বাঘ পাতার আড়ালে আমার চোখ দেখতে পেল না। অল্পক্ষণ ওইরকম তাকিয়ে থেকে সে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে তার আশেপাশে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সেই অবকাশে আমি গুলি করলাম। রাইফেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ একটা গর্জন করে এক লাফে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হল। আমি বুঝতে পারলাম গুলি বুকে না লেগে পেটে লাগল, কারণ বুকে ওই প্রচণ্ড রাইফেলের গুলি লাগলে বাঘ ওইখানেই উলটে পড়ত।

মাহুত আমার বন্দুকের শব্দ শোনার প্রায় আধঘন্টা পরে হাতি এনে উপস্থিত করল।

BanglaBook.org

সে আগে দূর থেকে চেঁচিয়ে বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করল। বাঘ যেদিকে চলে গেছে মাহুত আমার কথামতো তার বিপরীত দিক দিয়ে হাতি নিয়ে এল। হাতি মাচানের নীচে এসে দাঁড়ানোর পরে আমি মাচান থেকে নেমে গেলাম। দেখলাম বাঘ যেখানে বসে ছিল সেখানে সদ্য রক্ত পড়েছে মাটির উপর। অন্ধকারে বনের মধ্যে ওই বাঘকে অনুসরণ করা বৃথা আর অত্যন্ত বিপজ্জনক বুঝে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

ক্যাম্পে ফিরে গ্রামের লোকদের বললাম যে পরদিন প্রাতে আমি বাঘ খুঁজতে যাব। তারা সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করল আমার সঙ্গে যেতে। রাত্রি শেষ হতে-না-হতেই তারা আমার তাঁবুর কাছে জড়ো হল। সকালে উঠে তাঁবুর বাহিরে এসে দেখি যে গ্রামবাসীরা— প্রায় শ-খানেক লোক— ধনুর্বাণ, টাঙ্গি, কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে বসে রয়েছে। আমি বললাম যে, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে বেরুতে আমার একটু দেরি হবে। তারা ওই দেরিটুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাদের ভিতর একজন প্রৌঢ় ছিল, সে অল্প বয়সে শিকার করত। সে আমার অনুমতি চাইল যে ওই লোকদের নিয়ে আগেই বনে গিয়ে সাবধানে খুঁজে দেখবে যে বাঘটা বেঁচে আছে কি না। কথাটা আমার ভালো লাগল না, কারণ

BanglaBook.org

আহত বাঘ যে কী ভয়ানক তা আমার জানা ছিল। কিন্তু লোকটি এবং অন্য গ্রামবাসীরা অতিশয় অনুরোধ করায় আমি তাদের যেতে দিলাম। বলে দিলাম, যে তারা যেন অতি সাবধানে রক্তের দাগ অনুসরণ করে এবং যেমন দেখবে যে রক্তের দাগ শেষ হয়েছে—

আর এগোবে না। ওইসব কোল সাঁওতাল ভূমিজ গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে, যারা জঙ্গলের মধ্যে নানারকম চিহ্ন দেখে জানোয়ারের গতিবিধি লক্ষ করতে খুব দক্ষ, আরও সেইজন্য কতকটা আশ্বস্ত হয়ে তাদের যেতে দিলাম। এই ভুলটা এই ঘটনার

আগে কখনো করিনি এবং পরে তো নয়ই, আর ভুল করার ফলটা সেদিন হাতে হাতে পেয়েছিলাম। প্রৌঢ় শিকারির অনুরোধে কার্তুজ-ভরা একটা সাদা জোড়নলী বন্দুক তার হাতে দিলাম। আমার একজন পিয়োনকে একটা হাতি দিয়ে ওই লোকদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম যেন রক্তের দাগ অনুসরণ করার সময় হাতিটা আগে আগে যায়।

লোকগুলি হাতি নিয়ে বিদায় হয়ে যাওয়ার প্রায় আধঘণ্টা পরে অপর হাতিটা চড়ে আমি শিকারস্থলে রওনা হলাম। অর্ধেক রাস্তা গিয়েছি, এমন সময় দেখলাম যে, একজন লোক জঙ্গলের দিক থেকে দৌড়ে আসছে। কাছে এসেই সে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'একজনকে বাঘে ধরে ফেলেছে!' শুনে আমি চমকে উঠলাম। কী করে ধরল জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, 'আমরা মাচানের তলা থেকে রক্তর দাগ দেখে যেতে যেতে বনের মধ্যে অনেকটা দূরে একটা ঘন ঝোপের কাছাকাছি যেমন পৌঁচেছি, বাঘটা ভয়ানক গর্জন করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে এল। আমরা যেদিকে পারলাম ছুটে পালালাম, হাতিটাও দৌড় দিল। খানিক দূর দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আর বাঘটাকে দেখতে পেলাম না। আমরা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ করে বাঘকে পুনরায় খুঁজে বার করার জন্য পন্তা ধরে দাঁড়ালাম, তারপর ওই লাইন ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে একটা উঁচু বড়ো পাথর আমাদের লাইনের সামনে পড়ল। ওই পাথরের আড়ালে যে বাঘ লুকিয়ে থাকবে এ আমাদের মনেই হয়নি। লাইনের একটু আগে আগে বুড়ো শিকারি বন্দুক নিয়ে চলছিল, সে যেমন ওই পাথরের কাছে পৌঁছুল অমনি বাঘ পাথরের ওপাশ থেকে গর্জন করে, এক লাফে তার উপর এসে পড়ল। বুড়ো মাটিতে পড়ে গেছে আর বাঘ তাকে কামড়ে ধরেছে এই দেখেই আমি দৌড়েছি তোমাকে খবর দিতে। অন্য লোকেরাও পালাচ্ছে দেখে এসেছি।

এই কথা শুনে আমি বুঝলাম যে, যে কাজ করতে, অর্থাৎ বাঘকে উত্ত্যক্ত করতে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম, এরা ঠিক সেই কাজটি করে বসেছে। আমি মাহুতকে বললাম, হাতিকে দৌড় করিয়ে দিতে। যথাসম্ভব শীঘ্র ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম, যে সেই প্রৌঢ় শিকারি মাটিতে পড়ে আছে। তার ডান হাতের উপরের অংশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে আর ওই অংশের হাড় দুই-তিন টুকরো হয়ে মাংস ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছে। রক্তে মাটি ভিজে গেছে আর তখনও ক্ষতস্থানগুলো থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। আমি তখনই একজনের একখানা গামছা নিয়ে ক্ষতগুলো উপরের দিকের অংশে শক্ত করে জড়িয়ে একটা কাঠি দিয়ে, যাকে টুর্নিকেট (tourniquet) বলে, সেইরকম করে ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে, রক্ত বন্ধ করে দিলাম। তারপর আহত লোকটিকে জঙ্গলের বাহিরে বইয়ে নিয়ে গিয়ে, গ্রাম থেকে খাটিয়া আনতে লোক পাঠালাম, আর কয়েকজন লোককে মোতায়েন করে রাখলাম, খাটিয়া আনলেই তারা তাতে করে শিকারিকে সেখান থেকে দশ মাইল দূরে হাসপাতালে বয়ে নিয়ে যাবে। এই বন্দোবস্ত করে আমি আবার জঙ্গলে ফিরে গেলাম।

BanglaBook.org

সেখানে আমার পিয়োন বলল যে, শিকারিকে বাঘে ধরবার পর যারা পালাচ্ছিল

তাদের কয়েকজন লোক ফিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে দূর থেকে বাঘের দিকে পাথর ছুড়েছিল। পাছে শিকারির গায়ে লাগে এই ভয়ে কেউ তির ছুড়তে সাহস করেনি। লোকজনের চিৎকারে এবং পাথর ছোড়ায় বাঘ শিকারিকে ছেড়ে দিয়ে প্রায় সত্তর-আশি গজ দূরে একটা লম্বা খাদের (ravine) মধ্যে ঢুকেছে। তখন আমি যে হাতিতে চড়ে এসেছিলাম তার মাহুতকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে হাতিটা কখনো শিকারে ব্যবহার হয়নি। এটা হস্তিনী ছিল। পিয়োন যে হাতিতে চড়ে বসে ছিল সেটা ছিল একটা দাঁতাল পুরুষ-হাতি। ভাবলাম, সেইটাতে চড়ে খাদের মধ্যে নামব। সেই হাতিতে চড়তে যাচ্ছি, এমন সময় পিয়োন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এ কাজ করবেন না, এর উপর থেকে আপনি ফায়ার করতে পারবেন না। বাঘ যখন চার্জ (charge) করেছিল তখন এ হাতি এমন করে বনের ভিতর দিয়ে ছুটে পালাল যে আমার মনে হল গাছের ডাল মাথায় লেগে আমার মাথা ভেঙে যাবে এবং আমি হাতি থেকে মাটিতে পড়ে যাব।' সেই হাতির মাহুতও বলল যে, ওই হাতিও শিকারে অভ্যস্ত নয়।

তখন আমি পায়ে হেঁটে রাইফেল নিয়ে সেই খাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকেরা এবং হাতি দুটো আমার পিছনে এল। দেখলাম খাদের ভিতরটা ছোটো ছোটো গুল্মের ঝোপে ভরা, আর সে-ঝোপগুলো খাদের কিনারা পর্যন্ত উঠে এসেছে। খাদের ওই ঝোপের ভিতর নেমে আহত বাঘকে খুঁজতে যাওয়া বড়ো বেশি দুঃসাহসের কাজ। একটু ভেবে নিয়ে আমি জনকয়েক লোককে খাদের ধারের বড়ো বড়ো গোটাকয়েক গাছের উপর উঠিয়ে দিয়ে, তাদের ভালো করে দেখতে বললাম, বাঘ কারো নজরে পড়ে কি না। অল্প সময় পরে তাদের একজন বলল, 'আমি বাঘের পিছনের পা আর লেজ দেখতে পাচ্ছি, লেজটা মাঝে মাঝে নড়ছে।' তখন অন্য লোকদের খাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, আমি খাদের একেবারে ধারে একটা বড়ো গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আর গাছের উপরের লোককে বাঘের লুকোবার স্থানটা যতটা সম্ভব নির্দেশ করে দিতে বললাম। সে হাত দিয়ে দেখিয়ে আর মুখে বলে ওই স্থানটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। আমি

BanglaBook.org

সেই জায়গাটা লক্ষ করে উপর্যুপরি কয়েকটা ফায়ার করলাম। খাদের ভিতর থেকে বাঘ গর্জন করে উঠল, বুঝতে পারলাম এইবার খাদ থেকে বেরিয়ে পড়বে। আমি গাছটার পিছনে দাঁড়িয়ে রাইফেল ঠিক করে ধরে দু-ধারে দেখতে লাগলাম কোথায় বাঘ খাদ ছেড়ে উঠে আসে। অতি অল্পক্ষণ পরেই গাছের উপরের লোকেরা গোলমাল করে উঠল : 'গেল, গেল, পালাল!' আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম লোকেরা হাত দিয়ে খানিক দূরে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে বুঝলাম যে, বাঘ খাদের কিনারার উপরে না উঠে কিনারার নীচে নীচে অনেকটা পথ দৌড়ে, তারপর উপরে এসে একটা ঝোপ পার হয়ে পাশে আর একটা খাদে গিয়ে ঢুকছে। একটা ফায়ার করলাম, সেটা লাগল বলে মনে হল না।

তখন আমি বড়ো মুশকিলে পড়েছি বলে মনে হল। আহত বাঘটাকে ওই অবস্থায় ছেড়ে আসা অসম্ভব। সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা হবে। ইত্যবসরে গাছের লোকগুলি নেমে আসল এবং হাতি দুটোও আমার কাছে এসে দাঁড়াল। এই সময় একজন সাঁওতাল আমাকে বলল, 'হুজুর, তুই একটা হাতি এগিয়ে দিয়ে তার পাশে পাশে যা না কেন? বাঘ যখন হাতিকে তাড়া করবে তখন তুই গুলি করবি।' আমি তখন বললাম, 'বাঃ, এই ঠিক বলেছে; খুবই ভালো প্রস্তাব।' আমি একজন মাহুতকে আদেশ দিলাম, হাতি নিয়ে যেখানে বাঘ খাদে নেমেছে সেইখানে খাদে ঢুকতে। মাহুত তাই করল, আর আমি হাতির পাশে পাশে গিয়ে খাদের কিনারায় দাঁড়ালাম। হাতি খাদে নামামাত্রই বাঘ মহা গর্জন করে হাতিকে চার্জ করল, আর হাতি শুঁড় তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে খাদ থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ুল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, অন্য সময়ে দেখলে হাসি পাবার কথা। অত বড়ো জানোয়ারটা—পিছনের পা দিয়ে মাঝে মাঝে লাথি ছুড়তে ছুড়তে ভয়ে দৌড়োচ্ছে, আর তার পিছনে তার চেয়ে ছোটো জানোয়ার তাকে তাড়া করছে। দেখতে দেখতে হাতি এক ধারে বেরিয়ে গেল, আর রঙ্গভূমিতে রয়ে গেলাম বাঘ আর আমি। আমাকে দেখেই বাঘ ফিরে দাঁড়িয়ে, বিড়াল শিকারের উপর লাফ দেওয়ার ঠিক আগে যেমন করে মাটিতে পেট দিয়ে শরীরটাকে গুটিয়ে বসে যায়, ঠিক সেইরকম করে বসল। আমার তখনকার সম্পূর্ণ একাগ্র দৃষ্টির উপর মুহূর্তের মধ্যে বাঘের যে চেহারা ফুটে উঠেছিল, সেটার ছাপ আমার স্মৃতিতে চিরকালের মতো মুদ্রিত রয়ে গেছে। তখন তার ঠোঁট গেছে গুটিয়ে, তীক্ষ্ণ বড়ো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, কান দুটো পিছন দিকে চেপটা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপটে গেছে, লেজটা চাবুকের মতো এপাশ ওপাশ করে দুলছে, চোখ দুটো ভীষণ হিংস্রভাবে উঠেছে জ্বলে। আমার কাছ থেকে পঁচিশ ফুট আন্দাজ দূরে তখন সে, একেবারে সামনাসামনি; লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ওই দেখেই আমি তৎক্ষণাৎ এক হাঁটু মাটিতে রেখে বসে গিয়েই বাঘের দুই চোখের মাঝখানে লক্ষ করে নিমিষের মধ্যে ফায়ার করলাম। বাঘ আর উঠল না, ঠিক সেই অবস্থাতেই মারা গেল। কেবল তার সমস্ত শরীরটার ভিতর দিয়ে দিয়ে একটা শিহরন চলে গেল, চোখের আগুন নিবে এল, মুখটা নেমে পড়ে মাটিতে ঠেকল, আর লেজটা একবার আস্ফালন করে উঁচু হয়ে উঠে তারপর মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে রইল। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে সেদিন আমার জীবন সংশয় হত তার

BanglaBook.org

আর সন্দেহ নাই।

তারপর বাঘের কাছে গিয়ে দেখলাম রাইফেলের গুলি তার মাথাটাকে একটা কুড়ুলের ঘা দিয়ে কেটে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি করে দু-ফাঁক করে দিয়ে চলে গেছে, আর তার সঙ্গে মস্তিষ্কের খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। দেখলাম, পূর্বদিনের গুলিটা বাঘের পেটের একপাশে ঢুকে মেরুদণ্ড স্পর্শ না করে কোমরের নীচে একপাশ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পে এসে মেপে দেখেছিলাম বাঘটা লম্বায় সাড়ে সাত ফুট ছিল। আমি যতগুলি প্যান্থার মেরেছি তার মধ্যে এইটাই সবচেয়ে বড়ো। সেবারকার অভিযানে আমারই অদৃষ্টে কেবল এই বাঘ জুটেছিল, অপর শিকারি কেউ কিছু পাননি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মাচা থেকে চিতা ও অন্যান্য

সুধাংশুকান্ত আচার্য

এবার মাচা থেকে যে একটিমাত্র চিতা শিকার করেছি সেই কথাই বলব। আমাদের বাগানে অ্যাসিসস্ট্যান্ট ম্যানেজার মি. সহেরিয়ার বাড়ির ভিতরের উঠোনে বসে তাস খেলছি। বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে এমন সময় তার গোয়াল ঘরে— আমরা যেখানে

বসে খেলছিলাম তার ঠিক পিছনেই একটা হুটোপুটির শব্দে ফিরে দেখি একটা চিতাবাঘ বেড়া ভেঙে গোয়াল ঘরে ঢুকে একটা ছাগল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে চেঁচামেচি করায় ছাগল ফেলে দিয়ে চিতাবাঘ পালিয়ে গেল। তার পরের দিনও ঠিক ওই সময়ে আবার একটা হাঁস ধরে নিয়ে গেল। এর পরের দিনও আমাদের বাগানের একটা কুলি তার চৌকির নীচে বাঁধা পাঁঠার ডাক শুনে দেখে একটা চিতা সেটাকে ধরে টানছে, তখন সেও পাঁঠার দড়ি টানতে এবং চিৎকার করতে থাকে। চিতা পালিয়ে গেল কিন্তু টানাহেঁচড়ায় পাঁঠাটা মারা গেল। চিতার দৌরাত্ম্য প্রাত্যহিক ঘটনায় দাঁড়াল দেখে আমাদের বাগানের জমাদারের ছেলে পদকে তখনই একটা মাচা বাঁধতে বললাম। আমার মাচার বিশেষত্ব— বেশ বড়ো এবং মজবুত হওয়া চাই— মশারি খাটিয়ে শোবার মতো। তার উপর বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে রাইফেল নিয়ে বেশ আমি ঘুম দি। টর্চধারী প্রহরী যে থাকে তার কাজ জেগে থাকা এবং জানোয়ার এলে আমায় জাগিয়ে দেওয়া। উঠে চোখমুখ ভালো করে রগড়ে রাইফেল নিয়ে টিপ করা পর্যন্ত জানোয়ার যদি থাকে তবে মারা পড়ে নইলে সে যায় পালিয়ে, আর আমি পড়ি ঘুমিয়ে। একথা হয়তো কেউ বিশ্বাস করবেন, হয়তো কেউ করবেন না, কিন্তু কথাটা সত্যি।

মি. সহেরিয়ার গোয়ালের পিছনেই মাচা বেঁধে পদ পাহারায় রইল। যদি জানোয়ার আসে খবর দেবে। রাত প্রায় বারোটা বাজে— কোনো খবর না পেয়ে শুয়ে পড়ব ভাবছি এমন সময় পর পর বন্দুকের দুটো আওয়াজ হল। পদ নিশ্চয়ই বাঘ মেরেছে মনে করে আমি, পরেশবাবু আর সন্তোষ

খোঁজ নিতে মাচার কাছে গেলাম। পদকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে— চিতার ওপর দুটো গুলি করেছে, তবে একটাও লাগেনি। আমরা মাচায় উঠে বসলাম। দুটো আওয়াজ করা হয়েছে— এরপর আর চিতাটার ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই মনে করে আমরা বেশ আড্ডা জমিয়ে বসলাম। গল্পগুজব, হাসি তামাশা এমনকী গানও চলছে— হঠাৎ পদ আমাকে বললে— 'বাঘ এসেছে।' দেখি আমাদের এতগুলো লোকের উপস্থিতি ও কোলাহল অগ্রাহ্য করে চিতাটা মাচার নীচে বসে ওপরের দিকে চেয়ে রয়েছে। পদ টর্চ ধরতেই গুলি করলাম। চিতাটা একটা লাফ মেরে উলটে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি রাইফেল-এ আর একটা গুলি তখনই ভরে নিলাম কিন্তু বিপদ হল সন্তোষ আর পদকে নিয়ে। সন্তোষ বলে সে টর্চ ধরবে— পদ বলে, না— সে বার বার টর্চ ধরে আসছে, তার অধিকার সে ছাড়বে না। দুজনে দুজনের টর্চ নিয়ে কাড়াকাড়ি, শেষটায় বাঘের গায়ে না ধরে আমার মুখের ওপর ধরে বসে রইল। আমি রাগ করে উঠতেই দুজনেই চিতা যেদিকে পড়ে গড়াগড়ি করছিল সেইদিকে টর্চ ফেলল। কিন্তু এর মধ্যেই চিতা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাত তখন প্রায় দুটো; এখন মাচা থেকে নেমে খোঁজ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কাজেই তাদের খানিকটা গালাগালি করে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে সন্তোষ উঠে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলল। তাকে বাগানে পাঠালাম— কয়েকজন কুলি ডেকে আনবে, আর আমার ঘোড়াটা পাঠাবে।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। কুলিরা এসে পড়ল কিন্তু সন্তোষের দেখা নেই, ঘোড়াও পাঠায়নি। যা হোক, আমরা সবাই মিলে বাঘের খোঁজে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা যেতেই বাঘটা আমাদের সাড়া পেয়ে গোঙাতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না— শুধু ডাক শুনে গুলি করা চলে না। কাছে এমন একটা বড়ো গাছ নেই যে উঠে দেখব বাঘটা কোন জায়গায় আছে। পরেশবাবুকে বললাম, 'আপনি আমার কাঁধে উঠুন, আমি এগিয়ে যাই। বাঘ কোথায় আছে হয়তো আমার কাঁধের উপর থেকে দেখতে পাবেন।' পরেশবাবুকে কাঁধে নিয়ে খানিকটা যেতেই চিতাটা আমাদের দেখতে পেয়ে গোঙানো শুরু করতেই পিছনে হটে এলাম। চিতাটা কিন্তু তার জায়গা ছেড়ে বেশিদূর আসছে না। এখন কী করা যায়? পরেশবাবুর কথামতো দু-খানা বড়ো বাঁশ এনে দুজন কুলি দিয়ে সামনের খেত দু-ভাগ করে দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম, এমনি করে খানিকটা যেতেই এবার চিতাটাকে পরিষ্কার দেখা যাওয়ায় আমি গুলি করলাম। চিতাটা উলটে পড়ে গেল। তখন ঘোড়া এসে পড়ায় আমি ঘোড়ায় চড়ে মরা চিতাটার কাছে যেতেই দুটো চিতার বাচ্চা দেখতে পেলাম। সবাই মিলে সে-জায়গাটা ঘিরে অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চা দুটোকে ধরতে পারলাম না— ঘন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। চিতাটা জঙ্গল থেকে বের করে মাপ নিলাম প্রায় ৬′—৪″ হবে। রাত্রে যে গুলি করেছিলাম সেটা পিঠে লেগে মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ায় চার্জ করে বেশি দূর আসতে পারছিল না। লোকের কাছে শুনেছি বাঘের দুধ আগুনে পোড়ে না—হাওয়া লাগলেই জমে যায়। পরীক্ষা করে দেখলাম একথা সত্যি।

BanglaBook.org

মঙ্গলদই থেকে ফেরার পথে চিতা

এর কয়েকদিন পর Mr. J. Fetters, Mr. Macleod এবং Mr. L. R. Patel স্বর্গীয় V. J. Patel-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এরা সবাই র লোক, আমাদের বাগানে এলেন। আমরা কীভাবে ট্রাকটর দিয়ে চাষ আবাদ করছি দেখবার জন্যে আর ট্রাকটর চলছে কি না এবং কোনো দোষ ত্রুটি থেকে থাকলে সেগুলো ঠিক করে দেবেন বলে।

শিকার ছাড়া অন্য কোনো sports না থাকায় বাগানের কর্মচারী এবং আমরা মিলে ফুটবল খেলা আরম্ভ করেছিলাম। তারই ফলে কাছাকাছি অন্য বাগানে আমরা খেলতে

যেতাম এবং তাঁদেরও আমন্ত্রণ করতাম।

আমাদের বাংলো থেকে প্রায় ১০।১১ মাইল দূর মঙ্গলদইতে সেদিন আমাদের খেলতে যাবার কথা। Mr. Macleod-ও আমাদের হয়ে খেলতে চলেছেন।

কোথাও গেলেই সঙ্গে একটা রাইফেল বা বন্দুক রাখতাম। খেলে ফেরবার পথে দেখি পথের ধারে কতগুলো বস্তির লোক মিলে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান-বাজনা করছে, সঙ্গেসঙ্গে পানপাত্রও হাতফিরি হচ্ছে। একটু দূরে এদের দিকে পিছন ফিরে একটা বড়ো চিতা সামনের মাঠে চরে বেড়ানো একটা গোরু লক্ষ করছে। সে তার শিকার নিয়ে এতই ব্যস্ত যে এতগুলো লোকের গান-বাজনা ও মত্ততার কোলাহল এবং আমাদের মোটরের ঘড়ঘড়ানির শব্দেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই, শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে, শুধু ন্যাজের ডগাটা একটু নড়ছে। গাড়ি থেকে আমি আর Macleod নেমে চিতার পিছন দিকে প্রায় ২৫।৩০ হাত দূরে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছি যে কোনখানে গুলি করা যায়, কারণ চিতাটা মাথা নীচু করে সামনের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে পিছনদিকটা উঁচু করে এমনভাবে আছে যে তার ঘাড় ভালো করে দেখা যায় না। পাশের দিকে যেতেও ভরসা হয় না, সামনে যাওয়াও অসম্ভব। পিছনের দিকটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, লাফ দেবার পূর্ব লক্ষণ দেখে আর দেরি না করে গুলি করলাম। কোনো শব্দ না করে চিতাটা শুয়ে পড়ল। আমি আবার গুলি করব, কিন্তু Macleod বললে, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি এর নাড়িটা পরীক্ষা করে দেখি মরে গেছে কি না।' সে এক হাসির ব্যাপার। সাহেব খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বাঘের পিছনের পায়ে হাত দিয়েই চট করে সরিয়ে নিল। তারপর আবার হাত দিয়ে বললে যে না একদম শেষ হয়ে গেছে, নাড়ির স্পন্দন নেই। আমার গুলিটা সোজা হার্ট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় প্রায় গুলির সঙ্গেসঙ্গেই চিতাটা মারা গেছে, নইলে নাড়ি দেখার ফলে হয়তো সাহেবকেই হাসপাতালে পাঠাতে হত। বন্দুকের শব্দ পেয়েই গানবাজনারত লোকগুলো ছুটে এল, তাদের এত কাছেই এত বড়ো একটা চিতা ছিল তারা জানতেই পারেনি। আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তারা চিতাটা গাড়িতে উঠিয়ে দিল। মাপ নিয়ে দেখলাম ৮′-৬″। এখন অবধি এইটিই আমার সবচেয়ে বড়ো চিতা।

ট্রাকটর থেকে চিতা

সাধারণ লাঙল আর কলের লাঙল দিয়ে চাষের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। সাধারণ লাঙল দিয়ে চাষ করতে হলে জমি পরিষ্কার করে নিতে হয়, কিন্তু কলের লাঙল দিয়ে চাষ করতে হলে ছন, ইকরা বা তারাবন জাতীয় জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না বরং কল চালানোর ফলে এগুলো এমন অদ্ভুতভাবে উল্টে মাটি চাপা পড়ে যে সারের কাজ করে— কেবল বড়ো গাছ যদি জমিতে থাকে তবে সেগুলো কাটতে হয়। কলের লাঙল দিয়ে অল্প সময়ে এত বেশি পরিমাণ জমি ভালোভাবে চাষ করা চলে যে সাধারণ লাঙলের সঙ্গে তুলনাই হয় না। কিন্তু একটা অসুবিধা এই যে অল্প জমি কলের লাঙল

BanglaBook.org

দিয়ে চাষ করা চলে না। খুব বড়ো প্লট হলে, কলের লাঙল দিয়ে প্রথমে বাইরে থেকে বৃত্তাকারে চাষ আরম্ভ করে পরে চৌকোভাবে ভিতরের দিকে চাষ করা হয় এবং সবশেষে কোনাকুনি চাষ দিয়ে শেষ করা হয়। জমি চাষ করা আরম্ভ হলেই এইসব ছন, ইকরা ও তারাবন থেকে মুরগি, তিতির প্রভৃতি পাখি বের হতে থাকে, পরে হরিণ, শুয়োর জাতীয় জানোয়ার এবং সব শেষে চিতা কিম্বা বাঘ বের হয়। এজন্য আমি যেদিন ট্রাকটর চালাতাম, সঙ্গে একটা রাইফেল এবং বন্দুক রাখতাম।

আমি কেমন ট্রাকটর চালাতে পারি, দেখতে চাওয়ায় Mr. Fetters-কে আমার পাশে বসিয়ে একদিন সকালে ট্রাকটর দিয়ে চাষ আরম্ভ করলাম। অভ্যাস মতো আমার .২৫০/৩০০০ রাইফেল সঙ্গেই ছিল। আমার সৌভাগ্যবশত সেদিন একটা চিতা বের হওয়ায় সেটাকে গুলি করে মারি। Mr. Fetters ট্রাকটরের bonnet-এর উপর চিতাটা রেখে আমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে তাঁর camera দিয়ে একটা snap নিলেন। তাঁদের বিজ্ঞাপনের বই 'The dotted line'-এ ছবি দিয়ে চিতা শিকারের বেশ দু-লাইন লিখে তাঁর ট্রাকটরের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন। এর একখানি কপি আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

পরপর কয়েকটা চিতা শিকারের যে কথাগুলো লিখলাম হয়তো অনেকে এগুলো শুধু গল্প বলেই মনে করবেন আবার অনেকে মনে করবেন শিকার করা খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু সত্যি বলতে দুটোর একটাও নয়। শিকারজীবনে কোনো কোনো সময়ে এ-রকম দু-চারটে শিকার খুব সহজলভ্য হলেও বাস্তবিকপক্ষে তা নয়। পাকা শিকারি যাঁরা, তাঁরা আমার একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

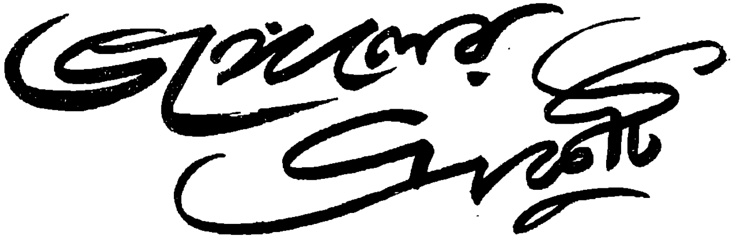

আরণ্যক

ইংরাজ লেখক H. M. Tomlinson-এর একটি সুন্দর অরণ্য-বর্ণনা পড়েছিলাম। গভীর বনের ভিতর শিকারির অগ্নিকুণ্ড যখন শেষরাত্রে নিব নিব হয়ে এসেছে, অদূরে বাঘের গুরুগর্জন শোনা গেল; শিকারি ত্বরিতে শয়ন ছেড়ে কাঠের গুঁড়ি ঠেলে আগুনটাকে ভালো করে উসকিয়ে তুললেন ও রাইফেল হাতে নিয়ে স্তব্ধ অন্ধকারে বন-কাঁপানো গম্ভীর গর্জন বসে বসে শুনতে লাগলেন। লেখক বলছেন, ঘন জঙ্গলে মাটিতে বসে কাছ থেকে ওই চাঞ্চল্যকর গর্জন শোনা এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। এমন লোক নেই যে, ক্ষণিকের জন্যও মনে ভয়ের শীতল স্পর্শ ওই সময় অনুভব না করে।

আর একজন বিখ্যাত শিকারি বলেছিলেন, সঙ্গিন-মুহূর্তে ভয়ের আবির্ভাব অসমসাহসী শিকারিও অবশ্যই অনুভব করে, কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার তফাত এই যে, সে ভয়কে আমল দেয় না। ওটা তার কাছে অবান্তর মনোবিকার মাত্র, যা অগ্রাহ্য না করলে তার প্রাণের আশঙ্কা ষোলো আনা।

বনেজঙ্গলে যারা শিকারের পিছনে ঘুরেছে, তাদের অনেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে হঠাৎ বিপদের সামনাসামনি হয়েছে। কেউ প্রাণ বাঁচাতে পারেনি, কেউ জখম হয়ে ছাড়া পেয়েছে, আবার কেউ-বা বিনা আঁচড়ে ফিরে এসেছে। যারা বেঁচেছে তারা কোনোদিন নিজেদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারে না। বহুদিন পরেও অতীত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঘটনা তাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ভাসে। তাদের মধ্যে যারা শান্ত সুবোধ নয়, তারা ভয়ের নিষ্ঠুর কামড় খেয়েও জীবন-মরণের জুয়া খেলতে আবার জঙ্গলের ছক পেতে বসে। বিপদের নেশাই বোধ হয় সব নেশার সেরা, হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় তাই এত ভিড়।

বাঘের গর্জনের কথা বলছিলাম এইজন্য যে ওটাকে উপলক্ষ করে মর্মান্তিক ভয়ের শাসনে আমিও আসামি হয়েছি। ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনে দিশেহারা হয়ে পড়তাম। বয়সের সঙ্গে ভয়টা না বেড়ে কমেই গেছে; কিন্তু এখনও বাঘের গর্জনকে সমীহ করি, যদি চোখের আড়ালে বাঘ থাকে আর আমরা দুজনেই এক মাটির উপর অবস্থান করি।

প্রথমে চিতাবাঘ সম্পর্কে একটা ঘটনা বলি। অনেকদিন আগে আমাদের গ্রামে বেশ বড়ো একটা চিতাবাঘ এসে উৎপাত আরম্ভ করে।

তার অভ্যাস ছিল— সন্ধ্যার পর থেকে কিছুক্ষণ ডেকে বেড়াত। বোধ হয় সঙ্গিনীর অনুসন্ধানে এ-রকম করত। আমাদের বাড়ির পিছনে কাঁটাঝোপে ভরতি একটা জঙ্গলে তার আড্ডা ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে ডাকতে ডাকতে সে আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা বটগাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আসত, তারপর অল্পক্ষণ হাঁকডাক শুনিয়ে আবার পথ ধরে জেলাবোর্ডের রাস্তায় উঠে শিকারের জোগাড়ে বেরোত। বাঘটা অসাধারণ ধূর্ত ছিল বলে তাকে মারবার চেষ্টা সফল হয়নি। আমরা তার দরাজ গলা শুনেই খুশি থাকতাম। একদিন রাত্রে আমাদের পাশের গ্রামের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বেড়াতে এসেছেন, আমরা সকলে দোতলার বারান্দায় গল্পগুজব করছি, এমন সময় বাঘটা পশ্চিম দিকে ডেকে উঠল। আমার ছোটো দাদা খুব সাহসী এবং ভালো শিকারি, তিনি রহস্যচ্ছলে উক্ত বন্ধুদের দলের একটি ভীতু ছেলেকে বললেন, সে ওই বাঘের চলাফেরার রাস্তায় ঘুরে আসতে সাহস করে কি না? ছেলেটির মুখে কথা নেই। তার দাদা আরও ভীতু ও কুটিল প্রকৃতির লোক। তিনি ভাবলেন, তাঁদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই বুঝি ছোটোদাদা এ-রকম প্রস্তাব করলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য একটু গরম ভাবেই তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি ওখানে ঘুরে আসতে পার?' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ, পারি।' তিনি বললেন, 'যাও দেখি, তোমার কত সাহস এবার বুঝব।' ছোটোদাদা বললেন, 'ও যেতে চেয়েছে তাই যথেষ্ট, যাওয়া না যাওয়া আসল কথা নয়।' কিন্তু ওই ভদ্রলোক শাইলকের মতো নাছোড়বান্দা, পালটা নেবেনই। ছোটোদাদা উভয়সংকটে পড়েছেন তখন, তিনি জানেন শিকারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, আমি গাছেও চড়তে পারি না, ওদিকে অপরকে যখন তিনি যাবার কথা বলেছেন আমাকেই-বা কী করে বাধা দেন? আমি যখন বেরোচ্ছি, শাইলক বললেন, সঙ্গে বন্দুক বা টর্চ নেওয়া চলবে না। এতে তাঁর স্বগ্রামবাসীরা পর্যন্ত চটে ওঠায় ও শর্ত আর টিকল না। পশ্চিমে আমবাগানের ভিতর দিয়ে আমি গ্রামের দিকে রওনা হলাম, তখনও বাঘটা ডেকে চলেছে। এগিয়ে আমাদের বাড়ির রাস্তা আর গ্রামের রাস্তার মোড়ে বাঁ-দিক ঘুরে বটগাছের কাছে যখন যাচ্ছি তখন ডাক থেমে গেল। অমনি আমার ভয়ও বাড়তে লাগল। বাঘটা বটগাছের নীচ থেকে শেষবার ডেকেছিল, কিন্তু তারপর যে কোথায় আছে তার নির্দেশ নেই। রাস্তার দু-পাশে ঘন ঝোপঝাড়, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে, মনে হচ্ছে বাঘটা ঝোপের আড়ালে আমার পাশে পাশে চলেছে। চারদিকের অন্ধকার যেন টর্চের একমুখী আলোকে গিলে খেতে আসছে। আমি কলের মতো পা চালিয়ে বটগাছের তলায় পৌঁছোলাম, মনে হল টর্চটা চারিদিকে ঘুরিয়ে একবার দেখে নিই, কিন্তু তা পারলাম না। ঠিক দম দেওয়া পুতুলের মতো আমার অবস্থা, একভাবে পা ফেলছি; দাঁড়াতে পারি না, তাড়াতাড়ি হাঁটতেও পারি না। বটগাছ পার হয়ে আমাদের বাড়ি ফিরবার কথা। জেলাবোর্ডের রাস্তায় না ফিরে পাটখেতের ভিতর দিয়ে শর্টকাট ঠিক করলাম, কারণ উৎকণ্ঠা আর সহ্য হচ্ছিল না। পাটখেতের মধ্যে নেমে অবস্থা আরও খারাপ হল; মাথা-সমান উঁচু পাটগাছ ঠেলে ঠেলে যাচ্ছি আর বরফের মতো ঠান্ডা ধারালো ছুরির ডগা যেন আমার শিরদাঁড়ার উপর থেকে নীচে দাগা বুলিয়ে যাচ্ছে। সেটা চিতাবাঘের নখের তুলনায় বোধ হয় কম

BanglaBook.org

পীড়াদায়ক নয়। ভাবছি মরবার জন্যই বেকুবের মতো এই পাটখেতের মধ্যে পা বাড়ালাম। ভগবানের করুণা ছাড়া সব জিনিসেরই সীমা আছে। তেপান্তরজোড়া পাটখেতেরও। বাড়ির সামনে বাগানে যখন পৌঁছোলাম, বটতলা থেকে আবার পরিচিত ডাক শুরু হল। বাঘটা গুঁড়ি মেরে ওখানেই ছিল। আমি তার পাশ দিয়ে আসবার সময় সে যে আমার উপর কড়া নজর রেখেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অভিজ্ঞতা কখনো ভুলব না। কিন্তু সত্যিই আমার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না, যেহেতু চিতাটা মানুষখেকো নয়। তবে সে-বয়সে বন্য জানোয়ারের মনস্তত্ত্বে আমার পণ্ডিত হবার কথা নয় এবং আক্রান্ত হলে আমার বন্দুক টর্চ খুব কাজে আসত না।

আর একবার ডোরাদার বাঘের গর্জনের সূত্র অনুসরণ করতে গিয়ে উৎকট আতঙ্ক ভোগ করেছিলাম। সেবার শীতকালে আমি ভুটানের সীমানায় পাহাড়ের নীচে ক্যাম্প করেছিলাম। একটা পাহাড়ি নদী যেখানে সমতলভূমিতে পড়ে চওড়া হয়েছে, তারই ধারে আমার ঘাঁটি ছিল। চারপাশে বিশাল জঙ্গল-এলাকা, জানোয়ারও বেশ আছে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে কোনো বড়ো শিকার জুটছিল না। অথচ প্রায়ই বনের মধ্যে বাঘের চলাফেরার চিহ্ন পেতাম, সম্বরের ঘোড়ার মতো বড়ো পাঞ্জা দেখে তার শিং-এর মাপ অনুমান করতে চেষ্টা করতাম, আর মাঝে মাঝে জংলি মুরগি, বার্কিং ডিয়ার মেরে আশ মিটাতাম। কয়েকটা মড়ি পেয়েছিলাম, কিন্তু বাঘ আসেনি। বাঘের টোপ হিসাবে যে মোষ বাঁধা হত, পাশ দিয়ে গেলেও বাঘ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করত না। আমার রুটিন ছিল রোজ ভোরবেলা ও বিকালের পর জঙ্গলের এক-একটা অংশ ভালো করে খুঁজে দেখা। সরকারি বাংলোর চৌকিদার, অধীর নামে এক ছোকরা, অনেক সময় শিকার-অনুসন্ধানে আমার সঙ্গ নিত। সে খুব উৎসাহী, সাহসী আর চটপটে ছিল এবং ওখানকার জঙ্গল ও জানোয়ার সম্বন্ধে তার মোটামুটি মন্দ জ্ঞান ছিল না। উত্তর দিকের দুর্গম পাহাড়ি জঙ্গল বাদে আর সব জায়গাই আমার দেখা হয়েছিল। প্রায় ছয় সপ্তাহ আমার এইভাবে কাটল। ফিরবার সময় যত এগিয়ে আসছে, আমিও তত নিরাশ হয়ে পড়ছি। একদিন অধীর বলল, ভালো শিকার তো মিলছে না, মহাকালের পুজো দিয়ে দেখলে হয়; এটা মহাকালের রাজ্য, তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আমার আস্থা না হলেও অধীরের কথায় পূজার জন্য কয়টা টাকা দিলাম, যথাসময়ে গেরুয়াধারী পূজারি প্রসাদ দিয়ে গেল। তার পরেই অধীর খবর আনল, নদীর ডান দিকে আর উপরে পাহাড়ের মাথায় একটা হ্রদ আছে, তার চারদিকে গভীর জঙ্গল; সেইখানে বিরাট সম্বর আছে, সে নিজে পায়ের দাগ দেখে এসেছে। ওখানে বাঘের উৎপাত নেই বলে নাকি সম্বরগুলো ওইদিকে বেশি বিচরণ করে। সেই সময় আমার কাছে মি. হফ নামে এক বন্ধু এসেছিলেন। আমরা এই খবরে আশান্বিত হয়ে পরদিন বেলা দুটো-আড়াইটের সময় জায়গাটা দেখবার জন্য বার হলাম। হফ-এর সঙ্গে তার পাহাড়ি বেয়ারাও চলল। অনেক নালা, জঙ্গল ভেঙে আমরা একটা খাড়া পাহাড়ের তলায় পৌঁছোলাম। অধীর বলল, হ্রদটা ওরই উপরে। ঘন ঘাস ও ছোটো ছোটো আলগা পাথরের উপর দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে আমরা উপরে উঠে দেখলাম পাহাড়ের ওপিঠে অল্প নীচেই ছোটো একটা হ্রদ, পরিষ্কার টলটল করছে জল। তিনভাগ ঘিরে পাহাড়ের

BanglaBook.org

সংকীর্ণ শিরার খাড়া পাড়, আর আমাদের সামনে ওপারে একভাগ হচ্ছে সমান জমি, ওদের সঙ্গে মিশেছে। বড়ো বড়ো গাছের নীচে ঘাসে ঢাকা সব জায়গাটা। গভীর ঘন জঙ্গলের মধ্যে দৃশ্যটা অতি মনোরম। বিলাতের পার্ক বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে তুলনার যোগ্য। সামান্য বিশ্রাম করে আমরা জানোয়ারের হদিশ খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু পাথুরে জমিতে চলাফেরার পথের রেখা ছাড়া বিশেষ কিছু পেলাম না; হ্রদের একেবারে ধারে অল্প জলের নীচে সম্বরের মস্ত পাঞ্জা দেখলাম। তখন সূর্য অস্তায়মান, হ্রদ ঘুরে সমান জমিটায় আর গেলাম না। অন্ধকার হওয়ার আগে পাহাড় থেকে নামবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হফ পরদিন চলে যাবে, তার খুব আগ্রহ সন্ধ্যা অবধি সুযোগের অপেক্ষা করে। অগত্যা রাজি হয়ে আমি জলের ধরে ঘাসের মধ্যে একটা পাথরে বসলাম, অধীর আমার পিছনে বসল। হফ ও তার লোক আমাদের বাঁ-দিকে হ্রদটি ঘুরে, মাঝামাঝি পাড়ের খাড়াই ধরে উপরে উঠে কতগুলো বড়ো গাছের নীচে অদৃশ্য হল। কোথায় জায়গা নিল ঠিক দেখতে পেলাম না। শিস দিয়ে আমরা পরস্পরের অবস্থান আন্দাজ করে নিলাম। অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে এমন সময় জোরে ঝটাপট শব্দ শুনে চমকে দেখি, মাথার উপর ধনেশ পাখির দল গাছে গাছে বসছে। তাদের ডানার ঝাপট যখন থামল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি ফিরবার সমস্যায় একটু অসহিষ্ণু হয়ে হফকে ইশারা করব ভাবছি, অকস্মাৎ পাহাড়ের স্তব্ধতা চুরমার করে উদাত্ত গর্জন জলের উপর দিয়ে এসে যেন ধাক্কা মারল। অধীরের খবর যে এক্ষেত্রে নির্ভুল হয়নি তার জীবন্ত প্রমাণ। আমি অনুমান করতে চেষ্টা করলাম রাজকীয় নির্ঘোষের কর্তা ঠিক কোনখানটিতে রয়েছে। কিন্তু ওপারে সেই সমান জমিটাতে যে রয়েছে তার বেশি বুঝতে পারলাম না। একটু পরে আরও জোরে হাঁক এল। এবার আওয়াজটা বাঁ-দিকে, অর্থাৎ ওপার থেকে এদিকে আসার সরু পথের মুখে। আমার মনে হল প্রচণ্ড গর্জনে মাটি যেন কেঁপে উঠল।

আমি বন্দুকটার সেফটি ক্যাচ তুলে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি; হফ ওদিকেই আছে, একটা সুযোগ নেবেই। একটু পরে আবার সাড়া পেলাম, এবার আরও কাছে এবং স্বর বেশ মৃদু। আওয়াজ করে শেষে হাঁফ ছাড়বার সময় মুখ দিয়ে জোরে নিশ্বাস ফেললে যেরকম শব্দ হয়, সে-রকম শব্দ। কেন বলতে পারি না বিকট হুংকারের চেয়ে মোলায়েম স্বগতোক্তি আমার কানে বেশি বিশ্রী লাগল। অধীর তখন একেবারে আমার পিঠে ঠেসে বসেছে। আমি মনে মনে নানা হিসাব কষছি; প্রথম আমার সঙ্গে টর্চ নেই এবং সাধারণ শটগান, অধীরের সঙ্গে একটা কমজোর টর্চ আছে, তার ব্যাটারি ক্ষীণ। দ্বিতীয়ত, হফ-এর কাছে একটা .৪০৫ উইনচেস্টার ম্যাগাজিন রাইফেল; হফ ওটাকে যতই শক্তিশালী অস্ত্র মনে করুক, আমি মনে করি না। ভুটানের জঙ্গলে রাত্রে বড়ো বাঘের সঙ্গে মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়বার উপযুক্ত অস্ত্র ওটা নয়। .৪০৫-এর সঙ্গে আমি পরিচিত। এক গুলিতে না পড়লে, হফ-এর গুলি খেয়ে বাঘ যদি আমাদের দিকে ছুটে আসে, তাহলে নিশ্চিত মরণ। ওই সঙ্গে হফ-এর রাইফেলের গুলি কোনাকুনি এসে অথবা জলে ঠিকরে আমাদের গায়ে লাগতে পারে কি না তাও একটু মনে হয়েছিল। তৃতীয়ত, হফ যদি মারবার সুবিধে না পায় তবে বাঘটা পথ ধরে সোজা আমাদের দিকে চলে আসবে এবং আচমকা

BanglaBook.org

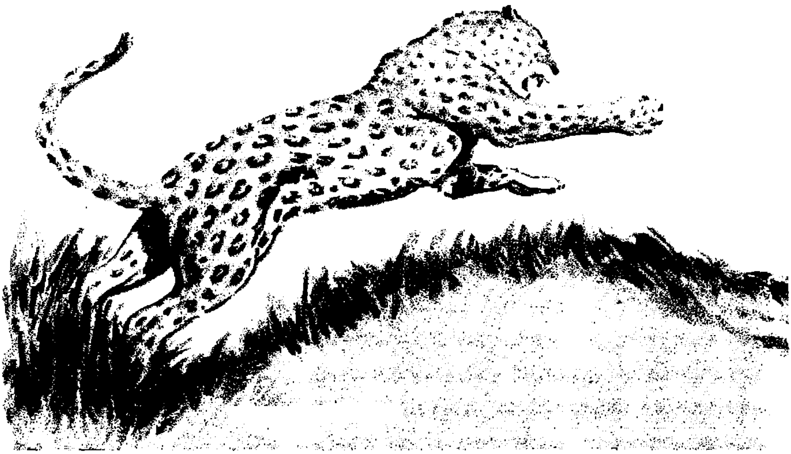

আমাদের দেখতে পেয়ে যদি ভড়কে একটা ঠোনা মারে তাহলেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর শেষ এবং সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সঙ্গে যেই দুই বেচারা এসেছে তাদের নিরাপত্তা। আমি আর হফ না হয় শখ করে প্রাণসংশয় করতে পারি, কিন্তু ওরা আমাদের উপর নির্ভর করে এসেছে, সঙ্গে কুকরি ছাড়া আত্মরক্ষার কিছু নেই। কোনোরকম সংকটে ওদের রক্ষা করার দায় সম্পূর্ণ আমাদেরই। অবশ্য এসব কথা খুব তাড়াতাড়ি আমার মনে খেলে গেল। হফকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আর নয়। আমি নিঃশব্দে বন্দুকে একটা চার নম্বর টোটা পুরে আকাশে ফাঁকা আওয়াজ করলাম। সঙ্গেসঙ্গে নুড়ির ওপর ভারী লাফ-এর শব্দ শুনলাম। বাঘটা উলটো দিকে সমান জমির ওপিঠে পালাল। তারপর হফ-এর মহা ক্ষোভ আর অনুযোগের পালা। আর কয়েক সেকেন্ড পরেই সে নাকি পরম সুযোগ পেত, আমি তার আগেই সব নষ্ট করে দিলাম। ও নিয়ে আর বেশি কথা হল না। অতি কষ্টে পাহাড় থেকে নামলাম, হফ-এর জোরালো টর্চ ছিল তা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরবার পথ একেবারে অচেনা লাগছিল। অধীর বলছিল, একজন পাহাড়ি আছে ওদিককার সব অন্ধিসন্ধি সে জানে, চোরাই শিকারের বদনামও তার আছে। আমরা দশটার পর ক্যাম্পে ফিরেই সে-লোকটাকে ডাকতে পাঠালাম। আমাদের খাওয়াদাওয়ার পর সে এসে পৌঁছোল। চেহারা দেখে বুঝলাম জঙ্গলের পাকা লোক; রোগা কিন্তু পাকানো তারের মতো দেহ কঠিন। হ্রদের ওদিকে আমাদের শিকারে নিয়ে যাবার কথা বলতে সে ঝাড়া অস্বীকার করল। যত টাকাই বকশিশ দেওয়া হোক ওখানে সে একদম যাবে না। ওটা মহাকালের স্থান, ওখানে কোনো জানোয়ার মারলে অশুভ হবে। আর ওই বাঘটা সাদা রং-এর, বহুকাল থেকে ওখানে আছে কেউ মারতে পারে না। এক শিকারি ওকে গুলি করার পরে দুর্ঘটনায় পড়েছিল এবং একটি পাহাড়ি হ্রদের ধারে গাছে রাত কাটানোর ফলে ঘোর পাগল হয়ে গেছে। সে লোকটিকে এখনও সকলে দেখে মাঝে মাঝে, পাহাড়ে

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া ওটা কার এলাকা বলা যায় না, ওইসব পাহাড়ে স্বভাবদুর্বৃত্ত ভুটিয়ারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। তারা দুর্ধর্ষ-প্রকৃতি, ভারত-সরকার, ভুটান-দরবার কাউকেই খাজনা দেয় না। বন্দুক টোটার লোভে আগন্তুককে গোপনে আক্রমণ করবার ঘটনাও ঘটেছে ইত্যাদি। আমাদের ওখানে যেতে বার বার মানা করে পাহাড়ি শিকারি বিদায় নিল। আমরা আলোচনা করলাম, ওর শিকারের ভালো জায়গা নষ্ট হবে বলে এসব গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়ে গেল। হফ যাওয়ার পর আমি ওই কৌতূহল-জাগানো জায়গা সম্বন্ধে খবর নিতে, আরও রহস্যময় ব্যাপার শুনলাম। কয় বছর আগে দূর শহরে এক মাড়োয়ারি যুবক স্বপ্ন পেয়ে আসে, হ্রদের ধারে রাত্রে মহাকালের পুজো দিলে সে গুপ্তধন পাবে। যুবকটি তার সঙ্গের লোককে নীচে রেখে দুপুর বেলা পুজোর উপচার নিয়ে একলা পাহাড়ের উপর চলে যায়। পরদিন তাকে ফিরতে না দেখে তার সঙ্গী লোকজন নিয়ে উপরে উঠে দেখে যুবকটির মৃতদেহ হ্রদের জলে ভাসছে। শরীরে কোনো জখমের চিহ্ন নেই। লাশ নামিয়ে থানায় খবর পাঠানো হয়, তারপর ময়নাতদন্তের জন্য সদরে সেটা চালান যায়। এটা আর বানানো কাহিনি নয়, স্থানীয় অনেকে লাশ দেখেছিল। বিবিধ লোমহর্ষক বৃত্তান্ত যতই শুনছি, ওই নিরীহদর্শন হ্রদের গুপ্তরহস্য ততই আমাকে আকর্ষণ করছে। উপরন্তু শিকারের প্রশস্ত ক্ষেত্র, তা নিজেই পরখ করছি; বিশেষত সাদা বাঘের সুযোগ জীবনে কখনো পাব না। আরও অনেক বিচিত্র কাহিনি শুনলাম, কিন্তু সেসব নিছক রূপকথা বলে এখানে উল্লেখ করছি না। ঠিক করলাম, সঙ্গে কেউ না গেলেও একলাই ওখানে রাত্রে থাকব। রেলওয়ের কোনো বন্ধুর সৌজন্যে ওখানে মাচা করার বন্দোবস্ত সহজ হল। খাওয়ার পর দুপুরে আমার চাকর বাহাদুর, অধীর ও কয়েকজন কুলি নিয়ে আমি রওনা হলাম। এবার হ্রদের ধার ঘুরে সমান জমিটায় গেলাম। জমিটা শক্ত পাথুরে, হাঁটু-সমান ঘাসে ঢাকা। ওদিকে একটা ছোটো টিপির পিছনে বড়ো বড়ো পাথরে ভরতি শুকনো ঝোরা পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে, একপাশে আরও উঁচু বড়ো পাহাড়ের ঢালু এসে এই পাহাড়ের গায়ে মিশেছে, দুটোর মাঝখানের খাঁজ বেয়ে জানোয়ার-চলা পথ, আর সমান জমির উপর দিয়ে হ্রদের জল অবধি ক্ষীণ একটা পথের দাগ। এই তিনটে পথের তেমাথা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সুবিধামতো গাছে মাচা বাঁধতে বলে আমি ঘুরে জায়গাটা দেখতে লাগলাম। চোখে পড়ল শিংসমেত একটা ছোটো বাইসনের মাথা, অনেকদিনের পুরোনো বাঘের মড়ি। এক জায়গায় নরম একটু মাটিতে বাঘের পাঞ্জা দেখলাম, বিরাট তার আকার। এ যে সেই ভীম-গর্জনের মালিকের থাবা তাতে সন্দেহ রইল না। যেমন গলা তেমনই আয়তন। এখানে-সেখানে হাড়ের টুকরো ছড়ানো, গাছে নখের আঁচড়। বেলা চারটের আগেই মাচা হয়ে গেল। ফ্লাস্কে গরম কফি, বিস্কুট ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আমি মাচায় বসলাম, বাহাদুরকে বলে দিলাম, পরদিন সকালে রোদ উঠবার পর দূর থেকে সাড়া দিয়ে যেন আসে।

জায়গাটার প্রাকৃতিক শোভা মুগ্ধ চোখে দেখেছি, নির্জন বনের মধ্যে অজানা পাখির সুমধুর শিস, ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রং-এর পাখির আসা যাওয়া। দূরে সম্বরের শিং

BanglaBook.org

ঠোকাঠুকির আওয়াজ শুনতে পেলাম— ঠিক যেন বাঁশের গায়ে লাঠির ঘা পড়ছে। কতগুলো জংলি মুরগি ফাঁকা জায়গায় চরতে লাগল। একটা মাঝারি গোছের শুয়োর আমার ডান দিকে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কী খুঁজতে লাগল। আমি খুশিমনে অনেক আশা নিয়ে প্রবীণ সাদা বাঘটার রূপ কল্পনা করছি। এই পটভূমিকায় তাকে কী সুন্দর মানাত! আশঙ্কার লেশমাত্র আমার মনে নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা বড়ো চিতাবাঘ দুই পাহাড়ের মাঝের গলিটা দিয়ে আসছে। খানিক দূরে এসে তার কেমন সন্দেহ হল, সন্তর্পণে একটু এগোয় আর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে, লেজটা আস্তে আস্তে ডাইনে-বাঁয়ে দোলায়। দেখলাম তার কড়া নজর আমার মাচার কাছেই কোনো জিনিসের উপর। জিনিসটা অন্য কিছু নয়, সদ্য ছাল-ছাড়ানো গাছের ডালের সাদা একটা টুকরো। মাচা বেঁধে ওরা অসাবধানতাবশত ওখানেই ফেলে রেখেছে। চিতার ভাবভঙ্গি উন্মুখ হয়ে দেখছি আর ভাবছি মুভি ক্যামেরায় কী চমৎকার ছবি উঠত। একটু পরে এমনিই তার দিকে নিশানা করতেই সে বিদ্যুদ্‌বেগে ত্রিশ গজ পিছনে ছুটে গিয়ে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ডালপালা-ঢাকা আমার মাচার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিশ্চল হয়ে রয়েছি। এর আগে সে উপরে লক্ষ করেনি, কিন্তু আমার সামান্য নড়া আড়াল থেকেও তার চোখে পড়েছে। ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না ওখানে ব্যাপারটা কী। সে স্থির করল আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়, ঘুরে পালাল। আমি মাচা থেকে নেমে সাদা ডালের টুকরোটা দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে ফেলে আবার স্বস্থানে ফিরে গেলাম। তখনও দিনের আলো শেষ হয়নি। বিচিত্র ঐশ্বর্যের গোপন রহস্য নিয়ে ধাপে ধাপে হিমালয়ের উদ্ধত শির আকাশ ছুঁয়েছে। হ্রদের জল আয়নার মতো স্থির, আকাশের ক্ষীয়মাণ আলোর ছিটেটুকু বুকে ধরে আছে। জংলি মুরগি জমি ছেড়ে রাত্রের জন্য গাছে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যায়। সমস্ত পরিবেশ একটা অবর্ণনীয় শান্ত গাম্ভীর্যে পূর্ণ। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমিও উৎসুক হয়ে সেদিনকার বুড়ো বাঘের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সামান্য শব্দের জন্য কান খাড়া, সেই সময় ধনেশ পাখিদের ডানার ঝাপট বড়ো বিরক্তজনক লাগছিল। অন্ধকারে হরিণের সাড়া পেলাম, আমার মাচার পিছন দিয়ে একটা সম্বরকে স্বাভাবিক গতিতে যেতে দেখে বুঝলাম মহাকালের সাদা জটাধারী বাঘ (বেশি বয়স হলে ঘাড়ের লোম বেশ বড়ো হয় এবং রং-ও ফিকে হয়) সহজে আমাকে কৃতার্থ করতে আসবে না। সেদিনকার ফাঁকা আওয়াজ তাকে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তারার আলোর তরল অন্ধকারের মধ্যে সাধ্যমতো নজর চালাবার চেষ্টা করছি। চারিদিক ঘিরে সুগভীর স্তব্ধতা, কাছে-পিঠে একটা মানুষও নেই যে আমার কোনো বিপদ হলে সাহায্য না করুক জানবে যে দুর্ঘটনা ঘটল, বা কী ধরনের দুর্ঘটনা। নানারকম আতঙ্কের গল্প শুনে মনে কিছু সন্দেহের ভাবও হয়তো লুকিয়ে ছিল ওই রহস্যময় বনের স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে। দুশ্চিন্তা একটু একটু করে আমার মাথায় জড়ো হতে লাগল। মজার কথা যে, বন্য জীবজন্তুর কোনো ভয় বোধ করিনি, ভূতপ্রেতেরও বড়ো প্রাধান্য দিইনি। সেই পাগলটার চিন্তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

BanglaBook.org

ওই অদ্ভুত পরিবেশে পাগলটার উপস্থিতির চিন্তা অস্বাভাবিক অস্বস্তি আর ভয়

জাগিয়ে তুলল। হঠাৎ সে এসে উপদ্রব আরম্ভ করলে মহা মুশকিলে পড়ব; গুলি চালিয়ে ঠেকানো চলবে না, আর অন্ধকারে নীচে নেমে তার সঙ্গে কুস্তি লড়াবার কল্পনাও বিষম। হয়তো রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়ব, সেই সুযোগে পাগল মাচা আক্রমণ করবে। এইসব উদ্ভট আশঙ্কার সঙ্গে পাহাড়ি দুর্বৃত্তদের সমূলক ভয়ও ঘনীভূত হচ্ছিল। তারা যদি আমাকে সাবাড় করবার সুযোগ খোঁজে, তাহলে সেটা কঠিন হবে না। মনে পড়ল— কবে কোন ফরেস্ট গার্ডের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, কোথায় কোন ফরেস্ট অফিসারকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, এসব পুরোনো কাহিনি। ভাবতে লাগলাম, একলা এখানে আসা গোঁয়ারতুমি হয়েছে। নীচে যেসব বিবরণ শুনে গাঁজাখুরি বলে মনে হয়েছিল, এখন মনে হল সেসব গল্প মহাকালের প্রসাদ সেবনের ফল না-ও হতে পারে। এমন সময় আমার ডান দিকে টিপির নীচে আর্তনাদ শুনে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। অবিকল কচি শিশুর ককানির শব্দ। আমি টর্চ ঘুরিয়ে ভালো করে দেখলাম— কিছুই নেই, শুধু ঘাস। বিষম ধাঁধায় পড়লাম। পাখি রাত্রে ঘাসের মধ্যে ডাকবে কেন? আর কোন জন্তু এ-রকম আওয়াজ করতে পারে? আবার অন্য পাশ থেকে ওই শব্দ, দেখি কিছু নেই। ভয় তখন পুরোপুরি আমার ঘাড় চেপে ধরেছে, মহাকাল তাঁর গোধূলিতে-দেখা দক্ষিণ মুখ উলটো দিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। কোণঠাসা জন্তুর মতো বসে বসে ভাবতে লাগলাম ভূত, মানুষ যাই আসুক সহজে ছেড়ে দেব না। এবং আমার সুবিধা যে আমি মাটি থেকে উপরে রয়েছি, যা হওয়ার এই মাচাতেই ঘটবে। আরও কয়েকবার ওইরকম স্পষ্ট শিশুর ককানির শব্দ শুনলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর হঠাৎ ওই শব্দ হল একটা গাছের উপর থেকে। সেই মুহূর্তে বুঝলাম ওটা আমার অচেনা কোনো রাতচরা পাখি। যেমন ভয় পেয়েছিলাম তেমনই আশ্বস্ত হলাম। তারপর সারারাত বিভিন্ন জীবের সাড়াশব্দ শুনে কাটালাম বটে, কিন্তু মহাকালের বাঘ দেখবার সৌভাগ্য হল না। রাত আন্দাজ বারোটায় আমার তন্দ্রা এসেছিল, আমি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম, শুকনো পাতার ঈষৎ একটা আওয়াজ শুনে বুঝলাম বাঘ বা চিতা এসেছে। অপেক্ষা করলাম, কিন্তু কিছুই এগিয়ে এল না। তখন যতদূর সম্ভব আস্তে ঘুরবার চেষ্টা করবামাত্র ঝপ করে একটা আওয়াজ হল এবং আমিও জানলাম মহাকালের বাঘ আমার গুলিতে মরবে না। তার যেটুকু সন্দেহ ছিল মিটিয়ে নিয়ে কিছুকালের মতো সে চলে গেল। পরদিন সকালে বাহাদুরের সঙ্গে নীচের পাহাড়ি বস্তির অনেক কুতূহলী লোক আমার ঘাড়-মটকানো লাশ দেখতে এসে নিরাশ হল।

প্রথম রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আমার আর ভয় হয়নি। পর পর কয়েক রাত আমি ওখানে ছিলাম। বাঘের পাত্তা পাইনি, কিন্তু এক রাতে সংলগ্ন পাহাড়ের বাঁশবনে গোলমাল শুনে হাতির কথা ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম। মড় মড় বাঁশ ভাঙার আওয়াজ, পাথর গড়ানোর আওয়াজ, সব মিলে মনে হচ্ছিল বুঝি বা হাতির পাল জঙ্গল ভেঙে শেষ করছে। ভোর হওয়ামাত্র ওদিকে গিয়ে বাইসনের নাদি দেখে বুঝলাম বাইসনের পাল বাঁশবনে চরতে এসেছিল। বাইসন যে এত হুটোপাটি করে আমার জানা ছিল না। শিং ঠোকাঠুকির আওয়াজ অনুসরণ করে দূর থেকে সম্বরের লড়াই-এর দৃশ্যও উপভোগ

BanglaBook.org

করেছি। পাহাড় থেকে একেবারে খালি হাতে ফিরিনি। বাঁশবনের ধার ঘেঁষে একটা প্রকাণ্ড দলছুট সম্বর (মদ্দা সম্বর বয়স বেশি হলে দল থেকে সরে যায়) একদিন পেয়েছিলাম। হাওয়া আমার অনুকূল থাকায় নাগাল পাওয়া কঠিন হয়নি। সেটার শিং বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ও গোড়ার বেড় প্রায় দশ ইঞ্চি ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের পক্ষে দৈর্ঘ্য মন্দ নয়, যদিও মধ্য-ভারতে এর চেয়ে অনেক বড়ো শিং পাওয়া যায়। তবে বেড়টা মধ্য-ভারতের তুলনায়ও খুবই ভালো বলা চলে।

ওই সুদৃশ্য স্থানের কুখ্যাতি সম্বন্ধে আমি চাঞ্চল্যকর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি বটে, কিন্তু মনে হয়েছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো লোক যদি রাত্রে নিরস্ত্রভাবে ওখানে একলা পড়ে, তাহলে পাখির অদ্ভুত আওয়াজও তার কাছে এমন বিভীষিকা সৃষ্টি করবে যে মাথা খারাপ হওয়া অসম্ভব নয়।

মাড়োয়ারি যুবকের মৃত্যুর কারণ অবশ্য এ-রকম নির্দোষ কিছু নয়। ও সম্পর্কে রহস্যভেদ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে আমি নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি। সমান জমিটার একদিকে নাবাল জমির একটা চওড়া পটি হ্রদ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ঢালুতে মিশেছে। হ্রদের জল বাড়লে এ পথেই বাড়তি জল উপচে যায়। কাদা জমি বলে এখানে ঘাস জন্মায় না, হরিণের চলাফেরায় পটিটা ক্ষতবিক্ষত। এর মাথায় হ্রদের জলে কতগুলো বড়ো পাথরের চাতাল জেগে আছে। এটাকেই হ্রদের ঘাট বলা যায়। পুজোর উপকরণ নিয়ে যুবকটি এখানেই বসেছিল, সময়টা ছিল বর্ষার শেষ। হিমালয়ের নীচের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে শঙ্খচূড় সাপ (Hamadryad বা Snake-eating Cobra) মোটেই বিরল নয়, এবং এদের মতো ক্রুর হিংস্র প্রকৃতি সর্পকুলে আর কেউ নেই। শোনা যায় এরা জলের কাছে থাকতে ভালোবাসে, কারণ জলখেলা নাকি এদের অভ্যাস। হ্রদে আসতে হলে ওই চওড়া পটিটা সাপের উপযোগী পথ হবে। খুব সম্ভব রাত্রে শঙ্খচূড় সাপ ওইখান দিয়ে এসে যুবকটিকে আক্রমণ করে ও সে বেচারি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরের দিন পুজোর জিনিস পাথরের উপরেই ছিল বলে শোনা যায়। মৃতদেহ দেখেছিল এ-রকম একজন বলল, দেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না, কিন্তু সর্বাঙ্গ কালচে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ওই মুলুকে শঙ্খচূড় মেরেছেন এ-রকম লোকও আমি জানি। দুর্ঘটনার সব তথ্য আমার জানবার উপায় নেই, কিন্তু আমার কৈফিয়ত ভুল নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোলে শান্তশ্রী হ্রদের আকর্ষণ এখনও আমার কাছে প্রবল, কিন্তু প্রথম রাত্রে রাতচরা পাখির ডাক শুনিয়ে যে ভয়ংকর রসিকতা সে করেছিল তা বিলক্ষণ মনে থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মহিষ

অদিতিমোহন রায়

মোটরে করে কলিকাতা থেকে পাড়ি দিয়ে রাঁচি, চক্রধরপুর, বামড়া, সম্বলপুর হয়ে রায়পুর পৌঁছোলাম। রৌদ্রের প্রচণ্ডতায় চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। আমার সঙ্গে যে ড্রাইভার ছিল তার সর্দিগর্মি হয়ে গেল। চুপচাপ কয়দিন বসে থাকবার পর ড্রাইভার হাসপাতাল থেকে ফিরে এল। ঘরিয়ারে মহিষ মারতে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে রওনা হয়েছি। অনর্থক

চারটে দিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, পাঁচদিনের দিন ভোরে মহাসমন্দ নদী পার হয়ে ঘরিয়ার দিকে এগিয়ে চললাম। ঘরিয়ার জায়গাটা মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমানায়। তবে প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার ভিতরই তার অবস্থিতি। ঘরিয়ার রেল স্টেশন পার হবার পর জঙ্গল আরম্ভ। পাতলা জঙ্গল। ঘরিয়ার সেগুন কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ। কোনোদিকেই জলের নামগন্ধ নেই। বিকেলের দিকে ঘরিয়ারে এসে পৌঁছোলাম। গেস্ট হাউস তৈরি ছিল। সন্ধ্যার সময় যুবরাজ এলেন। রাত্রে প্রাসাদে রাজার সঙ্গে খেতে হল। খেতে খেতে রাজাবাহাদুর বললেন, কাল সকালে হাতি তাঁর লোকজন নিয়ে রওনা হবে ও ট্রাকাররা

ভালো দেখে একটা মহিষ খুঁজে বার করবে। শহর থেকে মহিষের জঙ্গল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল। রৌদ্রে হাতির যেতে কষ্ট হবে বলে রাত্রে ও ভোরের দিকে হাতি চলবে।

দ্বিতীয় দিনে ওঁদের T-Model Ford নিয়ে রওনা হলাম। কারণ ও গাড়ি ছাড়া ও রাস্তায় অন্য কোনো মোটর চলবে না। সন্ধ্যার একটু আগে একটা পাহাড়ের তলায় একটা মন্দিরে এসে গাড়ি থামাল। যুবরাজ বললেন, 'এই পাহাড়ে এবং পাহাড়ের তলায় খানিকটা জলার মতো জায়গা আছে। সেখানে "বড়া সিংহা" পাওয়া যায়। পাহাড়ের চারধারে যেগুলি থাকে সেগুলি আকারে ছোটো ও জলার ভিতরকার হরিণগুলি বড়ো। এদের ডাকও ভিন্ন প্রকারের।' বিশ্রামের পর পুনরায় রওনা হলাম। সন্ধ্যার মুখে এসে পড়লাম তাঁবুর ধারে। এমন সুন্দর জায়গা সচরাচর নজরে পড়ে না। সামনে পাহাড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী চলে গিয়েছে। মোটর থেকে নেমেই বললাম, 'নদীটা দেখে আসি।' যুবরাজ হেসে বললেন, 'কাল সকালেই তো ভালো করে দেখতে পাবেন।' কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। অগত্যা সকলে মিলেই রওনা হলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে মহিষের হিংস্রতা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলেন। তাতেও তিনি আশ্বস্ত হতে না পেরে এক বুড়ো শিকারিকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের গাড়িতে। বৃদ্ধ শিকারির হাতে একটা ৪২৩ মাউসার। এর দ্বারা কতটুকু উপকার হতে পারে বুঝলাম না।

নদীর ধারে পৌঁছে দেখি অসংখ্য পায়ের দাগ। জলের ধারে একটা মহিষের বাচ্চা, বোধ হয় তিন-চার মাস বয়স হবে। কাছে গিয়ে দেখি তখনও বেঁচে আছে। গলায় গভীর ক্ষত-দাগ। বুঝতে পারলাম বাঘে ধরেছিল। কিন্তু মহিষের দল থাকার জন্য বাঘ শিকার ছেড়ে পালিয়ে গেছে। দলের সঙ্গে অতি কষ্টে এসেছিল জল খেতে। একে এই অবস্থায় রেখে গেলে রাত্রে বাঘ হয়তো আসতে পারে, এবং কোথাও নিয়ে খেতে বসলে মড়ির গন্ধে মহিষের দল জল খেতে নাও আসতে পারে। সুতরাং গলা পর্যন্ত বালু দিয়ে চাপা দিলাম। হয়তো অপেক্ষা করলে বাঘ পাওয়া যেত, কিন্তু আমি বাঘ মারতে আসিনি।

তাঁবুতে ফিরে এসে পরের দিন সকালের কাজ কীভাবে আরম্ভ করা যায় সে-বিষয়ে পরামর্শ শুরু করলাম। ট্রাকার হিসাবে কাকে নেওয়া যায় এবং কে কোনদিকে যাবে এবং কোন জায়গায় এসে খবর দেবে প্রভৃতি ঠিক করা হল। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। কারণ উত্তেজনা এত বেশি হয়েছিল যে শুয়ে শুয়ে ওই একই কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভোরের দিকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ একটি আহ্বানে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি তাঁবুর ভিতর আলো জ্বলছে। বাইরে মিশকালো অন্ধকার। রাজবাড়ির চাকর চায়ের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চা খেতে খেতে দেখি যুবরাজ এসে হাজির। যুবরাজ বললেন, 'রায়, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমাদের একটু দেরিই হয়ে গেছে।' বললাম, 'সে কী কথা, এখনও তো মুরগিই ডাকেনি।'

যুবরাজ বললেন, 'মুরগি ডাকার আগেই নদীর ধারে যেতে চাই, হয়তো মহিষের দল এখনও নদীর ধারেই আছে।' লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম মহিষের নাম শুনে।

নদীর ধারে পৌঁছে দেখি বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। মহিষের বাচ্চাটাকে জল থেকে

BanglaBook.org

খানিকটা তোলা হয়েছে। বুঝলাম ওর মায়ের কাজ। বাচ্চা মরে গেছে গত রাত্রেই।

অসংখ্য পায়ের ছাপ— ছোটো, বড়ো, মাঝারি।

সমস্ত ছাপ থেকে দুটি ছাপ বেছে নেওয়া হল। একটি ছাপ চলে গেছে জঙ্গলে। অন্যটি চলে গেছে নদীর কিনারা ধরে নীচের দিকে। তিনজন করে ছ-জন ট্র্যাকার দু-ছাপের পিছন পিছন চলে গেল। হাতি সঙ্গেই ছিল। হাতি নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম উপর আর নীচের জঙ্গলে। বেলা সাড়ে ছ-টায় দেখি একজন ট্র্যাকার দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে। খবর দিল ‘একটিয়া’ (solitary bull) পাওয়া গেছে। এখানে হাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শেষ। কারণ, সব হাতি মহিষের সামনে যাবে না। জোর করলে চেঁচিয়ে উঠবে। পায়ে হেঁটে আধ মাইলটাক যাবার পর দেখি প্রায় ৪০০।৫০০ গজ দূরে হাতির মতোই আর একটি জীব জঙ্গলের ধার দিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। ইনিই মহিষ! তৈরি হতে আরম্ভ করলাম। ঠিক হল কেবল আমি আর যুবরাজ যাব। আমি আগে রওনা হয়ে একটা

BanglaBook.org

ছোটো নালা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা মোটা বিজা গাছের তলায় শুয়ে থাকব। যুবরাজ আমার পিছনে যাবেন। কথামতো আমি রওনা হলাম। নালা দিয়ে খানিকটা এগোনোর পর মনে হল পা দুটো অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে। নালা পার হবার পরই খোলা জমি। এখানে বুকে হেঁটে এগোতে হবে। নালায় চলার সময় মহিষ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু পিছনকার লোকজন আরও কতটা এগোতে হবে হাতের ইশারায় তা বলে দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখি, ডাইনে একটা বিরাট জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, এত মোটা শরীর যে, পা দুটো অত্যন্ত ছোটো দেখাচ্ছে। চকচক করছে গায়ের কালো রং। চার পায়ে মোজা পরার মতো সাদা দাগ। অতি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে এগোতে লাগলাম বিজা গাছের দিকে। পিছনে একবার তাকিয়ে দেখি যুবরাজ এসে গেছেন এবং ইশারায় আমাকে আরও এগোতে বলছেন। যখন দুজনেই বিজা গাছের নীচে পৌঁছোলাম, দেখি মহিষ আমাদের দিকে পিছনে ফিরে ঘাস খাচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত গুনছি, কখন পাশ ফিরবে। রাইফেল তুলে ধরে নিশানা ঠিক করতে লাগলাম। হাতি ছাড়া যে অন্য কোনো জানোয়ার এত বড়ো হতে পারে, ধারণাই করতে পারা যায় না। আমি আগে তিন-চারটি বাইসন মেরেছি। দেখেছি তারাও কত বড়ো। উচ্চতায় হয়তো বাইসনই বড়ো, কিন্তু আয়তনে মহিষের জোড়া নেই। ভগবানের কী অদ্ভুত সৃষ্টি! জঙ্গলের মহিষের রূপ না দেখলে কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। অকস্মাৎ পাশের জঙ্গল থেকে মহিষ ডেকে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের রূপ গেল বদলে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ষাঁড় মহিষ দৌড়াতে লাগল। আমাদের দিকে পিছন ফিরে বিরাট শরীরটা পাতলা জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু বিশাল শিংজোড়া বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়তে লাগল।

মহিষের হঠাৎ পালিয়ে যাবার কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হয়েছিল হয়তো আমাদের দেখে মাদি মহিষ ডেকে উঠেছে। কিন্তু তাই-বা কী করে হবে? দেখলে অনেক আগেই আমাদের দেখত। পিছনে তাকিয়ে দেখি বুড়ো শিকারি মাথা হেঁট করে নালা ধরে চলে আসছে। বেচারি বুড়ো মানুষ, বুকে হাঁটতে পারবে না, অথচ রাজাবাহাদুরের হুকুম না মেনেও উপায় নেই। যুবরাজের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বুড়োর উপর। কিন্তু তাকে গালাগালি করে আর লাভ কী! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

ফিরে এসে দেখি, গাছের নীচে শতরঞ্জি বিছিয়ে প্রাতরাশ ঠিক করা হচ্ছে। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। যুবরাজ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মন খারাপ করবেন না, কাল ওটাকে ঠিক পাওয়া যাবে।'

বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ দ্বিতীয় দলের একজন ট্রাকার এসে উপস্থিত। খবর দিল প্রায় দু-মাইল দূরে মহিষ পাওয়া গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। এক মাইল যাবার পর দেখি আর একজন ট্রাকার দাঁড়িয়ে আছে। বললে, 'জঙ্গল খুব পাতলা, এখান থেকেই হাঁটতে হবে।'

হাতি থেকে নেমে পড়ে রাইফেলের গুলি দেখে নিলাম। আমার .৫০০ বোর আর যুবরাজের .৩৭৫ ম্যাগনাম হল্যান্ড, হল্যান্ডের তৈরি রাইফেল। পথ চলা শুরু হল; জঙ্গল নেই বললেই হয়। মাইলটাক যাবার পর ট্রাকার হাত দিয়ে গাছের উপর দেখিয়ে দিল।

BanglaBook.org

দেখি তৃতীয় ট্রাকার হাত গিয়ে গাছের উপর থেকে নির্দেশ করছে। আমাদের নজরে কিন্তু কিছুই পড়ল না। গাছ থেকে নেমে এসে ট্রাকার জানালে যে, আমাদের সামনে একটা পাতলা ঝোপের ওপাশে বড়ো বড়ো ঘাসের ভিতর মহিষ বিশ্রাম করবে। একটা মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। আবার বুকে হাঁটার পালা শুরু হল। প্রায় সত্তর-আশি গজ দূরে একটা উইয়ের ঢিবি, তার মধ্যে একটা সেগুন গাছ। কোনোরকমে যদি ঢিবিটার পাশে যেতে পারা যায়, তাহলে মহিষের এক-শো গজের মধ্যে পৌঁছোতে পারি। এগোতে লাগলাম।

পথ আর শেষ হতে চায় না। দশ গজ করে যাই আর এক মিনিট করে বিশ্রাম করি। অবশেষে যখন ঢিবিটার কাছে পৌঁছোলাম, সমস্ত শরীর কাঁপছে মনে হল। বেলা সাড়ে ন-টা। রাইফেল বেশ গরম হয়ে উঠেছে রোদের তাতে। ঢিবিতে হেলান দিয়ে বসে থাকলাম। ধীরে ধীরে যুবরাজ এসে পৌঁছোলেন। নিশানা করে ট্রিগার চেপে দিলাম। মহিষ মাটিতে পড়ে গেল। পড়ার সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি সামনের ঝোপের ভিতর থেকে চব্বিশ-পঁচিশটা মহিষ আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। হিংস্রতার প্রতিমূর্তি! মনে হল যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে গেল—বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। মৃত্যু অবধারিত। এমনি সময়ে দেখি যুবরাজ চপ্পল খুলে গাছে উঠবার চেষ্টা করছেন এবং আমাকেও চিৎকার করে বললেন, 'রায়, শিগ্‌গির গাছে উঠে পড়ো।'

গাছে উঠে পড়ো বললেই ওঠা যায় না। আমার পায়ে রবারের বুট, মহিষের দল সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে দৌড়োচ্ছে। কে যেন বলে উঠল : 'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।' হঠাৎ দেখি দলের একটা মহিষ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাকে দেখে সামনের পা মাটিতে ঠুকে এগোতে লাগল। আমি আমার রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহিষটা এগোতে এগোতে যখন দশ গজের মধ্যে এসে গেছে— কলজে ঘেঁষে গুলি করলাম। সঙ্গেসঙ্গে মহিষ দাঁড়িয়ে পড়ল। মহিষকে দাঁড়াতে দেখে যুবরাজ তাঁর .৩৭৫ দিয়ে গুলি করলেন, কিন্তু

গুলি ফুটল না। পর পর পাঁচটা গুলি মিস্-ফায়ার। আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার গুলি নেই। কারণ, নতুন গুলি বেছে একটা ব্যাগের ভিতর রেখেছিলাম, সেটা হাতির পিঠেই রয়ে গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, মহিষ তো আক্রমণ করছে না! সে শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে। একটু পরে চোখে পড়ল মহিষের মুখ দিয়ে ফেনার সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে। বুঝলাম ওর হয়ে এসেছে। কিন্তু এগোচ্ছে না কেন?— 'গুলি আনো', 'গুলি আনো', বলে চিৎকার করতে লাগলাম। প্রথমেই এল বুড়ো শিকারি তার .৪২৩ রাইফেল নিয়ে। যুবরাজ বললেন, 'শেষ করে দাও জানোয়ারটাকে।' পর পর পাঁচটা .৪২৩ Manser হজম করে মহিষটা দাঁড়িয়ে রইল অসুরের মতো। ততক্ষণে আমার গুলির ব্যাগও এসে পৌঁছে গেছে। কাছে গিয়ে আরও একটি .৫০০ বোরের গুলি মারতেই মহিষটা পড়ে গেল চিরদিনের জন্য।

কেন যে মহিষটা গুলি খেয়ে আক্রমণ করতে থেমে গিয়েছিল, তা চামড়া খোলার সময় টের পেলাম। গুলি মহিষের পাশে লেগে পেটের ভিতর ঢুকে প্যাংক্রিয়াল রিজিয়ান, মায় কিডনি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সুতরাং পিছনের দিকটা সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যায়। ভাগ্যিস এটা হয়েছিল, নইলে আমার শিকারের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিত।

কিন্তু অবাক করে দিয়েছিল প্রথম গুলি-খাওয়া মহিষটা। কারণ ঘাড়ে গুলি লাগার পর পড়ে গিয়ে উঠে সে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে গিয়ে তবেই আবার পড়ে গিয়েছিল। একটা জানোয়ার ঘাড়ে গুলি লেগে ঘাড় ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও কী করে উঠতে পারে এবং পঁচিশ-ত্রিশ গজ দৌড়াতে পারে— এটা সত্যই চিন্তার বিষয়। হয়তো একমাত্র মহিষের পক্ষেই তা সম্ভব!

BanglaBook.org

আর্য মুখোপাধ্যায়

কালী পাহাড়ের পশ্চিম দিকেই একটা কুলি বস্তি। পাহাড় কাটার কাজ নিয়ে এসেছে ওরা দূর দূর গাঁ থেকে। এপ্রিল মাস। দুপুরে প্রচণ্ড গরম তার ওপর ওই পাথুরে জায়গার ওপর দিয়ে বয় 'লু'। এর ভিতর আবার সেই বিভীষিকা! কর্মক্লান্ত শরীরটাকে দিনের শেষে বিশ্রামের জন্য এলিয়ে দিয়েও নেই স্বস্তি! আবার কোন ঘরের অস্ফুট কুসুম ঝরে যাবার পালা কে জানে! ত্রস্ত ভীত চোখে বুকের মধ্যে নিজেদের বাচ্চা চেপে ধরে করুণ প্রার্থনা জানায় কামিনগুলো ভগবানের উদ্দেশে।

সকাল বেলায় দেখতে গিয়েছি জানোয়ারদের ওঠা-নামার ট্র্যাক পাহাড়টার অপর পাড়ে, ঘুরতে ঘুরতে রোদ বেড়েছে, রওনা হয়েছি বাড়িমুখো। সঙ্গী আমার তিন বন্ধু। গল্প করতে করতে বস্তিটার প্রায় কাছেই এসে পড়েছি, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির এক কুলি; সারা দেহে তার পাথরের গুঁড়ো আর ধুলো। কিছু বলার আগেই তার চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। জোয়ান লোকের এ-রকম হঠাৎ কান্নার কী কারণ না জানতে পেরে যখন অস্বস্তি বোধ করছি মনে মনে, মুখ খুলল কুলিটা। জানলুম, এক জানোয়ার তার দুধের বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে গতকাল রাত্তিরে, একটা রক্তমাখা কাঁথা ছাড়া আর কিছুই পায়নি বাচ্চাটার। এ-রকম আরও অনেকের গেছে নাকি এই ক-মাসের মধ্যে। অনেক চেষ্টাতেও করতে পারেনি কিছুই। আবছা চাঁদের আলোয় যা দেখেছে, তাতে

BanglaBook.org

কেউ বলছে চিত্‌ওয়া (লেপার্ড বা প্যান্থার), কেউ বলছে লাকার (হায়না), আবার কেউ-বা বলছে লাকড়া বাঘ (নেকড়ে)।

বস্তিতে আসতেই ভিড় জমে চারিদিকে। নানা ধরনের কথা শুনি নানা লোকের মুখ থেকে এ সম্বন্ধে। সন্তানহারা মা কান্নায় ভেঙে পড়ে আমাদের দেখে। প্রতিশোধের আগুন মনের মধ্যে চেপে বিস্তারিত বিবরণ শুনি এই নিদারুণ অপহরণের, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হত্যা। বন্ধুদের ওখানে রেখে কুলিটার সঙ্গে দেখতে থাকি সেই কাঁথা পাওয়ার জায়গাটা, দু-একটা পাথরের ওপর কয়েক ফোঁটা জমা রক্তের দাগ। ওই রুক্ষ পাথুরে জায়গায় কোনো চিহ্নই নেই পায়ের ছাপের, অনেক দেখেও বুঝতে পারলুম না জানোয়ারটার স্বরূপ। ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আবার ফিরলুম বস্তিতে। মোটামুটি সাবধান হবার কথা বলে জানালুম যে, এর প্রতিকার করার জন্য চেষ্টা করব আপ্রাণ। সারা রাস্তাটা ভাবতে ভাবতে এলুম, কানে তখনও কান্নাটার রেশ রয়েছে লেগে।

একটা হিংস্র শ্বাপদের মুখ ভেসে এল, ছিন্নভিন্ন করে মাংস খাচ্ছে শিশুদেহ থেকে। ট্রিগারে চাপ দিয়েছি আঙুলের, আওয়াজ হল খট। মিসফায়ার! চোখ খুলে দেখি বিছানাটা ঘামে ভিজে গিয়েছে একেবারে, সেইসঙ্গে গায়ের জামাকাপড়। বালিশের নীচ থেকে ঘড়িটা বার করে দেখি বেলা পাঁচটা প্রায়। তাড়াতাড়ি উঠে বন্ধুদের ডেকে তুলি এবার। বিকেলের চায়ের সঙ্গে রাত্তিরের খাওয়ার পালাটাও চুকিয়ে নিয়ে বেরোলুম সবান্ধবে, বিকেল ছ-টা তখন। আবার সেই বস্তি। বস্তিটার সামনের আমগাছে দুজনকে একটা চারপাইয়ের ওপর বসিয়ে, আমি আর একজন গিয়ে বসলুম পাহাড়টার কিছু ওপরে—দুটো পায়ে-চলা পাহাড়ি রাস্তার মাঝামাঝি। সূর্য গেছে অস্তাচলে, শেষ আলোর রেশ রয়েছে লেগে পশ্চিম দিগন্তে। আমাদের পিঠের কাছে একটা বড়ো কাঁটাঝোপ, সামনে একটা মাঝারি পাথরের আড়াল। বস্তির শেষ ঘরটা পঞ্চাশ গজের মধ্যেই। রাইফেলের ওপরের আলোটা ঠিক করে দেখে নিলুম আবার। সব চুপচাপ। একটা একটা করে নাইটজারের ডাক শুরু হল এবার কাছের আর দূরের জঙ্গলগুলো থেকে; রাত্তিরের পর্দা ঢাকতে লাগল চারিদিক। এর কিছু পরেই পাহাড়ের মধ্যে থেকে ডাক ভেসে এল হুতুম পেঁচার চাপা গম্ভীর গলায়— হুড় গুম্ ম্ ম্।

বসে আছি তো বসেই আছি। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির সময় ঘোষণা করছে রাত্রি সাড়ে দশটা, এগারোটা, সাড়ে এগারোটা। হঠাৎ মাথার ওপরের পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ! আবার! এবার আমাদের বাঁ-দিকে পাহাড়ি রাস্তায়! আবছা তারার আলোয় দুটো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। একটা ছোটো, আরেকটা বড়ো। রাইফেলের ওপর মুঠোটা দৃঢ় হয়ে ওঠে, নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করি সুযোগের। আরও কাছে আসায় দেখলুম একটা মাদি সম্বর আর তার বাচ্চা। রাইফেলের ওপর মুঠোটা আলগা করি এবার। আস্তে আস্তে নেমে চলে গেল বেশ দূরের ছোটো জলাটার দিকে। আড়ষ্ট পা দুটোকে একটু আরাম দিয়ে আবার বসলুম গুছিয়ে। কোনো শব্দ নেই আর, প্রহরের পর প্রহরই কেটে গেল শুধু। শেষ রাত্রিতে একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল বোধ হয়, চমক ভাঙল বুনো মুরগির ডাকে। তখনও আলো ফোটেনি, শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে

BanglaBook.org

পাহাড়টার মাথা ঘেঁষে। ব্যর্থ প্রতীক্ষা। বন্ধুদের সব ডেকে নিয়ে যখন বাড়িমুখো রওনা হলুম, পুব আকাশে তখন সবে আলো দেখা দিয়েছে।

আজ রবিবার। কুলিদের ছুটি আজ; সজাগ থাকবে সবাই। তাই আর বসলুম না আজ। সন্ধেটা বেড়িয়ে কাটল এধার-ওধার। শহরের প্রায় সবটাই দেখা হল।

সোমবার সকালেই আবার গিয়ে হাজির হলুম বস্তিটায়। জানলুম, অঘটন কিছু ঘটেনি। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল অনেকটা। আমগাছটার গোড়ার আড়ালে একটা গর্ত করতে বলে দিলুম, যাতে বসতে পারি দুজন। আবার গেলুম পাহাড়ের ওপর, ট্রাকগুলো ভালো করে দেখতে। কাঁকর আর পাথরে চিহ্ন নেই পায়ের ছাপের। নীচে নেমে দেখি গর্ত তৈরি হয়েছে, যাতে স্বচ্ছন্দে বসা চলে দুজনের। বিকেলে আসব জানিয়ে চলে এলুম ওদের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির সামনে থেকে।

যখন গিয়ে হাজির হলুম আবার, সূর্য তখন সিঁদুর-রং ছড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের মাথা আর গাছপালাগুলোতেও সেই রঙেরই ছোঁয়া রয়েছে লেগে। এক এক করে হাজির হতে লাগল কুলিগুলো তাদের কাজ সেরে। আমাদের জায়গাটা থেকে দক্ষিণ দিকের একটা পাতায় ছাওয়া ঘর ঠিক করেছি, যাতে কেউ থাকবে না। শুধু জ্বলবে একটা কেরোসিনের ছোট্ট আলো। আর যে চারপাইটা ঘরে থাকবে, তার ওপর থাকবে কাঁথা আর ছেঁড়া কাপড় জড়ানো একটা ছোট ছেলের মতো মূর্তি (খড়ের) যেটা আমি তৈরি করেছি। দরজাটা থাকবে আধ-খোলা— যাতে বাইরে থেকে আবছা আলোয় দেখা যাবে চারপাশটা। মনোমতো সব গুছিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলুম ওদের যে, কেউ যেন না বেরোয়, আমি না ডাকলে যেন বন্দুকের আওয়াজ শুনেও না আসে আমার কাছে। প্রত্যেক দিনের মতো আজও যখন ওদের বাড়িগুলো নিস্তব্ধ হল তখন রাত প্রায় আটটা। সব কুঁড়েঘরগুলোই বন্ধ ভেতর থেকে; খালি একটা বাদ— সেটা আমারটা। দেখলে মনে হয় কেউ যেন এখুনি বেরিয়েছে বাচ্চাটাকে শুইয়ে। সজাগ উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি আমরা দুজন। হাতে আজ আর রাইফেল নেই, আছে বন্দুক। কাছাকাছি মারতে গেলে বন্দুকেই সুবিধে বেশি। বন্ধুর হাতে পাঁচ সেলের টর্চ। ঝিঁঝি ডেকে চলেছে একটানা, মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নিশাচর পাখির ডাক। দূর জঙ্গল থেকে কানে ভেসে এল সম্বরের ডাক— খ্যাঁক। একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল কোন ঘরে, ঘুম-জড়ানো গলায় তার মা কী বলাতে একটু ফুঁপিয়েই চুপ করল আবার। কী দেখব, আর কী দেখতে বসে আছি নিজেই জানি না, কিন্তু আগ্রহ অসীম। রাত্তির বাড়ছেই ক্রমশ, আর আমরা ভাবছি আজও বুঝি ব্যর্থ হল এ প্রতীক্ষা। রাত এগারোটা বাজে প্রায়। কখন আসবে সেই শিশুহন্তারক!

রাত সাড়ে এগারোটা! পিঠে আঙুলের চাপ পড়ায় ফিরে দেখি, বন্ধু ইশারা করছে একটা বড়ো পাথরের ঢিবির দিকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম সেই দিকে, একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়ল যেন ঢিবিটার পাশ ঘেঁষে। একটু এগিয়েই আবার একটা ছোটো ঝোপের আড়াল নিল জানোয়ারের ছায়াটা। বস্তিগুলোর কাছে আসতে হলে একটু ফাঁকায় তাকে আসতেই হবে। সময় যেন হু হু করে কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আর বেরোচ্ছে না কেন জানোয়ারটা। আমার ফাঁকিটা বোধ হয় ধরে ফেলেছে। নাঃ, ওই তো এবার বেরোচ্ছে

BanglaBook.org

ঝোপের পাশ থেকে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে। কী নিঃশব্দ আর সন্তর্পণ পদক্ষেপ! আরও একটু এগোলেই আসবে আমার সুযোগ। মনে সন্দেহ হচ্ছে এটাই তো সেই, না খাদ্যলোভাতুর অন্য আরেকটা! দেখা যাক, যদি ওই ঘরটার সামনে যায় ওর ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাবে অনেকটা। এইবার সেই আধ-ভেজানো দরজাটার দিকে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে। ছায়াটার আকৃতি দেখে এবার বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা বেশ বড়ো সাইজের হায়না। এই সেই হন্তারক!

ইশারায় মুহূর্তে বন্ধুর হাতের টর্চের উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়তেই, খানিকটা থমকে ছুটের চেষ্টা করার মুখে পাক খেয়ে পড়ে ঘাড়ে একটা 'এল. জি' লাগায়। বন্ধু উত্তেজনার চিৎকার করে ওঠে, 'আবার মারো ওকে, নয়তো পালাবে।' নিষ্ফলভাবে পা ছুড়ে আস্তে আস্তে নিশ্চল হয়ে গেল দেহটা। বন্ধ হল ওর শিশুমেধ চিরদিনের মতো। বন্দুকের আওয়াজের পর বন্ধুর ডাকে একে একে লোক ছুটতে লাগল বস্তিটা থেকে। কাছে গিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড একটা বুড়ে হায়না রয়েছে পড়ে।

আজ আর শিশু-রক্ত নয়, ওরই রক্ত রয়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে, ধুলো আর কাঁকর-বিছানো জমির ওপর।

কুমীর শিকার

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাণীবিজ্ঞানে সরীসৃপ বলতে যে জীবগুলি বুঝায়, তার মধ্যে সকলের চাইতে হিংস্র ও ভয়ানক বোধ হয় কুমির। কুমিরের অবশ্য নানা জাত আছে এবং তার মধ্যে সবকয়টিই সমান বড়ো বা হিংস্র নয়, অবশ্য সবকয়টিই মাংসাশী। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, পৃথিবীতে একুশ রকম কুমির আছে, সেগুলি যথাক্রমে কুমির, এলিগেটর ও কেয়মান এই তিন নামে পরিচিত। আমাদের দেশে কুমিরকে সাধারণত দুই জাতে ভাগ করা হয়— মেছো কুমির, যাকে হিন্দিতে বলে ঘড়িয়াল এবং কুমির যাকে হিন্দিতে বলে মগর। ঘড়িয়ালের লম্বা সরু চোয়াল, পাখির ঠোঁটের মতো এবং তার ডগায়, নাকের ছিদ্রের আশেপাশে, একটা বড়ো মাংসের পিণ্ডের মতো থাকে। বড়ো কুমিরের চোয়াল ভারী এবং খাটো ত্রিভুজের আকৃতির। দেখলেই বুঝা যায় তার চোয়ালে ভয়ানক জোর। বড়ো বড়ো পশুও সে-কামড় সহজে ছাড়াতে পারে না।

মেছো কুমির সাধারণভাবে মাছ ধরেই খায় এবং তার মুখের ও চোয়ালের গড়ন মাছ ধরার পক্ষে খুব সুবিধার। কিন্তু তাই বলে মেছো কুমিরের শাস্ত্রে এমন কিছু নেই যাতে তার অন্য জীব, এমনকী সুবিধা পেলে মানুষ পর্যন্ত— ধরে খাওয়া নিষেধ আছে। তবে আমাদের দেশে বড়ো পশু, যথা গোরু, বাছুর, মানুষ ধরে খায় অন্য কুমিরই বেশি এবং সেই কারণে তাদের কাছেই ভয়ের কারণ বেশি। এই জাতের কুমির আমাদের দেশ থেকে

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নিয়ে দক্ষিণ চিন পর্যন্ত সব এলাকায় নদী অঞ্চলে পাওয়া যায়।

হিংস্র ও মানুষখেকো কুমিরের মধ্যে গঙ্গার মোহনা অঞ্চলের কুমিরই সবচেয়ে বড়ো ও ভয়ানক হয়ে থাকে। এখানকার কুমির তেত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় বলে জানা গিয়েছে। অবশ্য এখন বন্দুক ও রাইফ্‌ল বহু লোকের হাতে গিয়েছে এবং সেগুলির পাল্লা ও মারণশক্তি প্রবল হয়েছে। উপরন্তু কুমিরের চামড়ায় তৈরি শৌখিন জিনিসের চাহিদা হওয়ায় কুমির শিকারে লাভের পথও হয়েছে। সেই কারণে যে সকল অঞ্চলে মানুষের বসতি ঘন বা যাওয়া-আসা সহজ সেখানে কুমিরের সংখ্যাও কমেছে এবং কুমির অত বড়ো হওয়ার সুযোগও আর পায় না। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে বড়ো কুমির এখনও আছে

BanglaBook.org

এবং সেখান থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করার পথ তাদের বন্ধ হয়নি, যদিও সেই যাতায়াত আগের মতো তাদের পক্ষে নির্বিবাদে হয় না। বড়ো কুমির নদীতে এসে গোরু ছাগল নিয়েছে এই সংবাদ পেলেই শিকারিদের কান খাড়া হয় এবং মানুষ নিলে সে-কুমির মারতে একাধিক শিকারি ঘোরাফেরা আরম্ভ করেন। যদি স্থানীয় লোকেরা কিছু সহায়তা করে, কুমিরের খোঁজখবর দেয়, তবে তাকে ঘায়েল করতে বা মারতে খুব বেশিদিন লাগে না। আগেকার দিনে এত বন্দুক রাইফলের লাইসেন্সও ছিল না এবং গঙ্গা ও তার শাখানদীগুলির তীরে এত ঘনবসতিও ছিল না। সুতরাং এক একটা অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে একই কুমির উৎপাত করে যেত। সাহেব শিকারিদের কুমির মারার খুব উৎসাহ ছিল না, কেননা কুমির শিকারে ঝঞ্ঝাট অনেক এবং কুমির গুলি খেলেই সরসর করে জলে নেমে যায় বলে তার চামড়া পাওয়া কঠিন হত।

যেসব জায়গায় গোরু-ছাগল বা লোকজন নদীর জলে নামে জল খেতে বা নিতে, অথবা ধোয়া-মাজা বা স্নানের জন্য, তারই কাছে কুমির ঘোরে-ফেরে। জলের উপর ভাসে তার দুই চোখ ও নাকের ডগা, যা খুব লক্ষ করে না দেখলে নজরে পড়ে না। কোনো পশু বা অসাবধান লোক জলে নামলে কুমির দূর থেকে লক্ষ করে জলের ভিতর দিয়ে তিরবেগে এসে তাকে ধরে, বা ধরতে না পারলে লেজের প্রবল ঝাপটায় জলে ফেলে। তারপর জলের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে বারে বারে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে ভালো করে কামড়ে ধরে নিয়ে ডুবিয়ে মেরে, নিজের গর্তের কাছে বা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে যায়। কত নির্বোধ পশু, কত অসাবধানী স্ত্রী-পুরুষ, চঞ্চল ছেলে-মেয়ে যে এইভাবে আগেকার দিনে কুমিরের কবলে যেত তার গোনাগুনতি নেই। বিশেষ করে বড়ো নদনদী অঞ্চলে তো ওইরকম দুর্ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারই ছিল।

গল্পে আছে যে, এক অন্যমনস্ক বউ আর তার অল্পবয়সি ননদ ভোরের দিকে, জনমানুষ চলাফেরার আগে নদীতে যায়। সেখানকার কাজ শেষ করে সে বাড়ি ফিরে চুপচাপ কীসের চিন্তায় ভুলে থাকে। এদিকে বেলা হবার সঙ্গেসঙ্গে বাড়ির লোকে তার সেই ছোটো ননদের খোঁজ করে, কিন্তু সে যে ওই বউয়ের সঙ্গে ভোরে বেরিয়েছিল তা কেউ দেখেনি, কাজেই তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি।

বেলা হতে বাড়ির বউ-ঝিরা খেয়েদেয়ে যখন মুখ ধুচ্ছে, সেই সময় সেই ভোলা-মন বউ দেখল বাড়ির একটি ছোটো মেয়ে লাফালাফি করে নাচছে। সেই দেখে সে ছড়া কেটে বললে—

> ‘কিবা কথা মনে এল আঁচাতে আঁচাতে
> ঠাকুরঝিরে লইয়া গেল নাচাতে নাচাতে।’

গল্পে তারপর কী হল সেকথা বলে না। তবে কুমিরে মানুষ নেওয়া প্রায় এইরকম সাধারণ ব্যাপারই ছিল।

কুমির মারার ব্যবস্থাও নানারকম ছিল। একরকম বঁড়শি-কল ছিল যাতে ছ-টা কি আটটা বড়ো বড়ো ফলা দেওয়া বঁড়শি ইস্পাতের স্প্রিঙের উপর আঁটা থাকত। সেই স্প্রিংগুলো চেপে বঁড়শিগুলো একসঙ্গে করে তাঁত দিয়ে বাঁধলে সেটা পদ্মের কুঁড়ির

BanglaBook.org

মতো দেখতে হত। সেই বঁড়শির ভিতরে ও উপরে মাংসের তাল তাঁত দিয়ে বেঁধে, তার গোড়ার দিকের লোহার বোঁটায় ইস্পাতের সরু তার অনেকটা লম্বা করে বেঁধে তারপর দড়ি দিয়ে ডাঙায় মজবুত খোঁটা বা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে তা শক্ত করে আটকে কুমিরের বাসার কাছে ফেলা থাকত। কুমির গিলে খায়— টুকরোও করে না, চিবিয়েও খায় না। সুতরাং এই টোপসুদ্ধ বঁড়শি গিলে আটকা পড়ত। এদিকে কুমিরের পেটে গিয়ে সেই বঁড়শির তাঁত গলে ছিঁড়ে যাবামাত্রই স্প্রিং খুলে সেই লোহার পদ্ম খোলা ছাতার মতো ছড়িয়ে কুমিরের পেটের ভিতর গেঁথে যেত। তারপর কুমিরকে টেনে ডাঙায় তুলে শেষ করতে আর কতক্ষণ?

ইছামতি নদীতে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বেও খুব কুমিরের উৎপাত ছিল। আড়ংঘাটায় নদীর ঘাটে একটু গভীর জলে অনেক বড়ো বড়ো সুঁদরী, গরান বা শালের সরু-মোটা গুঁড়ি পোঁতা থাকত দেখেছি। ঘাটে নৌকা আসার বাঁকা পথ ছিল, তা ছাড়া প্রায় সমস্ত ঘাটই এইরকম ছয়-সাত সারি খোঁটায় ঘেরা ছিল। এই ঘেরা জায়গায় কুমির ঢুকতে সাহস করত না, কেননা সেখানে লুকিয়ে ঢোকা সহজ নয় এবং শিকার নিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। তবে আঘাটা জায়গায় গোরু-ছাগল তো যেতই, আবার অসাবধানে মানুষও যেত এবং মাঝে মাঝে তাদের কুমিরেও ধরত।

আমার এক বন্ধুর জমিদারি ছিল ওই অঞ্চলে। তাঁর কয়েক ভাই কুমির শিকারে খুব দক্ষ ছিলেন, বিশেষে মেজো ও সেজো ভাই। একবার তাঁরা আড়ংঘাটার কাছারিবাড়িতে গিয়ে খবর পেলেন যে, একটা বড়ো কুমির খুব উৎপাত করছে। শুনে ওই দুই ভাই ওখানকার জেলেদের ডেকে খোঁজ করতে বললেন যে ওই কুমিরটা নদীর পাড়ে কোথায় রোদ পোয়াতে ওঠে। এখানে বলা দরকার যে, কুমিরমাত্রেই, বিশেষ করে শীতের দিনে নদীর পাড়ে রোদ পোয়াবার একটা জায়গা ঠিক করে। জায়গাটার ডাঙার দিক ঝোপঝাড় বা খানাখন্দে ঘেরা হওয়া চাই, যাতে ডাঙার দিক থেকে কুমিরকে দেখা অসম্ভব এবং তার কাছে পৌঁছানোও শক্ত। জায়গাটা নদীর দিকে খোলা ও উঁচু পাড়ের উপর হওয়া চাই, যাতে কুমির নদীর দিকে দূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারে এবং দরকার পড়লে ঢালু পাড় দিয়ে সড়সড় করে জলে নেমে যেতে পারে।

বড়ো কুমিরমাত্রেই খুব হুঁশিয়ার। শীতের দিনে প্রায় নির্জীবের মতো অসাড় হয়ে শুয়ে তারা রোদ পোয়ায়। আমরা জেলে-নৌকায় চড়ে দূর থেকে দেখে আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়েছি। নৌকার খোলের মধ্যে পাটা দিয়ে শুয়ে গিয়েও দেখেছি, নৌকা যেমন এগিয়ে কুমিরকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এনেছে, সঙ্গে সঙ্গে কুমিরও আস্তে আস্তে পাড় বেয়ে নেমে জলে গিয়েছে। যদিও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সে শিকারিকে দেখতে পায়নি। অথচ যদি সেই নৌকায় শুধু জেলেরা থাকত তবে সে নড়ে দেখত কি না সন্দেহ। এমন কথাও শুনেছি যে, সুন্দরবনের কুমির পাড় থেকে নেমে এসে জেলেডিঙি উলটে দেবার চেষ্টাও করেছে। ফিরিঙ্গি খালের প্রসিদ্ধ মানুষখেকো তো জেলেনৌকা পর্যন্ত আক্রমণ করত। নৌকা ছোটো বা জেলেডিঙি হলে স্রোতের সঙ্গে দাঁড় টেনে দ্রুত এঁকেবেঁকে পালানো ছাড়া উপায় থাকত না। কেননা তার সেই ত্রিশ ফুট লম্বা তালগাছের গুঁড়ির

মতো দেহ দিয়ে সে যদি নৌকো বা ডিঙির নীচে ঘষড়া দিতে একবার পারত, তবে হয় নৌকা উলটে লোকজন জলে পড়ত, নয়তো তলার কাঠ খুলে গিয়ে নৌকা ডুবে যেত। আর জলে পড়া মানেই যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ!

যাই হোক আমার বন্ধুরা দুই ভাই স্থির করলেন যে, কুমিরটাকে মারতে হবে। তার খোঁজের জন্য কিছু বকশিশের ব্যবস্থা করায় জেলেরা নদীর পাড় ধরে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখতে লাগল। তারপর একদিন খবর এল যে বেশ কিছু দূরে একটা বড়ো কুমিরকে দেখা গিয়েছে নদীর পাড়ে ওইভাবে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। জায়গাটা খারাপ। নদীর পাড় সেখানে অনেকখানি ভাঙাচোরা; —কোথাও জলা, কোথাও খুব ঝোপঝাড়— মানে, সেখানে লোকজন চলাচলের মতো জায়গাই নেই। অনেক খোঁজখবর করার পর ঠিক হল যে সেই জায়গা ছাড়িয়ে, নদীপথে একটু এগিয়ে, একটা বাঁকের আড়ালে নেমে, ডাঙার পথ দিয়ে কুমিরের ওই আড্ডার পিছন দিক দিয়ে ওখানকার কাছবরাবর পৌঁছানো যাবে। তারপর তো শিকারের পালা; তাতে ঝোপজঙ্গলই-বা কী আর নদীনালা, জলা বা ভাঙনের চড়াই-বা কী? সে সবই তো শিকারের অঙ্গ।

জলপথে গিয়ে, পাড় ঘেঁষে নৌকা নিয়ে, কুমিরের কাছে সহজেই পৌঁছানো যেত— অন্তত রাইফেলের পাল্লার মধ্যে। কিন্তু তারপর একটার বেশি দুটো গুলি মারার সুযোগ হত না, কেননা নৌকা দেখবামাত্রই কুমির ঝাঁপিয়ে জলে পড়ত। গুলি খেয়ে সে মরে জলে ডুবে গেলে ওই পর্যন্তই। তারপর তার চিহ্নও দেখা যেত কি না সন্দেহ! বড়োজোর তার পচা দেহটা কোথাও নদীর পাড়ে বা চড়ায় পাওয়া যেত, তাতে শিকারির লাভ কী?

খোঁজখবরমতো সব ঠিক করার পর একদিন ওই শিকারি দুই ভাই, সঙ্গে লোকজন নিয়ে নৌকায় করে যথাস্থানে পৌঁছোলেন। তারপর পোয়া মাইল মাঠ ভেঙে, হেঁটে, কুমিরের আড্ডার কাছে এসে হাজির হলেন। যারা খোঁজ এনেছিল তাদের দুজন খুব সন্তর্পণে সরু পথ দেখিয়ে, ঝোপঝাড় আস্তে ফাঁক করে এঁদের নিয়ে চলল। ওই দুই ভায়ের মধ্যে মেজো যিনি তাঁর দেহ ছিল বিলক্ষণ মোটা এবং শরীরের শক্তিও ছিল অসাধারণ, কিন্তু শিকারের সময় তিনি যখন চলতেন তখন কোনো শব্দ হত না তাঁর চলার, এ আমি নিজে দেখেছি। তিনি আগে এবং তাঁর পায়ের চিহ্নের উপর পা ফেলে সেজোভাই চললেন। হঠাৎ সামনের দুজন একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে গেল। বুঝা গেল যে শিকারের কাছেই পৌঁছানো গেছে। তখন মেজোভাই সেজোভাইকে ইশারায় খুব সাবধানে ঝোপের আড়াল ধরে, এগিয়ে আসতে বললেন।

সামনের লোক দুটির কাছে পৌঁছোতেই ঝোপের ভিতর দিয়ে দেখা গেল যে, পাঁচ-সাত গজ তফাতে একটা প্রকাণ্ড কুমির শুয়ে রয়েছে। দুই ভায়েরই হাতে দোনলা বারো বোরের বন্দুক 'রেডি' করাই ছিল। সেজোভাই উঠে দাঁড়িয়ে কুমিরের গর্দান লক্ষ করে গুলি চালালেন। গর্দানের কাছে শিরদাঁড়া 'রোটাক্স' বুলেটের মারে ঘায়েল হয়ে যাওয়ায় কুমিরটা দ্রুত এগিয়ে জলে পড়তে পারল না। কিন্তু বন্দুক তুলে মারবার মধ্যে কুমির যেটুকু সময় পেয়েছিল, তার মধ্যেই সে ঘাড় ফিরিয়ে শত্রুর দিকে তাকিয়ে, সেইসঙ্গে পাড়ের নীচের দিকে চলতে আরম্ভ করে। সেইজন্যে গুলির চোট পুরোমাত্রায়

BanglaBook.org

শিরদাঁড়ায় লাগেনি। গুলি লেগে কুমির উলটেপালটে নীচের দিকে গড়িয়ে গেল, কিন্তু সে কাত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে অন্য ব্যারেলের গুলি তার সামনের দুই পায়ের মাঝ বরাবর বুকে লাগল। দুই গুলি খেয়ে কুমিরের অবস্থা তখন শেষ হয়ে এসেছে এবং মেজোবাবু বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যেতেই সাত-আটজন লোক লগি দিয়ে এবং বোট হুক দিয়ে কুমিরকে চেপে ধরলে।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থামতো দুটো নৌকা, গুলির আওয়াজের সঙ্গেসঙ্গে নদীর উপর ওই জায়গার সামনে এসে তীরে ভিড়ল। তারপর কুমিরকে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে 'হেঁইয়ো জোয়ান' করে নৌকায় তোলা হল। যখন কাছারির কাছের ঘাটে শিকার নিয়ে নৌকা ফিরল, তখন কুম্ভীর মহাশয় শেষ হয়ে গেছেন!

কুমিরটা বাইশ ফুট লম্বা ছিল এবং তার পেটে বড়ো বড়ো পাথরের নুড়ির সঙ্গে রুপোর বালা, মল, চুড়ি বেশ কয়েকটা পাওয়া যায়। কয়েকটি হতভাগিনী মেয়ে যে ওর পেটে গিয়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ ওই গহনাগুলি থেকেই পাওয়া গেল।

এসব কথা ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর আগেকার। তখন এদেশে জাপানিদের এক খুব বড়ো কোম্পানি, 'মিসুই বুশন কাইশা' অনেক আমদানি-রপ্তানির কারবার করত। তার জাপানি অফিসারেরা খেলাধুলায়, বিশেষ করে টেনিসে, খুব ভালো ছিল। তাদের মধ্যে দুজন,

BanglaBook.org

ওকোমাটো এবং সিমিটজু টেনিস খেলায় বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল।

ওইসব জাপানিদের সঙ্গে আমার ওই বন্ধুর চতুর্থ ভাই কাজে-কারবারে খুবই পরিচিত ছিলেন। একবার তাঁদের কলকাতার বাড়িতে ওই জাপানি সায়েবদের নিমন্ত্রণ করায়, তারা এসে ওই বাইশ ফুট কুমির এবং আরও তিন চারটে কুমিরের 'ট্রফি' দেখে মেজোবাবুকে ধরে বসল যে তাদের কুমির শিকারে নিয়ে যেতে হবে। তাদের বলা হল যে কুমির শিকারে কষ্ট আছে, কিন্তু তারা সেকথা হেসেই উড়িয়ে দিলে। বললে যে, 'আমরা মিলিটারি শিক্ষাপ্রাপ্ত জাপানি পল্টনের লোক, আমরা ওসবে থোড়াই ভয় পাই। কুমিরের কাছে নিয়ে গেলে আমরা দেখিয়ে দেব জাপানি রাইফেলে কুমির মরে কি না!'

আমার বন্ধুর দল বনেদি জমিদার গোছের, কাজেই এইরকম অনুরোধ তাঁরা ফেলতে পারেন না। এর কিছুদিন পরেই এক ছুটিতে চারজন জাপানি সাহেবকে নিয়ে তাঁরা তিন ভাই গেলেন ওই ইছামতিতে কুমির শিকারে। এবং আগের থেকে খোঁজ রাখার কথা কাছারিতে জানিয়ে দেওয়ায় তাঁরা যাবামাত্রই শুনলেন যে, একটা মাঝারি গোছের কুমির, ষোলো, সতেরো ফুট আন্দাজের, নদীর পাড়ে এক জায়গায় ডেরা করেছে, যেখানে যাওয়া খুব মুশকিল হবে না। খবর পেয়ে তো জাপানিরা খুব খুশি, তাদের আর তর সয় না, একটা রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হতে।

পরের দিন যথাসময়ে নৌকায় করে সেই কুমিরের আড্ডার কাছাকাছি, শিকারির দল তো নেমে পড়লেন। তারপর কিছুটা হেঁটে যাবার পর, মেজোবাবু নীচু গলায় বললেন, 'এবারে নিঃশব্দে এগোতে হবে।' তার পরের কথা সেজোবাবুর জবানিতে এইমতো :

'আমরা তো টিপে টিপে একজনের পায়ের দাগের উপর পেছনের জন, এই করে এগোচ্ছি। যত এগোই তত জাপানিরা দাঁত বার করে হাসে, অবিশ্যি নিঃশব্দে। সেইসঙ্গে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়?' রাইফেল তো চারজনাই বাগিয়ে ধরেছে। আমার তো ভয়ই হতে লাগল যে, উৎসাহের চোটে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই না মেরে বসে।

তারপর কাছাকাছি এসে পড়েছি যখন, তখন মেজদা হাত দিয়ে জোরে ইশারা করে বললেন, গুঁড়ি মেরে নীচে ঝুঁকে এগোতে, যাতে ঝোপের ওপারে কুমির টের না পায়, যে আমরা কাছে এসে পড়েছি। আমরা তো ঝুঁকে পায়ে পায়ে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম যে জাপানিরা একেবারে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে চলল। বোধ হয় ওটা মিলিটারি চাল এই কথা ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি— কয়েক পা এভাবে গিয়েছি-কি-না-গিয়েছি, এমন সময় ওদের বড়োসাহেব জাপানি ভাষায় গাঁ গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠে লাফাতে আরম্ভ করল। আর যত লাফায় তত তার গায়ের কোট, শার্ট, গেঞ্জি সব খুলে ছুড়ে ফেলে, রাইফ্‌ল তো মাটিতেই পড়ে। বলব কী দাদা, লোকটা নিমেষের মধ্যে উদোম ন্যাংটো হয়ে গেল!

'আমরা সংবিৎ ফিরে পেয়ে, তাকে গিয়ে ধরে দেখি যে, লাল পিঁপড়েয় তাকে সর্বাঙ্গ ছেঁকে কামড়ে ধরেছে। তার গা থেকে পিঁপড়ে ছাড়িয়ে ভেতর বাইরে ব্র্যান্ডি প্রয়োগ করে, তাকে তো ঠান্ডা করা গেল। কিন্তু কুমির ততক্ষণে গঙ্গাসাগরে পাড়ি দিয়েছে!

'যাই হোক ফিরবার মুখে একটা চড়ায় একটা দশ-বারো ফুট কুমির দেখা গেল। সে বেটা উলটো দিকে মুখ করে ছিল, সুতরাং চারজন জাপানি কাছে পৌঁছে চারটে রাইফ্‌লের

গুলিতে তুবড়ি ছুটিয়ে তাকে শেষ করলে। তাতেই তারা মহা খুশি, আর আমাদেরও আপদের শান্তি!'

এই হল জাপানি মতে কুমির শিকারের পালা।

হিমালয়ে ভল্লুক শিকার

ধরণীধর সেন

বাঙালির পক্ষে হিমালয়ের পাহাড়ি জঙ্গলে ভাল্লুক শিকার আশ্চর্য বটে, কিন্তু এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমার ঘটেছিল। একবার ১৯৩৫ সালে এক বিদেশি বৈজ্ঞানিক অভিযানের সঙ্গে আমি কাশ্মীর ও পুঞ্চরাজ্যগুলি ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম ও সেইসঙ্গে কিছু শিকারেরও সুযোগ জুটেছিল। এই বিদেশি বৈজ্ঞানিক দলটির নাম ছিল 'ইয়েলকেমব্রিজ ইন্ডিয়া এক্সপিডিশন'— বৈজ্ঞানিক জগতে এদের আবিষ্কারের কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু শিকার করা এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল না, এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের আদিম মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, তাদের পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের আস্তানা

BanglaBook.org

আবিষ্কার করা। সেকথা আজ বলছি না। কাজের মাঝে মাঝে কীরকম আমাদের বন্য শিকার জুটত তার গল্পই এখানে বলব। আপনাদের অনেকেই বিশেষ করে যাঁরা কাশ্মীরের প্রান্তে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলগুলি দেখেছেন, হয়তো তাঁরা শুনেছেন সেখানকার পথে-বিপথে ভাল্লুকের দেখা মাঝে মাঝে মিলে থাকে। কাশ্মীর ও পুঞ্চ এ দুটি রাজ্যই ভাল্লুক-প্রসিদ্ধ। কিন্তু এগুলি সাধারণ কালো ভাল্লুক পরিবারভুক্ত নয়, এদের কাশ্মীরে বাদামি ভাল্লুক বা 'ব্রাউন বেয়ার' বলে। কারণ এদের বুকের এক জায়গায় অতি সুন্দর বাদামি রং দেখতে পাওয়া যায়। এদের গায়ের লোমসুদ্ধ চামড়া খুব দামি। তার কারণ, মৃগনাভির মতো বাদামি ভাল্লুকও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। কাশ্মীর-রাজ থেকে স্পেশাল লাইসেন্স না নিয়ে এদের মারার নিয়ম নেই।

এই ভাল্লুকগুলি সাধারণত ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু আক্রমণ করলে এরা বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠে। দু-পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লে এরা সহজে একটা লম্বা মানুষকে ছাড়িয়ে যায়। অনেক পাকা শিকারির হাত থেকে লড়াই করে এদের বন্দুক কেড়ে নিতে শোনা গিয়েছে, তারপর নৃশংসভাবে তাকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে হত্যা করেছে! অনেক শিকারি বলেন— এদের চেয়ে বাঘের হাতে মৃত্যু অনেক ভালো। কাশ্মীরি ভাল্লুকেরা গুহাপ্রিয়। আর এই গুহাগুলিই প্রাগ-ঐতিহাসিক মানুষের কঙ্কালের জন্য খনন করা আমাদের একটা কাজ ছিল। ভাল্লুকগুলোকে হয় গুলি করতে হত, নয়তো সশস্ত্র হয়ে তাড়াতে হত। সব গুহাতেই যে ভাল্লুক থাকে তা নয়। একবার কী হল শুনুন— যে গুহাটির কথা বলছি, সে-গুহাটি ছিল কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকার অন্তর্গত। একদিনেই আমরা জেনে নিলাম, সন্ধ্যার ঝোঁকে ভাল্লুক খাবার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, তারপর ভোর রাত্রে ফিরে আসে। দিনের বেলা তারা বড়ো একটা বেরোয় না। প্রথম দু-দিন তো আমরা চেঁচামেচি বাজনা-বাদ্যি করে ভাল্লুকভায়াকে কিছুতেই গুহার বাইরে আনতে পারলাম না। আমাদের অভিযানে টম প্যাটারস বলে একটি স্কচ ছেলে ছিলেন— পাকা শিকারি। ভাল্লুকভায়াকে ছাড়বার পাত্র তিনি নন। কাজেই আমাদের এক নিশীথ অভিযান ঠিক হল— বন্দুকের নলেতে একটি শক্তিশালী টর্চ লাগিয়ে টম প্যাটারসন গুহাটির ছাদে ঘুপটি মেরে ভোররাত্রের দিকে বন্দুক বাগিয়ে বসলেন। আমি তাঁকে উৎসাহ ও সাহায্য দেবার জন্য একটা লম্বা বর্শা হাতে নিয়ে তাঁর পেছনে গিয়ে বসলাম, যদি কিছু বিপদ ঘটে, তাহলে তাকে সাহায্য করতে পারব এই আশায়। আমার নিজের বন্দুক বা লাইসেন্স তখন ছিল না, তাই কাশ্মীরে থাকতে একটা বর্শা করিয়েছিলাম। যাই হোক, বেশ ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর টমের মুখ থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। সঙ্গেসঙ্গে আমিও দেখলাম— সেই আবছা আলোছায়া পাহাড়ি পথে, একটি ভাল্লুক মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। আরও কাছে— আরও কাছে, তারপরই হঠাৎ টর্চের তীব্র আলো ভাল্লুকের গায়ে পড়াতে সে থমকে দাঁড়াতেই সঙ্গেসঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম। ভাল্লুকটাও সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, আবার গুড়ুম। ভাল্লুক পড়ল মাটিতে, আবার গুড়ুম। তারপর সব শেষ। সবসুদ্ধ বোধ হয় তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না।

BanglaBoi.org

ভাল্লুকের বাদামি চামড়া বিলাতে টমের বন্ধুর কাছে। কিন্তু টম এতে খুশি হল না। বললে, আর একটা ওর পেছনে নিশ্চয় ছিল, তাকে বার করতে হবে। কিন্তু দু-দিন বসেও তার সাড়াশব্দ মিলল না। তখন টম একটা অসমসাহসিক কাজ করলে। বললে, সেন, তুমি থাকো, আমি আজ গুহার ভেতর গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখব। আমি তাকে বাধা দিতেও সে শুনলে না। বুঝলাম তার মাথায় শিকারির খুন চেপেছে। সেরাতেই টম গেল সেই গুহার ভেতর। তার পরদিন টম তাঁবুতে চায়ের টেবিলে যে গল্প বললে, তার মুখ থেকেই তা শোনা—

আমি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে টর্চ জ্বেলে গুহার অন্ধকারে তো ঢুকে পড়লাম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুহার দেয়ালে দেয়ালে আলো ফেলতে লাগলাম ও ক্রমশ নিঃশব্দে খুব আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ছাতের সঙ্গে মাথা ঠুকে যেতে লাগল। তারপর গুহাটা ক্রমশ ছোটো হয়ে এল, তখনও আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম। সামনে বোধ হয় নিজেরই প্রকাণ্ড অদ্ভুত অদ্ভুত ছায়া দেখতে লাগলাম। একটু ভয় যে করছিল না তা নয়। হঠাৎ কাদাজলে পড়ে গেলাম, কিন্তু জল ছিল না বেশি তাই রক্ষে! মনে হতে লাগল এই বুঝি ভাল্লুকের সামনাসামনি পড়ি। ট্রিগারে আঙুল লাগিয়ে আসন্ন বিপদের জন্য একেবারে তৈরি হয়েই এগুতে লাগলাম। কিন্তু কই? কিছুই দেখতে পেলাম না। গুহার শেষ অবধি পৌঁছে সামানে ভিজে ভিজে দেয়াল পেলাম। একটু দাঁড়ালাম, কিন্তু নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। মন বড়ো খারাপ হল। তারপর আস্তে আস্তে পিছু হেঁটে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাল্লুকটা তাহলে জন্মের মতো তার এ আস্তানা ছেড়ে চলে গিয়েছে!

ভাল্লুক মিলল না বটে, কিন্তু টমের বাহাদুরিতে আমরা বাহবা দিলাম। আমাদের দলপতির ছিলেন একজন জার্মান, তাঁর নাম ডি টেরা— তিনি ছিলেন ভূতত্ত্ববিদ; শিকারের ঝোঁক তার বড়ো একটা ছিল না। কিন্তু তিনিও বললেন, তাই তো! টম, ভাল্লুকটা মারলে তুমি নিশ্চয় চামড়াটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিতে!

এরপর আমাদের কাজের ভাগ হয়ে গেল। আর আমার ভাগ্যেই পড়ল পার্বত্য নদী লীডার উপত্যকার অন্তর্গত গুহাগুলি খনন কাজের জন্য পরীক্ষা করা। শ্রীনগর থেকে টম গেল সিন্দ উপত্যকায় আর ডি টেরা গুলমার্গে। আমার পথের শেষ লক্ষ্য হল বিখ্যাত অমরনাথ গুহা— (যার কথা আপনারা অনেকেই শুনেছেন)। আর এরই রাস্তায় কাজের উপযোগী গুহাগুলি দেখা। যা হোক, শ্রীনগর থেকে মোটরে আমি পাহালগাম পৌঁছোলাম। পাহালগাম থেকেই অমরনাথের পার্বত্য পথ শুরু, আর লোকালয়ের শেষ। পাহালগামে পৌঁছে আমি একজন শিখ সর্দারকে শিকারি নিযুক্ত করলাম। এর নাম ছিল গুরুদিৎ সিং। তার নিজের বন্দুক ও লাইসেন্স ছিল। এ ছাড়া ডি টেরা আমাকে একজন 'পাঠান' বেয়ারা দিয়েছিলেন— রান্না ও তাঁবুর কাজের জন্য। এই পাঠানটি গত মহাযুদ্ধের ফেরত; ফ্রান্সে লড়াইয়ের সময় তার উরুতে লাগা গুলির দাগ এখনও আছে। এর নাম ছিল মিশ্রিখান। দুজনেই বলবান ও সাহসী লোক। আমি খুব খুশি ও উৎসাহিত হয়ে তাদের তখনই সঙ্গে নিলাম এবং শীঘ্রই তারা আমার আপনার লোকের মতো হয়ে গেল। কিন্তু আমার ভাগ্যে

BanglaBook.org

মাত্র যে দু-বার ভাল্লুক শিকার জুটেছিল, সে-শিকার দু-বারই হাতছাড়া হয়েছিল আর দু-বারই টমের মতো বন্ধু ও শিকারির অভাব অনুভব করেছিলাম। যাহোক, ঘটনা দুটোর একটা আগে শোনাই।

ছোটো বড়ো গুহা দেখলাম অনেক, কিন্তু অমরনাথের তুষারপথে এসেই ঘটনাটি ঘটল। এ জায়গা থেকে অমরনাথ-গুহা মাত্র সামান্য পথ। জায়গাটা প্রায় এগারো হাজার ফিট উঁচু। কাছে দশবারো মাইলের মধ্যে কোথাও লোকালয় নেই, কেবল বরফ আর বরফ। আর কেবল যারা ভেড়া চরায় সেই ভবঘুরে কাশ্মীরি চোপানের দল। দু-একটি দলের কখনো কখনো তাঁবু দেখা যায়, আর দেখা যায় তাদের বিরাট ভেড়ার দল। একদিন নিজের কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরেছি, হঠাৎ দেখি, একটা চোপান এসে হাজির, সে ভাঙা উর্দুতে ও কাশ্মীরিতে যা বললে, তাতে বুঝলাম, কাল রাত্রে তার একটা বড়ো ভেড়া তার তাঁবুর কাছেই ভাল্লুকে মেরে গিয়েছে; সাব যদি মেহেরবানি করেন তো গরিবের অন্য ভেড়াগুলো রক্ষা পায়— ইত্যাদি। দেখলাম, এ সুযোগ আমার ছাড়া উচিত নয়। গুরুদিৎ ও মিস্রিখান তো উৎসাহ দেখিয়ে হইহই করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, তাঁবু তোর কত দূর? উত্তরে বুঝলাম, মাইলখানেক দূর হবে আমার তাঁবু থেকে। তখনই হুকুম দিলাম, তৈরি হও, তাঁবু নিয়ে চলো ওই জায়গায়। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, পাহাড় থেকে অন্ধকার আস্তে আস্তে নেমে আসছে। খাওয়াদাওয়া সেদিন আর আমার হল না, সাজপোশাক রইল গায়ে— পড়লাম বেরিয়ে। এক মাইল রাস্তাই বটে! প্রায় এক ঘণ্টার পর চোপানের শতছিদ্র তাঁবুর কাছে এসে পড়লাম। দেখলাম, কম করেও প্রায় দু-তিনশো ভেড়া তাঁবুর সামনে জমা হয়ে রয়েছে আর তাঁবুরই একধারে একটা প্রকাণ্ড ভেড়া মরে পড়ে রয়েছে— তার পেটটা একেবারে ফাঁক হয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! ভাল্লুকটার সাহসের কথা মনে হতে লাগল। তা ছাড়া একথাও মনে হল যে, এরা কি তাহলে মাংসপ্রিয়! না, কিছু জোটে না বলেই তারা ভেড়া ধরতে আরম্ভ করে। চোপানের কাছে শুনলাম, ব্যাপারটা তাই বটে। চোপান দূরে একটা তুষারাবৃত পাহাড়খণ্ড দেখিয়ে বললে, ওইদিক দিয়ে সে নেমে আসে— আজও সে তার হাতে-মারা এই ভেড়াটি নিতে আসবেই। যাক— তাঁবু তো লাগাতে বললাম।

মিনিট দশেক-এর মধ্যেই তাঁবু তৈরি হয়ে গেল। আমার তাঁবুর ঠিক পেছনে চোপানের তাঁবুতে গিয়ে দেখলাম, তার স্ত্রী ও দুটি সুন্দর ছেলে-মেয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেঁড়া জামার ভেতর থেকে তাদের গায়ের রং আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। ছেলে-মেয়ে দুটিকে কোলে নিলাম, কথা বললাম, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না; বড়ো বড়ো চোখে বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

দেখতে দেখতে নেমে এল সন্ধ্যা, ঘনিয়ে এল আঁধার, আমি নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। চোপান বললে, আমি রইলাম বসে, খবর দেব— চোখ আমার পাহারায় রইল— বলে, নিজের তাঁবুতে সে ফিরল। আমার তাঁবুর সামনে বিরাট ভেড়ার দল গিজগিজ করছে, অন্ধকারে তাদের কারুর কারুর নীল চোখগুলি জ্বলে জ্বলে উঠছে। বিশ্রী গন্ধ আর প্রায় পাশেই পড়ে আছে সেই নাড়িভুঁড়ি বের করা হতভাগ্য মরা ভেড়াটা। মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে এক একটা ভেড়ার ছানা করুণভাবে ম্যাঁ ম্যাঁ করে ডেকে উঠছে। আমাদের চোখ থেকে ঘুম যেন জন্মের মতো ছুটে গেছে। পাশেই বসে আছে নিঃশব্দে গুরুদিৎ মিশ্রিখান, টোটা-ভরা বন্দুক আর তীক্ষ্ণ বর্শা নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে আছে। অনেকক্ষণ বসে বসে অবসন্ন হয়ে আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার গোদা বুট জুতোজোড়া খুলে একটু আরামের নিশ্বাস ফেললাম। হাতের কাছে ধুচুনিতে (ওদের দেশে 'কাংড়ী' বলে) আগুন জ্বলছে, তাতেও শীত আমাদের কিছুমাত্র কমছে না। গায়ে পুলওভার ওভারকোট তো আছেই। নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ শুনতে পেলাম, ভেড়াগুলোর মধ্যে থেকে একটা অস্ফুট হিস হিস হিস আওয়াজ— আর মনে হল, তারা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু গিজগিজ করছে সেই ভেড়ার দল, কোথায় যে কী হচ্ছে অন্ধকারে ঠাওর করার জো নেই। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে চোপানটার মূর্তি দেখা গেল, সে চাপা গলায় বললে— সাব, আ গিয়া! আমি তো জুতো পরবার সময় পেলাম না, 'মস্যি' (বুটের ভেতরে পরবার একরকম পাতলা চামড়ার জুতো) পরেই বেরোলাম, একেবারে নিঃশব্দে হাতে টর্চ নিয়ে। চোপান টর্চ জ্বালাতে মানা করলে। সবচেয়ে আগে পথপ্রদর্শক চোপান, তার পায়ে পায়ে গুরুদিৎ বন্দুক বাগিয়ে, আর সেইসঙ্গে আমি ও মিশ্রিখান। মিশ্রির হাতে বর্শা। পায়ের নীচে ঠান্ডা মাটি, কখনো নীচে নামি কখনো উঁচুতে উঠি, কখনো হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিই আর কখনো ডান দিকে কখনো বাঁয়ে এগুতে থাকি। বোধ হয় বিশ-পঁচিশ পা গিয়েছি কি যাইনি, হঠাৎ চোপান একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, ওই ওই— সঙ্গেসঙ্গে টর্চের আলো ফেললাম, কই কিছু তো দেখতে পেলুম না। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলাম। একেবারে নিশ্বাস চেপে, হঠাৎ সামনে না গিয়ে পড়ি তাই ভাবতে লাগলাম। উঃ, বাপস, সে কী সময়! ভাল্লুকটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রইল নাকি? দেখার চেয়ে না দেখা যেন অন্ধকারে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমাদের চারটি প্রাণীর জীবন অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল। প্রায় মিনিট কুড়ি খোঁজা গেল কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। অবসন্ন হয়ে তাঁবুতে সব ফিরলাম। চোপান বললে, সাব, এখানেই কোথাও ওটা আছে। আপনারা শুয়ে পড়ুন, আমার দায়, আমি জেগে পাহারায় রইলাম। কিন্তু ঘুম কি আসে? তাই সে-অবস্থায় সমস্ত রাত সেই পাহাড়ের মধ্যেই আমাদের অনিদ্রায় কাটল। ভোরের আবছা আলো ফুটলে দেখলাম, চোপান সপরিবারে এসেছে, সেলাম করে করুণভাবেই বললে, সাব, আপশোস, একটা ভেড়া আমার নিয়ে গেছে বেটা, আমি জানতে পারিনি, তোমার কসুর নেইকো। বসে পড়ে বলে চলল, সাব, এরা আসে নিঃশব্দে, এমনভাবে অন্ধকারে বোকা ভেড়াকে ধরে যে, সে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারে না— তারপর তার জানটি মেরে যেমন নিঃশব্দে আসে, তেমনি নিঃশব্দে সরে পড়ে। বুঝলাম, তাহলে এবার একটা পুরো ভেড়া নিয়েই সে উধাও হয়েছে। সেরাত্রে আবার একেবারে অমাবস্যার অন্ধকার ছিল। অত্যন্ত মন খারাপ নিয়ে, অনিদ্রায় অবসন্ন হয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘাঁটিতে। তারপর দিন দুয়েক পরে কাজ শেষ করে অমরনাথ থেকে বিদায় নিলাম। কেবল আসবার দিন একবার খোঁজ করেছিলাম নীচেকার জঙ্গলে। আর কতকগুলি গিধ্বড় বলে বুনো খরগোশ জাতীয়

একরকম ছোটো লোমওয়ালা জন্তু মেরে মনের ও হাতের আশ তখনকার মতো মেটালাম। ছোটো হলেও এদের লোম ও চামড়া ভারি সুন্দর।

শিকারের মোহ যখন মানুষকে পেয়ে বসে, তখন আর তার রক্ষে নেই। আগেই বলেছি আমি মোটেই শিকারি নই, কিন্তু শিকারের মোহ যেন আমাকে পেয়ে বসল। কী ব্যাপার এখন সেই কথাই বলছি—

অমরনাথ থেকে নেমে পাহালগামে আবার ফিরে এলাম। অমরনাথ যেতে হলে এই পাহালগাম জায়গাটি দিয়ে পশ্চিম দিকে যেতে হয়। আর শ্রীনগর বা অন্যত্র যেতে হলে পাহালগামেই অমরনাথ থেকে আবার নেমে আসতে হয়। যাহোক, এবার ঠিক করলাম যাব পূর্ব দিকে অর্থাৎ কোলাহাই তুষার নদীর উদ্দেশে। কোলাহাই পাহালগাম থেকে প্রায় মাইল কুড়ি রাস্তা হবে। চেষ্টা করলে ঘোড়ার পিঠে একদিনেই পৌঁছানো যায়, কিন্তু আমি মাঝে লিডারওয়াট বলে একটি সুন্দর জায়গায় রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন বেলা থাকতে থাকতেই কোলাহাই পৌঁছোলাম এবং কোলাহাই তুষার-নদীর পাশেই অপরিসর উপত্যকার মাঝে একখণ্ড তৃণভূমিতে তাঁবু লাগালাম। গাছপালার কথাই নেই, ঘাস্যও এসব জায়গায় দুর্লভ। অনেক খুঁজে-পেতে ও তুষার-নদীর প্রায় একেবারে সামনে গিয়ে পড়ে এই সামান্য ঘাসে-মোড়া সোনার জায়গাটুকু আবিষ্কার করেছিলাম। দু-ধারে আকাশছোঁয়া পাহাড়ে চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে। কেবল একপাশ দিয়ে লিডার নদী তুষার পাহাড়ের নীচেকার একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে একটানা একঘেয়ে একটা শব্দ করে চলেছে। কোথাও গ্রাম, লোকালয়, এমনকী একটা মানুষের মাথাও দেখা যাচ্ছে না। এদিকের রাস্তা এই কোলাহাই তুষার নদী ও পাহাড় অবধি এসে একেবারে শেষ হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছে। সূয্যি বোধ করি এখানে দেখা দেয় না— আকাশের দিকে চাইলে মনে হয়, সূয্যি কোনকালে এদেশে ওঠে না। চারিদিকে ঠান্ডার একটা প্রলেপ ও কেমন একটা থমথমে ভাব। ভাল্লুকের চলাফেরা করবার উপযুক্ত জায়গা বটে!

এক ঘণ্টার মধ্যে যেন হঠাৎ সন্ধে হয়ে গেল। কেবল পাহাড়ের চুড়োর দিকে চেয়ে মনে হতে লাগল, অন্য দেশে দিন যেন এখন অনেক বাকি। এইরকম স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে আমার ছোট্ট ছোউলদারি তাঁবুটিতে আমি ও আর একটিতে গুরুদিৎ সিং, মিশ্রিখান ও আরও দুজন কুলি— এই পাঁচটি প্রাণী মাত্র জেগে আছি। আর চারিদিকে সব যেন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। এ জায়গাটাতে যে ভাল্লুকভায়াদের বেশ গতাগম্য আছে আমার শিকারি ও কুলিরা ভালোরকম জানে— তারা এর আগেও এদেশে এসেছে।

সেদিন খুব ভোরে আমরা লীডার নদীর ধারে এমন একটা জায়গা ঠিক করলাম যে, ভাল্লুকের ওপরে পাহাড়ে ওঠবার পথে বা নেমে সেখানে জল খেতে আসবার সম্ভাবনা খুব বেশি— শোনা গিয়েছে তারা প্রায় আসেও।

তখনও বেশি রাত্রি; আমরা তিনটি প্রাণী— আমি, গুরুদিৎ ও মিশ্রিখান একটা প্রকাণ্ড পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিলাম। একরকম অগুনতি গোলাকার পাথরখণ্ড সেখানে পড়ে আছে। আমাদের পেছনে একটা খাড়াই পাহাড়ের গা। আমাদের পাশেই ঠিক আর একটা প্রকাণ্ড পাথরের খণ্ড তার পাশ দিয়ে জানলার মতো করে নদীর ধারটা ও ভাল্লুকের চলার রাস্তা বেশ চোখে পড়ে। গুরুদিৎ গুছিয়ে বন্দুকের নালাটা ওই দিকে ফিরিয়ে তাক করে রাখল। বসে বসে দেখলাম, পুব আকাশের অতি সামান্য একটু আলোর ভাবে নদীর ধারটা আবছা থেকে যেন একটু সামান্য স্পষ্ট হল। আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছি— কথাবার্তা নেই। যা কথা কওয়ার ছিল, তাঁবুতে সব সেরে এসেছি। আমার হাতঘড়িটা টিক টিক করে আওয়াজ করছে— দেখতে পাচ্ছি না ঠিক ক-টা বেজেছে। তাঁবু থেকে বেরুবার সময় হয়েছিল জানি সাড়ে তিনটে। চুপচাপ। এমন সময়— প্রায় তিনশো গজ দূরে, দুটো ছায়া আস্তে আস্তে যেন একদিকে সরে যাচ্ছে— হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। সেদিকে আঙুল দিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে গুরুদিৎকে দেখালাম। গুরুদিৎ মাথা নাড়লে— অর্থাৎ বন্দুক চলবে না। এখন দেখা গেল, আমাদের রাস্তার দিকে না এসে ভাল্লুক-জোড় যেন ভিন্ন পথ নিচ্ছে। তাহলে শিকার তো হাতছাড়া হবার জোগাড়। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম, গুরুদিৎ অস্ফুট স্বরে আমাকে বললে, আব্ বৈঠিয়ে, ম্যায় উসকো পিছু যাউঙ্গা। বলে চতুর শিকারির মতো নিঃশব্দে সে উঠে ওদিকে চলে গেল— কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলি তার গন্তব্য পথ আড়াল করল এবং ভাল্লুকগুলোকেও আর দেখা গেল না।

আবার কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। এবার একটু একটু করে আলো পাহাড় থেকে নীচে নামছে। হঠাৎ দেখি, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক একেবারে জলের ধারে মুখ নীচু করে আছে। কী ভয়ংকর! —গুরুদিৎ নেই কাছে; বড়ো আপশোস হতে লাগল। কিন্তু কোথায় সে? সে কি অন্য কোথাও থেকে ভাল্লুকটাকে তাক করছে? ...কিন্তু বেশ কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। ভাল্লুক সেই মুখ নীচু করে আছে তো আছেই— কিন্তু ওটা করছে কী—

BanglaBook.org

জল খাচ্ছে নাকি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অথচ পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যেই। আমার রক্ত ইতিমধ্যে গরম হয়ে উঠল— কীসের একটা টানে উশখুশ করে উঠলাম। ভাবলাম, আমার হাতের বর্শাটা ছুড়ে তার পিঠে গেঁথে দিই। তাক করে গায়ের সমস্ত জোরে বর্শাটা টিপ করে ছুড়লাম। কিন্তু আমি আফ্রিকার হটেনটট নই— ও চলবে কেন! ভাল্লুকটার প্রায় ফুট খানেক পাশে একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বর্শাটা অন্য একটা দিকে ভীষণ জোরে ছিটকে পড়ল। মুহূর্তে কী হয়ে গেল— সঙ্গেসঙ্গে গুড্ডুম গুড্ডুম করে দুটো আওয়াজ! ভাল্লুকটা তীক্ষ্ণ বেগে একদিকে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গেসঙ্গেই আবার নিকটেই গুড্ডুম গুড্ডুম করে দ্বিতীয় বার আওয়াজ! প্রায় ছয়-সাত মিনিট আমরা অস্থিরভাবে চুপচাপ— বাইরে বেরিয়ে আসতেও পারছি না। নিজের উপর ভয়ানক রাগও হচ্ছে। মিশ্রিখান একবার বিড় বিড় করে কী যেন বললে। কিন্তু হতভাগা গুরুদিৎ কোন দিকে গেল? বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে— রাত্রি আর নেই। এবার দূরে, মনে হচ্ছে যেন একটা সমস্ত রাত্রি পরে গুরুদিৎকে দেখতে পেলাম। আর দেখতে পেলাম, একটা ভাল্লুকের বাচ্চাকে ঝোলাতে ঝোলাতে সে নিয়ে আসছে। অবশ্য সেটা মরে গেছে। শেষে, ভাল্লুকের বাচ্চা!—ওটার অতটুকু চামড়া কী হবে? গুরুদিৎ এসেই বললে, জি, আব লোক কই আওয়াজ কিয়া? আমি তখন আমার বর্শা ছোড়ার অতিলোভের ইতিহাসটা লজ্জিতভাবে বললাম। তখন গুরুদিৎ বললে যে, একটা বড়ো ভাল্লুক নির্ঘাত নিত— কিন্তু ওই আওয়াজে সে চমকে সরে যাওয়াতে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ভাল্লুকটার পেছনে এই ছোটো বাচ্চাটা ছিল— ওরা দুটোই ছুটছিল— সেও পিছু নিলে এবং বাচ্চাটা একটু পিছিয়ে পড়াতে ওইটাকেই সে গুলি লাগিয়েছে। আমি ক্লান্ত হয়ে বললাম— যাক, আজকে অনেক হয়েছে আর কাজ নেই, —ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলুম। গুরুদিৎ খুশিই হল। আমরা সেদিনকার অভিযানের কিছু কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরলাম।

তার পরের রাত্রের আগেই কোলাহাই থেকে বিদায় নিলাম। হয়তো বড়ো ভাল্লুকটা বাচ্চা হারিয়ে হিংস্র হয়ে আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে বসত। ভাল্লুক হিংস্র হয়ে উঠলে তারা সমস্ত বন্য পশুদের চেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

কয়েক দিন পরে পাহালগাম ও শ্রীনগর হয়ে গুলমার্গে আমরা চলে এলাম। এবং সেখানে টম ও ডি. টেরার সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম, আমি ও টম পুঞ্চরাজ্যে যাব ঠিক হয়েছে। অনেকদিন বাদে টমকে আবার পেয়ে আমার ভারী মনটা খুব হালকা ও খুশি হয়ে উঠল।

গুলমার্গ থেকে শুরু করে উঠতে উঠতে পীরপঞ্জল পাহাড় টপকে পুঞ্চরাজ্যে নামবার অ্যাডভেঞ্চারের মস্ত প্ল্যান তৈরি হল। যে পার্বত্য-গলি (pass) দিয়ে আমরা যাব সেটার নাম চোরপঞ্জল পাস। সাধারণত নেহাত অ্যাডভেঞ্চার-দুরন্ত বা জেল-পালানো খুনি আসামি ছাড়া অন্য কোনো লোক বোধ হয় এ রাস্তা নেয় না। রাস্তা মানে, দু-ফুট পায়ে চলার অপ্রশস্ত বিপদসংকুল পিচ্ছিল পথ। যা হোক, শুরু হল আমাদের যাত্রা। আমরা সমস্ত দিন হাঁটতাম ও যেখানেই সন্ধে হয়ে যেত সেখানেই তাঁবু ফেলতাম— আর বাইরে

BanglaBook.org

আকাশের তলায় সর্বপ্রথমে আমাদের ডিনার তৈরি হত। সমস্ত দিন চলে ক্লান্ত হবার দরুন সাতটার সময়ই ভবঘুরে বেদুইনদের মতো খাওয়াদাওয়া করে আমরা যে যার তাঁবুতে ঢুকতাম। বাইরে আমাদের লোকজনের কেউ কেউ পালা করে পাহারায় থাকত। বন্য পশু ও ছিঁচকে ডাকাতের জন্যে এই সাবধানতা। টমের দুটি বন্দুকের একটি আমার কাছে থাকত এবং দুটোই টোটা-ভরা অবস্থায় আমাদের বিছানার একপাশে পড়ে থাকত। পীরপঞ্জল পাহাড় পার হবার আগে এক জায়গায় (পাঞ্জান পাথরি) আমাদের তাঁবুর পেছনের জঙ্গলে ভাল্লুক এসেছিল শুনেছিলাম।

পীরপঞ্জল পাহাড়টা উচ্চতায় চোদ্দো হাজার ফুটের বেশি। যেদিন পীরপঞ্জল পাহাড়চূড়ায় সেই চোরপঞ্জল গলিতে চোদ্দো হাজার ফিটের ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন এক অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল আমাদের। চারদিক শূন্য, কুয়াশাচ্ছন্ন, পায়ের তলায় কালো বরফ! কতবার আমরা যে পিছলে পড়ছিলাম তার ঠিক ছিল না। সেদিন মনে হয়েছিল যেন হিমালয় জয় করেছি। কাছাকাছি এক জায়গা থেকে আমরা সুউচ্চ নঙ্গ পর্বতের অপরূপ ধবল-চূড়া দেখলাম— সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! পীরপঞ্জল পার হয়ে আমরা পুঞ্চরাজ্যে নামলাম।

পুঞ্চরাজ্যে সাপুর বলে একটা পাহাড়ি গ্রামে আমাদের ভাল্লুক শিকারের একটা প্রকাণ্ড ঘটনা ঘটল। শুনেছি এই সাপুর গ্রামে এমন একটি গুহাও নেই, যেখানে ভাল্লুকের বসতি নেই। এজন্য আমরা মনস্থ করেছিলাম, আমাদের অভিযানের প্রত্যেক সভ্যের জন্য একটি করে ভাল্লুক মারা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের অত বড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা চতুর ভাল্লুকের দল ব্যর্থ করেছিল। তবে আমাদের চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয়নি।

সাপুরে সমতল ভূমি বলে কিছু ছিল না। যা হোক, গিয়েই আমরা শুনলাম, ভুট্টাচোর ভাল্লুকের জ্বালায় গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে আছে। সন্ধে হলেই ভুট্টার খেতে তারা দল বেঁধে ভুট্টা খেতে আসে। আমাদের শিকারের দল ভেবে তারা উৎসাহিত হয়ে অভ্যর্থনা করলে। বিনামূল্যে মুরগি, ডিম, দুধ, কাঠ— সব পেয়ে গেলাম। তারা বললে, তাদের গ্রামের দু-চারজন শিকারিও যোগ দেবে— কিন্তু তাদের লাইসেন্স নেই, তাই তারা মারতে পারবে না। তারপর একদল বাজনা, বিগল, ঢোল এসব বাজিয়ে তারা তুমুল কোলাহল করে ভাল্লুকগুলোকে কোণঠাসা করবে বা তাদের তাড়িয়ে একদিকে বার করবে অর্থাৎ রীতিমতো রাজ-শিকারের বন্দোবস্ত হল! রাজারা যেমন লোকজন বাজনা-বাদ্যি নিয়ে শিকার করেন, আমাদেরও সেই ব্যবস্থা হল।

ভোর প্রায় চারটে নাগাদ আমাদের দল শিকারে বেরোল। মাঝে মাঝে এখান থেকে সেখান দু-একজন করে আমাদের দলে যোগ দিতে লাগল। তামাশা দেখবার জন্য ছেলে-ছোকরার দল অনেক পেছনে চলল। শেষ রাতের সেই প্রচণ্ড ভয়াবহ খাড়াই পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

দু-চারটে ভাল্লুকের গুহা এড়িয়ে (কারণ, সোজা খাড়াইর দরুন সেখানে পৌঁছোনো শিবের অসাধ্য) আমরা শেষে একটা অপেক্ষাকৃত কম খাড়াইয়ে একটা বিরাট গুহার

BanglaBoi.org

আস্তানা দেখলাম। মুহূর্তে পাকা শিকারির মতো আমরা চুপ করে দু-তিনটে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গেলাম। আমাদের ছোটো দলটি ক্রমশ এগিয়ে একেবারে প্রায় গুহার সামনে এসে পড়ল। ভাল্লুকের যে এটা একটা আস্তানা তাতে সন্দেহ নেই। ওখানকার স্থানীয় এক শিকারি বললে, ভাল্লুক গুহার ভেতরেই আছে— আপনারা গুলির আওয়াজ করুন, বেরুবে। এটা ভুল হল। গুহার ভেতরের অন্ধকার লক্ষ করে টম গুলি চালালে— সমস্ত নিস্তব্ধ পাহাড় কাঁপিয়ে তার ভয়াবহ গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি হল— আমরা সম্মুখ-সমরের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। গুহাটার দু-তিনটে ফাটল দিয়ে আমরা সতর্কে উঁকিঝুঁকি মেরেও কোনো ছায়া বা কোনো কায়া আবিষ্কার করতে পারলাম না। সেই ফাটলগুলো দিয়ে দু-চারটে গুলি ছোড়াও হল— গুলির ভীষণ শব্দে মনে হল— ভাল্লুকের বাবাও বেরিয়ে এল বুঝি! বেশ খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর— আর সময় নষ্ট করার আমার ও টমের ইচ্ছা হল না— কাছেই অন্য গুহা ও জঙ্গলের খোঁজে আমরা এগুতে লাগলাম। বলা বাহুল্য, এখানকার শিকারিরাই আমাদের পথপ্রদর্শক ছিল। প্রায় আধঘন্টা পরে এবার আমরা একটা খড়-এর ধারে এসে পড়লাম— জঙ্গলে ভরতি পাহাড়ের গায়ে গায়ে দু-চারটে গুহাও চোখে পড়ল। এবার আমরা কাজটা রীতিমতো গুছিয়ে করলাম। ঢোল বাজনার দলকে নীচে পাঠানো হল— লোক প্রায় পঞ্চাশ জন হবে— তাদের পাঁচ ছ-টা ভাগ করে নীচেকার জঙ্গলটা গোল করে ঘিরে ফেলতে বলা হল। গোলমাল চেঁচামেচি হইচই করে ক্রমশ এই দলটি ভাল্লুকগুলোকে তাড়িয়ে একটা বিশেষ দিকে নিয়ে আসবে ও সেই বিশেষ দিকে, যেখানে ভাল্লুক ভাববে তার একমাত্র পালাবার পথ; সেখানে আমরা বন্দুক বাগিয়ে লুকিয়ে বসলুম। আমাদের একটু দূরে গুরুদিৎ সিং তৈরি হয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হল, আক্রমণ করবার জন্যে সকলেই প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর দলের মধ্যে থেকে কে একজন বাঁশি বাজিয়ে দিলে— যেন ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হচ্ছে! সঙ্গেসঙ্গে ঢোল কাঁসার বিগ্‌ল ও গগনফাটা কান ঝালাপালা তুমুল চিৎকার— সে এক বিরাট কাণ্ড! কখনো যা আগে নিজের চোখে দেখিনি, বা নিজের কানে শুনিনি— সেসব দেখে শুনে আমার সমস্ত শরীর একটা ভয়ানক উত্তেজনায় ও রোমাঞ্চে কীরকম হতে লাগল। এ-রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা পূর্বে আমার জীবনে ঘটেনি। মনে হতে লাগল, ভাল্লুকের দল খেপে গিয়ে একেবারে হত্যাকাণ্ড না শুরু করে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলাম ও বাইরে আমার অভূতপূর্ব উত্তেজনার কিছুমাত্র প্রকাশ করলাম না।

টম পাশেই বন্দুক বাগিয়ে নিশ্চল স্থির দৃষ্টিতে একটা বিশেষ দিক লক্ষ করে বসে আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে সেও যেন উত্তেজিত হয়ে কী-একটা অস্ফুট শব্দ করছে। মিনিট কয়েক সে বিকট বাজনা কোলাহল চলল, ও তারপরই সেই হইচই-এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক প্রায় ৫০ গজ দূরে আমাদের সামনে দৃষ্টিগোচর হল। আমার সমস্ত শরীর যেন হিপনোটাইজড হয়ে গেল এবং মুহূর্তেই টমের বন্দুক ভীষণ শব্দে গর্জে উঠল— গুড়ুম, গুড়ুম! দু-বার, তিনবার— গুড়ুম! মনে হল দেখলাম যেন, ভাল্লুকটা আছড়ে মাটিতে সটাং হয়ে পড়ে গেল, পড়বার পর সামনের জঙ্গলের জন্য তাকে আর দেখা

BanglaBook.org

গেল না। এদিকে আমরা উঠতেও পারছি না। হয়তো ঝাঁপিয়ে আসবে ভাল্লুকটার সঙ্গী বা প্রতিবেশী দু-চারটে। গুলির আওয়াজের সঙ্গে বাজনা কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। একটা সর্দারকে ইঙ্গিতে আবার বাজনা বাজাতে শুরু করতে বলা হল। আবার সেই তুমুল গগনভেদি চিৎকার উঠল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল— এক দিকের লোকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে— যাক, বোধ হয় দু-একটা ভাল্লুক দু-এক জনকে জখম করে নিজের রাস্তা করে নিচ্ছে। শীঘ্রই আমাদের কাছে সে-দলের একটা লোক এসে পড়ল, দেখলাম গা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তবে এমন কিছু নয়। বুঝলাম, পালাবার সময় কোন পাথরখণ্ডে তার পা ঠুকে গিয়েছে। লোকটাকে কিছু বলবার তখন সময় নেই, আমরা সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির করে বসে রইলাম। আবার হঠাৎ বাজনা থেমে গেল— আর দুটো-তিনটে লোক নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগা—ভাগা—!' 'আরে কিধার ভাগা—কৌনসে গিয়া'—তার জবাব নেই, হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ। কিন্তু পরমুহূর্তেই কতকগুলো লোক হুড়মুড় করে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল! টম বসেই তাক করেছিল; ওদের কাণ্ড দেখে— উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, আমিও লোকগুলোর বোকামি বুঝলাম। চেঁচামেচি বন্ধ করাটা তাদের অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গিয়েছে— চেঁচামেচি করতে থাকলে ভাল্লুক কিছুতেই তাদের ব্যূহ ভেদ করে যেতে পারত না। আমাদের সামনের পালাবার একমাত্র রাস্তাতেই ভাল্লুককে আসতে হত। কিন্তু এর পরে অনেক কাণ্ড ঘটল, কোনো দল এদিকে নামে— কোনো দল ওদিকে ওঠে, তারপর আমরা ভাল্লুকের পেছনে, কি ভাল্লুক আমাদের পেছনে— তুমুল ছত্রভঙ্গের মধ্যে সব গোলমাল একাকার হয়ে গেল! হাঁপাতে হাঁপাতে আবার আমরা পূর্বেকার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। টম বললে, সেন, দেখলে এদের বোকামি! আমি হেসে বললাম, এদের ব্যাপারই ওইরকম টম, গরিলা যুদ্ধ, এরা নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজে নামতে জানে না। মাঝখান থেকে আমাদের নাকাল করে মারলে। আর আমরাও যে পাকা শিকারি নয় তাও বোধ হয় ওরা ধরতে পেরেছে! যাক, যেটাকে গুলি করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, সেটাকে দেখা যাক। এগিয়ে ঢালুতে একটু নেমে দেখা গেল, সেটা সত্যিই মরেছে। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা— তার চারটে মোটা পুরু থাবার তীক্ষ্ণ নখগুলো তখন বেরিয়ে বেঁকে শক্ত হয়ে আছে! গায়ের লোম বোধ হয় ৬ ইঞ্চি ঘন হবে— সুন্দর কালো নরম লোম। একটা গুলি বুকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আর একটা কাঁধ দিয়ে। সেখানটা রক্তাক্ত হয়ে আছে। টম বললে, সেন, আমাদের অনেক তপস্যার ফল এবং আমরা নিশ্চয় খুশি হয়েছি। কিন্তু বেটাদের বোকামি না থাকলে অন্তত আরও একটা আমাদের হাতে মরত। নেহাত ভাল্লুকগুলোর আয়ুর জোর ছিল।

তারপর প্রায় সমস্ত দিন আমাদের কাজে ঘুরেছিলাম, কিন্তু শিকার আর মেলেনি। এটা একটু আশ্চর্য লাগল— কারণ, শোনা গিয়েছিল সাপুর ভাল্লুকে ভরতি। তবে কি তারা আমাদের আসার গন্ধ পেয়ে রাত্রি থাকতেই সব দূরে দূরে সরে পড়েছে! যাহোক সন্ধ্যার সময় ক্লান্তিতে মরিয়া হয়ে আমরা তাঁবুতে পৌঁছোলাম। দুজনেই খিদেতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। মিশ্রিখান জানত— সে আমাদের জন্যে খাসা ডিনার

BanglaBook.org

তৈরি রেখেছিল।

পরের দিন ভোরবেলা পুঞ্চের উদ্দেশে পাহাড়ি ঘোড়ার পিঠে লটবহর নিয়ে আবার আমরা যাত্রা করলাম। সেদিন ছিল ২০ অগাস্ট। তারপর কাজের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়-পর্বত, নদী, জঙ্গল অতিক্রম করতে করতে পুঞ্চ হয়ে নিত্যনতুন জায়গায় তাঁবু ফেলতে ফেলতে আমরা ১৫ সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছোলাম। রাওয়ালপিণ্ডি এসে (যখন আমরা বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে চলেছিলাম) মনে হতে লাগল— যেন একযুগ পরে সুদূর আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার কোনো জঙ্গল থেকে আমরা এইমাত্র এক সভ্যজগতে এসে পৌঁছোলাম। সব কিছু— বাড়ি-ঘর, লোকজন আমাদের চোখে আশ্চর্য অস্বাভাবিক গোছের লাগতে লাগল। টম বললে, সেন, দেশে গিয়ে স্কটল্যান্ডের কোনো মাসিক কাগজে আমাদের পুঞ্চ-ভ্রমণ-কাহিনি আমি নিশ্চয় লিখব। আমি বললাম, আমিও টম, বাংলা দেশে কোনো মাসিক পত্রিকাতে একদিন সব লিখব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কোয়াড়ে ভালুক শিকার

বিজয়কান্ত সেন

অন্তরের চিত্রশালায় কত চিত্রই সঞ্চয় করে গেছি, তার কতক গেছে হারিয়ে, কতক-বা হয়ে এসেছে অস্পষ্ট ম্লান আর কতকগুলি রয়েছে প্রাঞ্জল রেখায় আঁকা। আমার ঘটনাবহুল জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সে আজ প্রায় ৪৩ বছর আগেকার কথা। চাকরিজীবনের আরম্ভে তখন আমার কর্মস্থল গিরিডিতে, সেটা ১৯১২ সাল। চঞ্চলা উশ্রী নদীর তীরের সেতুর কাছে উশ্রীভিলায় আমার বাসা বেঁধেছি। শিকারের শখ আমার কৈশোর থেকে, কিন্তু এখানে ঝোপঝাপ বা টুকরো জঙ্গল ছাড়া বড়ো জঙ্গল বলতে যা বোঝায়, তা কাছেপিঠে এক রকম নেই-ই বলতে গেলে। কার্যোপলক্ষ্যে নানা স্থানে আমায় সফরে যেতে হত। একদিন গাঁওয়া বলে একটি জায়গা থেকে সফর করে ফিরছি, নববর্ষার পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে, বনের ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গায় দেখি, একটা ময়ূর তার প্রকাণ্ড পেখম মেলে দিয়ে নাচছে, আর তারই কাছে আরও কতগুলো ময়ূর-ময়ূরী কেউ-বা খাবারের খোঁজে মাটি ঠোকরাচ্ছে, কেউ-বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচিত্র সবুজের মাঝে তাদের রামধনু রং রচনা করেছে বর্ণের ইন্দ্রজাল। কিছুক্ষণ থেমে প্রকৃতির নাটমঞ্চের এই দৃশ্য উপভোগ করলাম, তারপর চললাম এগিয়ে। গাঁওয়ার পথে কোয়াড় বলে একটা জায়গা পড়ে, গিরিডি থেকে মাইল এগারো হবে। এখানে রাস্তার উত্তর দিকে ১০০ গজ দূরে বেশ খানিকটা জায়গার উপর জেলা

BanglaBook.org

বোর্ডের একটি ছোটো বিশ্রামাগার (Inspection Bungalow)। রাস্তার অপর পারে ঢালু নেমে গেছে, মেঘলা আকাশের পটভূমিকায় ঘন সবুজ বনে ঢাকা একটি পাহাড়, তারই কোলে একটি ঝিল রাস্তা থেকে ২০০ গজ দূরে বর্ষার জলে ভরপুর। চারিদিকে পলাশের ছোটো ছোটো নতুন জল পেয়ে সবুজ সতেজ। জায়গাটি বড়োই মনোরম। স্থির করলাম দু-এক দিন ছুটি নিয়ে এখানে এসে কাটিয়ে যাব বাড়ির সকলকে সঙ্গে নিয়ে। সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, সামনের শনিবারই এখানে কাটাব মনে করে বাংলোর চৌকিদারকে সেই মতো বন্দোবস্ত রাখবার কথা বলে গেলাম।

মি. H. W. Williams I. C. S. তখন ওখানকার সাব-ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন। তাঁর কাছে একটা দিন ছুটি নিয়ে শুক্রবার দুপুরে আমি সপরিবারে রওনা হলাম কোয়াড়। আমি আমার দ্বিচক্রযান সাইকেলে, অন্য সকলে পুসপুসে। আমার বন্ধু গিরিডির শ্রীবিপিন চৌধুরীকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলাম। স্থির হল, পরদিন সে সাইকেলে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবে।

ওখানে পৌঁছে রাস্তার ওপারে হেঁটে বেড়াচ্ছি, দেখি একটি সাঁওতাল বিলের ওপারের বন থেকে বেরিয়ে রাস্তার অপর পারের বনের দিকে যাচ্ছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর নাম কী রে?' সে বললে, 'বড়কু মাঝি।'

'হ্যাঁ রে, এখানে শিকার মিলবে?'

'শিকার করবি? কী শিকার? এখানে আছে বই কী।'

'ভালুক মিলবে এখানে?'

'বনা? হ্যাঁ, মিলবে। তাও আছে।'

তার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম, পরদিন বেলা দু-টার সময় তার বাড়ি যাব, তারপর সে আমাদের নিয়ে যাবে শিকারে।

বিপিন এলে খাওয়াদাওয়া সেরে আগের দিনের কথামতো বিপিন ও আমি বেরিয়ে গেলাম সাইকেলে সেই সাঁওতালটির গ্রামের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে শুনি যে বড়কু মাঝি বাড়ি নেই, জঙ্গলে গেছে। কী করি, আমি আর বিপিন একটা গাছতলায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় আড়াইটার সময় মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে ফিরল বড়কু। 'আমরা সেই দুটোর সময় থেকে বসে আছি শিকারে নিয়ে যাবি বলে, আর তুই গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছিস বল তো?' বললাম আমি। সে জবাব দিল, 'আমাদের তো ঘড়ি নেই, কী করব বাবু, তা চল না এখনই নিয়ে যাচ্ছি।' বাড়িতে গিয়ে কাঠের বোঝা নামিয়ে লোকটি ফিরল, কাঁধে গামছা, হাতে একটা ছোটো লাঠি, তার সে-চেহারাটা আজও চোখের সামনে ভাসছে। সঙ্গে চলল তার ন-দশ বছরের ছেলেটি, কোনো বাধা শুনল না।

বসতি থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে জায়গাটা ঢালু নেমে গেছে, কিছু দূরে গিয়ে একটি ছোট্ট নদী পর্যন্ত। সেই নদীর ধারে যেতেই বড়কু তার ছেলেকে বলল, 'মা হিজু পে' (আর আসিস না)। সে দু-একবার আপত্তি করে ফিরে গেল। নদীর ওপারে বনের শুরু। আর সেই বন ও উঁচু-নীচু জমি থেকে এক-একটা নালা এসে এই নদীতে মিশেছে,

BanglaBook.org

কোনো কোনোটার-বা আছে জলের ধারা, আবার কোনো কোনোটা-বা যখন নামে জোর বৃষ্টির ধারা, তখন সেই জল বয়ে আনে, আবার বৃষ্টি থেমে যাবার খানিক পর তার ধারা যায় শুকিয়ে, রয়ে যায় শুধু সিক্ততা। নদী পার হয়ে এই রকম এক-একটা নালার ভেতর ঢুকে বড়কু পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়ে, একের পর এক দু-চারটে দেখার পরই একটাতে গোরুর খুরের দাগের মতো একটা দাগ একটু নিবিষ্ট মনে দেখল। প্রশ্ন করায় উত্তর দিল, 'শুয়োরের পায়ের দাগ, ওটা একোয়া শুয়োর।'

'পাওয়া যাবে ওকে?'

'যাবে, কিন্তু দেরি হবে।— তা তুই তো ভালুক মারবি, চল, তাই খুঁজি।'

সেখানেই আর একটু এগিয়ে মানুষের পদচিহ্নের মতো চিহ্ন; তাই দেখে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। পাঞ্জা চওড়া, লম্বায় খাটো, গোড়ালির কাছটা সরু, সামনের দিকটায় দু-একটা নখের দাগ। দাগটা ডান দিক থেকে এসে নালা পার হয়ে ধ্বসনা (যেখানটায় মাটি ধসে পড়েছে) দিয়ে বাঁ-দিকে উঠে গেছে। নরম মাটিতে তার পায়ের দাগের সঙ্গে নখের দাগ দেবে বসে গেছে। বড়কু সেই দাগ ধরে উপরে গেল, চারিদিক খুব ভালো করে দেখে নিল পদক্ষেপের বৈশিষ্ট্য এবং কত দূরে দূরে পড়েছে। আমরা কাছে যেতে আস্তে আস্তে বললে, 'বাবু, আমার জান তোর হাতে, মনে থাকে যেন।' আমি বললাম, 'আমাদের জান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।' তারপর সে মাটিতে চোখ রেখে অসমতল উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়ে চলতে লাগল। কী দেখে চলেছে সে-ই জানে। জিজ্ঞাসা করলে অসহিষ্ণুভাবে জবাব দেয়, 'দেখতে পাচ্ছিস না? এই তো।' একটা ভাঙা ঘাসের ডগা, কোথাও-বা একটু কাঁকর সরে গেছে এইসব দেখায়। আমরা সত্যি কথা বলতে, এসব মোটেই বুঝতে পারি না। ও না দেখিয়ে দিলে আমাদের চোখেও পড়ত না এসব চিহ্ন। তখনও আমি শিকারে অনভিজ্ঞ, শিক্ষানবিশ মাত্র, পদচিহ্ন দেখে জন্তুজানোয়ার চেনা বা তাকে খুঁজে বের করা এর আগে কখনো জানতাম না, দেখিওনি। এ একটা নতুন বিজ্ঞান, আর এ

বিজ্ঞানে আমার প্রথম গুরু বড়কু। নরম মাটিতে সচরাচর পায়ের দাগ দেখা যায়, কিন্তু শক্ত মাটিতেও যে পায়ের দাগ পাওয়া যায়, এ আমার জানা ছিল না, এই প্রথম দেখে বিস্মিত হলাম। এক ক্রোশ আন্দাজ গিয়ে আমাদের এক জায়গায় বলল, 'দাঁড়া তোরা, আমি ভালো করে খুঁজে আসি।' আমরা সেখানে দাঁড়ালাম। চারিদিকে ঝোপজঙ্গল, মাঝে

মাঝে শাল গাছের সার, এখানে-ওখানে দেখা যায় নালা। একটু পরেই বড়কু ফিরে এসে বলল, 'ভালুক আছে। যেমন অবস্থায় আছে তেমন অবস্থায়ই খুঁজে দেখিয়ে দেব, মারবি, না, তাড়িয়ে বার করে দেব?' বললাম, 'তোর সঙ্গে গিয়ে মারলে তো পেছন থেকে মারব, তা আমি চাই না, তার চেয়ে তাড়িয়ে সামনে বের কর।' বিপিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু কি আলাদা দাঁড়াবেন?' বিপিন সবে শিকার শিখছে, তাকে গাছের উপর উঠিয়ে দিলাম। জঙ্গলে ত্রিশ ফুট চওড়া একটা সোতীর (ছোটো পার্বত্য নদী) কিনারে একটা ছোটো ঝোপের আড়ালে সে আমাকে দাঁড় করাল। গা ঝোপের আড়ালে রেখে দাঁড়ালাম। ঝোপের উপর দিয়ে সারা সোতী ও ওপার দেখা যায়। আমার পেছন থেকে দশ-পনেরো ফুট দূরে একটা নালা এসে সোতীতে মিশেছে। পেছন থেকে বন ও উঁচু জমির জল এই নালা দিয়ে সোতীতে পড়ে। ওপারটা কিছুদূর পরিষ্কার, তার ঝোপজঙ্গল ক্রমে বনে গিয়ে মিশেছে। আমার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ডাইনে গাছে বিপিন।

আমায় বড়কু বলে গেল, ওপার থেকে ভালুক সোজা সোতী পার হয়ে আসবে। আমরা যেদিক থেকে এসেছিলাম বড়কু সেদিকে চলে গেল। বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাদে শুনলাম, ওপারের জঙ্গলের ভেতর ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে। দূরে গাছের গায়ে লাঠির আঘাত করলে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ। কখনো কাছে, কখনো দূরে; একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে; এইভাবে শব্দ চলতে লাগল। হঠাৎ দেখি, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক ঝোপের ভেতর দিয়ে আসছে নদীর দিকে, ঝোপের উপর তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় চারশো গজ দূরে হবে। সে আসছে চার হাতে-পায়ে, কিন্তু ঝোপের উপর তার মাথা দেখা যাচ্ছে। মস্ত ভালুক দেখে প্রাণে বড়োই আনন্দ হল। ভালুকটা সোজা এসে সোতীটা একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল, তারপর সোতীতে নেমে আমার সোজা পার হতে লাগল। মাঝামাঝি যখন এসেছে তখন বন্দুক তুলে গুলি করলাম। গুলি খেয়েই চিৎকার করে পড়ে গেল— সে কী বিকট চিৎকার, সারা বন কেঁপে উঠল তার চিৎকারে! আহত বাঘের গর্জনও ভয়ংকর, কিন্তু এ যেন তাকেও অতিক্রম করে। ভালুকটা পড়ে যাবার পরই চক্ষের নিমেষে উঠে তেড়ে এল আমার দিকে, যাকে বলে চার্জ করল। আবার একটা গুলি করলাম, সেটা তার পেছনের বাঁ-পায়ে লাগল। প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে তখন জন্তুটা। আবার গুলি করলাম, কিন্তু এ গুলিটা লাগল না; কিন্তু না লাগলেও এই গুলিটাই আমাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল। অত কাছ থেকে গুলি করার জন্য ভালুকটা যেন বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমাকে এড়িয়ে পাশের নালাটিতে ঢুকে পড়ল। ছুটে তার পিছু নিতে গিয়ে আমার বুকপকেট থেকে কতগুলো টোটা পড়ে গেল। সেগুলো কুড়িয়ে পকেটে পুরেছি, এমন সময় বড়কু মাঝি এসে বলল, 'ভালুক কই?'

আমার কাছে সব শুনে বড়কু বলল, 'এই বন্দুক নিয়ে শিকার করতে এসেছিস? যদি মেরে যেত?' আমি দৃঢ়ভাবে বললাম যে, ভালুক নিশ্চয়ই মরবে। সে তখন প্রথমে যেখানে ভালুকটা পড়েছিল সে-জায়গাটা ও তারপর থেকে যা চিহ্ন ছিল পরীক্ষা করে

BanglaBook.org

এল। আমায় সহসা প্রশ্ন করল, 'ফেপসায় (lungs) মারলি কেন? পেছনের বাঁ-পায়েও লেগেছে, পা-টা ভেঙে গেছে।' গুলি যে ফুসফুস ও পায়ে লেগেছে তা ও কী করে জানল? আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কিন্তু প্রশ্নের সময় সে নয়, ভালুককে মারা চাই-ই। বললাম, 'ভালুকটাকে শেষ করে আসি চল।' আমার অস্ত্রের উপর তার আর বিশ্বাস নেই। বললে, 'তোমার এই বন্দুক নিয়ে পারবে? যদি ফিরে দাঁড়ায়, বন্দুকসুদ্ধ তোমাকে খতম করে দেবে।' তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, গুলি যে জায়গায় লেগেছে তাতে সে মরবেই; তিলে তিলে মরার চেয়ে নিজেই তাকে শেষ করে দিতে চাই। তবু সে বার বার বলল, 'ও বন্দুক নিয়ে শিকার করা কোনোমতেই উচিত নয়। মনে বড়ো দুঃখ হল, দামি বন্দুক, অনেক শখ করে বিলেত থেকে আনিয়েছি। এই 333 Cordite Magazine rifle, Jeffry কোম্পানি অল্প দিন আগে বার করেছে। এই রাইফেল-এর জন্য যখন বিলেতে অর্ডার পাঠাচ্ছি, তখন প্রসিদ্ধ শিকারি মুক্তাগাছার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে আমার একটু আলোচনা হয়েছিল, এখানে তার পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবু তখন হাজারিবাগে আমার প্রতিবেশী ছিলেন। এই রাইফ্‌ল্‌ আনাবার ইচ্ছা তিনি সমর্থন করেননি। বলেছিলেন, 'যদি একটা ছুঁচ বিদ্যুৎ-বেগে আপনার হাতের ভেতর ঢুকে ভেঙে যায় তবে বেশি আঘাত খাবেন, না, একটা বড়ো ঢেলা আপনার হাতের উপর তার চেয়ে কম বেগেও লাগে তবে বেশি আঘাত লাগবে?' দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা বলেছিলেন।

তাঁদের ওদিকে গারো পাহাড়ে মাঝে মাঝে ওঁরা হাতি খেদা করতেন। একবার খেদা করবার সময় একটা দাঁতাল হাতি খেপে গিয়ে খেদার বেড়ার উপর বার বার আক্রমণ করতে লাগল। কোনোরকমে তাকে ঠেকানো যায় না। শেষকালে এ-রকম হল যে, বেড়া প্রায় ভেঙে যায়। ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবু তখন বেড়ার উপর থেকে 450 Cordite Express দিয়ে তাকে গুলি করলেন। একটু থমকে গেল বটে কিন্তু পড়ল না, মরিয়া হয়ে দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করতে লাগল। আরও একটা গুলি করা হল, তবু কাজ হল না। তখন ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবুর পিতার আমলের একজন প্রাচীন শিকারি বলল, 'আজ্ঞে কর্তা, ও বন্দুকে কী হবে? তোমার বাবার আমলের যে বন্দুক আছে, তাই এনে গুলি করো।' তার কথামতো ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবু 8 bore black powder rifle দিয়ে গুলি করলেন। বললেন, 'ধপ করে গুলি গিয়ে লাগতেই হাতিটা পড়ে গেল। একবার ওঠবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পারল না; আবার পড়ে গেল আর উঠল না। আমার মনে হয়, আপনি বড়ো বোরের রাইফ্‌ল আনলে ভালো করতেন।' পরের জীবনে অবশ্য এর সত্যতা যথেষ্ট উপলব্ধি করেছি।

ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবুর কথাটা আমার মনে পড়তে লাগল, কিন্তু শিকারের নেশা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। ভালুকটাকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতেই হবে। জিদ করায় বড়কু রাজি হল এবং যে নালার ভেতর দিয়ে ভালুক অদৃশ্য হয়েছিল সেই নালায় ঢুকল এবং সঙ্গে আমরাও চললাম। বড়কু আগে তার ঠিক পেছনেই রাইফল নিয়ে আমি। হঠাৎ নালা ছেড়ে সে বাঁ-দিকের উঁচু জমিতে উঠল, যদিও কোনোরকম চিহ্ন আমাদের

BanglaBook.org

চোখে পড়ল না। খুব সন্তর্পণে চলেছে, যেন জানোয়ারটা কাছেই কোথাও আছে। প্রশ্ন করতে গেলে অধীর হয়ে চুপ করতে ইঙ্গিত করে। প্রায় দু-শো গজ এইভাবে যাবার পর রক্তের দাগ পেলাম। কী কৌশলে যে short cut করে সে আমাদের নিয়ে এল সে-ই জানে! এমনি করে আরও দু-একবার short cut করে এক নালার মধ্যে ঢুকলাম। কিছুতেই আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী করে তুই এদিক দিয়ে এলি?' সে একটু কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'বাঁ-পায়ে গুলি লেগেছে, কাজেই সে-পায়ে জোর কম এবং চলতে গেলে ডান দিকটাই সহজে বেশি চলবে এবং জানোয়ারটা ক্রমে বাঁ-দিকে ঘুরে যাবে।' সত্যিই তো! কিন্তু ও বলার আগে কথাটা একবারও মনে হয়নি আমার। মনে মনে ভাবলাম, একেই জঙ্গলের তীর্থগুরু করব। পদচিহ্ন দেখে জন্তুজানোয়ার অনুসরণ করা, যাকে বলে ট্র্যাকিং, তার উপর সেই আমার অসীম শ্রদ্ধা এনে দিল। পরে এই বিষয়ে যতটা পারদর্শিতা লাভ করি তার গোড়াপত্তন এইখানে।

নালা ধরে যেতে যেতে হঠাৎ এক বাঁকের মুখে ঢুকেই বড়কু পিছু হটে এসে আমাকে সামনে এগিয়ে দিল। আমি বাঁক পার হয়েই দেখি, আহত ভালুকটি হাঁপাচ্ছে আমাদের দিকে পিছন করে। সঙ্গেসঙ্গে গুলি করলাম, গুলি লাগলও, কিন্তু সে পড়ল না; মৃত্যুর বিরুদ্ধে যেন তীব্র প্রতিবাদ করে ধ্বসনা দিয়ে উপরে উঠে গেল। অদ্ভুত প্রাণ! অশেষ এদের প্রাণশক্তি। কিন্তু ক-বারের ব্যর্থতায় আমার জিদ বাড়িয়ে তুলল, মাথায় যেন খুন চেপে গেল আমার। আমি বললাম, 'ঢিল মেরে বার করে দে, ওকে আজ মারবই।' লোকটি অগত্যা আমাদের নিয়ে উপরে উঠে এল। ভালুককে চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আট-দশ গজ দূরে তার জোর জোর নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। দিনশেষের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। বড়কু একটা গাছে উঠে চুপি চুপি জানাল, সেখান থেকে আহত ভালুকটিকে দেখা যাচ্ছে। আমরা সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালাম, আমি বাঁ-দিকে, বিপিন ডাইনে। বড়কু গাছ থেকে পাথর ছুড়তে লাগল ভালুকটার আশপাশে। বিপিনের ভাগ্য ভালো; ভালুক ওর দিক দিয়েই বেরোল। বিপিন তখনই গুলি করল, তাতে ভালুকটি একটু দূর ছুটে গিয়েই পড়ে গেল। কাছেই একটা শাল গাছ ছিল যার ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি আন্দাজ হবে। তার নিষ্ফল প্রতিহিংসার নিদর্শনস্বরূপ রুদ্ধ আক্রোশে সেই গাছটিকে এক কামড়ে দু-খানা করে দিল। আমরা কাছে গিয়ে দেখি, শেষ হয়ে গেছে। পরে বহু শিকারের সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু এতবড়ো ভালুক আর কমই দেখেছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভালুকের কবলে

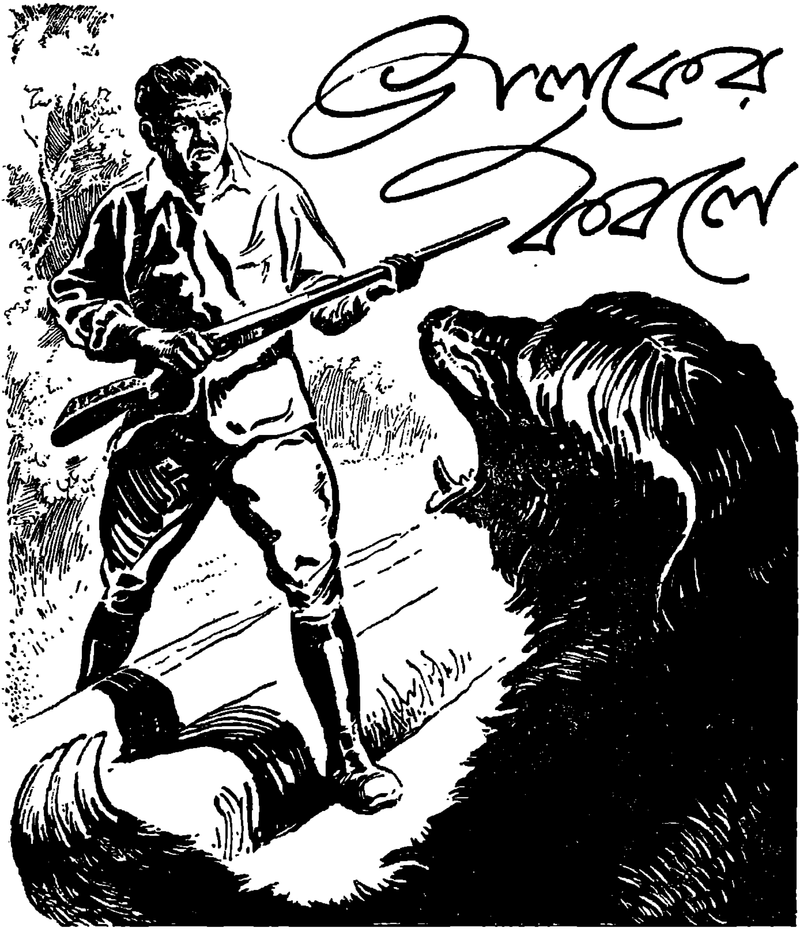

সূর্যকান্ত আচার্য

গল্প করিতে করিতে আমরা বৈতরণী নদী উপম ছিট্‌গড়ের সম্মুখীন হইলাম। মাহুতগণ 'আল্লা আল্লা' ধ্বনি করিয়া কণ্টকাকীর্ণ সূচীদুর্ভেদ্য ছিট্‌গড়ের মধ্যে হাতী প্রবেশ করাইল। গাঢ় ঘন অটবী; চতুর্দিকে স্তূপে স্তূপে অন্ধকার; কাঁটা, ডালপালার ও লতার ভয়ে আমরা শঙ্কিত চিত্তে হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া আছি। হাতী কোথায় যাইতেছে, কোন দিকে টানিয়া নিতেছে, কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না— অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার! কেবল মাঝে মাঝে মাহুতগণের মার-মার, ধর-ধর, শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হাতীর জঙ্গল ভাঙার মড়-মড়, কড়-কড় বিকট শব্দ শোনা যাইতেছে। আর ক্বচিৎ কোথাও দুই-একটি ঘুঘু পাখী শব্দাতঙ্কে

BanglaBook.org

শঙ্কিত হইয়া, সভয়ে সরসর করিয়া কুলায় হইতে উড়িয়া পলাইতেছে, এই অনুভব হইতে লাগিল। এই অটবীকেই বৈতরণী বলিয়াছি। এই বৈতরণী পার হইতে না পারিলে আর সেই স্বর্গস্থান— শিকারভূমিতে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় পথ নাই। অনেক হুড়াহুড়ী, অনেক ধস্তাধস্তির পর বিক্ষত না হইলেও, ক্ষত দেহে ছিট্‌গড়ের বাহির হইলাম। 'দুর্গা' বলিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হাতীগুলি গুরুতর শ্রমের পর ফস্‌ফস্‌ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। মাহুতগণ 'আল্লা-রসুল' বলিয়া বিরাম লাভ করিল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় হাতী, জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। গায়ের কোট, হাতীর গদী ভালরূপে ঝাড়িয়া-পুছিয়া আমরা দৃঢ়রূপে প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। ফরাজী মিঞার হাতী, আমার হাতীর নিকটে আসিল, এবং আমাকে আরও একটু অগ্রসর হইতে বলিল। কিছু সম্মুখে যাইয়াই দেখিতে পাইলাম, এক পল্লবিত শাল গাছের একটি ঝোপের মধ্যে শৃঙ্গধারী তরুণ বয়স্ক একটি সুন্দর গাউজ দাঁড়াইয়া আছে। আমি স্পষ্ট উহার সর্বশরীর দেখিতে পাইলাম, বাবুর হাতীও পাশে ছিল। জানি না, আমি কেন নিজে গুলি না করিয়া বাবুকে হরিণটি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দিলাম। বাবু অমনি বন্দুক উঠাইয়া 'ধা' করিয়া উহার উপর গুলি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ধীরতাসহ লক্ষ্য না করায় (excited হওয়ায়) উপযুক্ত স্থানে গুলি বিদ্ধ না হইয়া, উহার পিছনের এক পায়ে গুলি লাগিয়া গাউজটি খোঁড়া হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। বাবু উহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। আমরা আর অগ্রসর হইলাম না, অল্পক্ষণ পরেই কিছু দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল এবং অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, গাউজ পড়িয়াছে, হরিণ-সম্মুখে করিয়া বন্ধুবর দণ্ডায়মান। গাউজটি হাতীতে উঠাইয়া বাবুকে ধন্যবাদ এবং উৎসাহ দিতে দিতে আমরা পুনরায় শিকারের উদ্দেশে বাহির হইলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, অনতিদূরে একটি বিলের মত স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হইল। খুজী মিঞাকে জিজ্ঞাসা করায় সেও উহাকে একটি বিল বলিয়াই নির্ণয় করিল, অধিকন্তু বলিল, ঐ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বন্য মহিষ থাকে, ওখানে গেলে পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। মহিষের কথা শুনিয়া অন্যান্য হাতী পশ্চাতে রাখিয়া ধীরে ধীরে আমরা বিলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবং কতকটা নিকটবর্তী হওয়া মাত্র দেখিতে পাইলাম, অন্যূন পঞ্চাশ কি ষাটটি মহিষ জল হইতে উঠিয়া আমাদের দিকে একবার চাহিয়া, এক লাইনে (একটির পাছে, অন্যটি) জঙ্গলাভিমুখে চলিল। কর্দমাক্ত মহিষপাল দেখিয়া বোধ হইল, যেন একখানা চলন্ত মাটির দেয়াল আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে। এই তামাসা দেখিতেছি, ইতিমধ্যে মহিষপাল বন্দুকের 'পাল্লা' ছাড়াইয়া অনেকটা দূরে যাইয়া পড়িল, সুতরাং আর উহাদের উপর আওয়াজ করা হইল না। এ যাত্রা মহিষের তামাসা দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম, আবার লাইন করিয়া হরিণের উদ্দেশে চলিলাম। পথে শিকারীগণ দুইটি হরিণ শিকার করিল, বাবুও আর একটি জাত-হরিণ মারিলেন। আজ তাঁহার বিলক্ষণ সুযাত্রা। দুই-দুটা শিকার, বড়ই স্পর্ধার বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা যাইতেছি, পথিমধ্যে একটি ঝোপের আড়ালে ছোট খাটুয়া হরিণ আমার 'শিকারী ছোক্‌রার' নজরে পড়িল, সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে ঐ হরিণটি দেখাইল। আমি ছর্‌রা (buck-shot) নিক্ষেপ

করিলাম, হরিণটি তাহাতে না পড়িয়া, খোঁড়া হইয়া ছুটিতে লাগিল। তখন বেলা অধিক হইয়াছে, প্রখর সূর্যের তাপ! টিফিনের নিমিত্ত আমরা ছায়ার অনুসন্ধান করিতেছি, দূরে এক প্রকাণ্ড বটগাছ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই স্থানেই বিশ্রাম করা হইবে, বটগাছের নিকটে একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে একথা খুজী সাহেব বলিলেন। আমরা ঐ বটগাছ

লক্ষ্য করিয়াই হাতী প্রধাবিত করিলাম। আমরা যখন উক্ত বটগাছের সম্মুখীন হইয়াছি, তখন দেখিতে পাইলাম, আমার আহত হরিণের ন্যায় একটা ছোট হরিণ ঘাসবনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দৌড়াইয়া পলাইতেছে। আমাদিগকে ঐখানেই নামিতে হইবে, সুতরাং আমি তাড়াতাড়ি হাতী হইতে নামিয়া 'জলদ্ কদমে' হরিণের পাছে ছুটিলাম। ভরসা, উহাকে সহজেই শিকার করিয়া আনিতে পারিব। কিন্তু যখন উহার অনুসরণ করিলাম, তখন আর হরিণ দেখিতে পাই না। সম্মুখে কাঁটা শালগাছের একটা প্রকাণ্ড 'টাল' দেখিতে পাইয়া ভাবিলাম, উহার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে কোথায় হরিণটি আছে, তাহা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিব। উহার উপরে উঠিলাম—

"সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ,
কালচক্রে ঘোরে পদে পদে,
তাহার মাঝেতে নর, করে বাস নিরন্তর,
শৃঙ্খলেতে যথা চতুষ্পদ।"

বিপদ মানুষের পদে পদে! বিপদ-আপদের সমষ্টি লইয়াই মানব জীবন! কখন কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না, কি বুঝিতেও পারে না, কারণ তখন বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটে!

আমি যেমন ঐ শালগাছের টালের উপর উঠিলাম, ও সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আত্মা কাঁপিয়া উঠিল, দেখিলাম কিনা, এক প্রকাণ্ড ভালুক ঐ স্তূপের আড়ালে ছায়াতে শায়িত, আমাতে উহাতে ব্যবধান অনুমান আট কি দশ হাতের অধিক হইবে না। যেমনি আমি টালের উপরে উঠিয়াছি, অমনি বিকট গর্জন করিয়া ঐ জঙ্গলভূমিকে কম্পিত করিল এবং লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইল। নিরুপায়! তখন যদি পলাইতে চেষ্টা করি, নিশ্চয় আক্রমণ করিবে, সে আক্রমণ নিবারণের উপায় আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না! স্তূপ হইতে নামিলে ভালুকের হাতে মৃত্যু নিশ্চয়! ভালুক দুই পায়ে ভর করিয়া, ঠিক মানুষ যেমন দাঁড়ায়, তদ্রূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্বক চীৎকার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি অনুপায় হইয়া খুব জোরে 'চুপরাও' বলিয়া তাহার চীৎকারের প্রতিজবাব দিলাম। টিফিনের স্থান এখান হইতে বড় বেশী দূরে নহে, উদ্দেশ্য, ভালুকের গর্জন এবং আমার চীৎকার শুনিয়া বন্ধুবর অন্যান্য লোকসহ নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে আসিবেন। কিন্তু হায়! এই দুঃসময়ে কেহই আসিল না, কেহই আমার এই বিপদের সাথী হইতে অগ্রসর হইল না!

ভালুক ক্রমে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল, পুনঃপুনঃ কর্কশ গর্জনে বনস্থলী প্রকম্পিত করিল। আমি পুনরায় 'চুপরাও' বলিয়া ধমক দিলাম। তাহাতে মাত্র দুই-তিন পা পশ্চাতে হটিল। স্থির করিলাম, ভালুক আমার সহিত খেলা করিতে আসে নাই, আমি তাহার খেলার দোসর নহি; সে দুর্দান্ত, আমি শান্ত, সে আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইবে না।

বন্দুক লইয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইলাম। পকেট হইতে দুইটি গুলির কার্তুজ বাহির করিয়া বন্দুকে পুরিলাম এবং সতর্কতার সহিত ভালুকের গতিবিধির উপর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এখানে বলা প্রয়োজন, বাঘ-ভালুক কর্তৃক কেহ আক্রান্ত হইলে, চক্ষের উপর তাহার স্থির লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য; প্রবাদ আছে, 'বাঘ-ভালুকের চারি চক্ষে লজ্জা'—এ

BanglaBook.org

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, ঠিক।

ভালুক এইবার সতেজে আমাকে যেমনি আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, তাহার বুকের সাদা স্থান লক্ষ্য করিয়া, অমনি আমি গুলি করিলাম— এক গুলিতেই ভালুক ওলট পালট খাইয়া ধরাশায়ী হইল। আমি ভগবানের মহিমাকে ধন্যবাদ দিয়া লম্বা কদমে টিফিনের স্থানে উপস্থিত হইলাম। আর আনুপূর্বিক ঘটনা বাবুর নিকট বিবৃত করিয়া তাঁহাদের ভীরুতায় ধিক্কার দিতেও ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু সকলেই আমার সংকটাপন্ন অবস্থা এবং ভালুকের চীৎকার শুনার বিষয় একস্বরে অস্বীকার করিলেন। আমিও তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া লইলাম। ভালুক আনিতে হাতী পাঠাইয়া টিফিনে বসিলাম। বেলা প্রায় অবসান, শিকারও যথেষ্ট হইয়াছে, অতএব তাঁবুতে ফেরাই সেইদিন স্থির করা হইল।

(বানান অপরিবর্তিত)

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাজ বহরী

হিতেন্দ্রমোহন বসু

পাখি দিয়ে শিকার করা এক অতি প্রাচীন শিকার পদ্ধতি; প্রাচ্যেই এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। তিন হাজার বছর আগেকার একটা পাথরে খোদাই করা লিপি থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ায় তখন এইরকম শিকার করা হত।

প্রাচীন ভারতে এবং চীন দেশেও শ্যেনের সাহায্যে শিকারের প্রচলন ছিল। 'শ্যৈনিক-শাস্ত্র' পাঠ করলে নানা জাতের বাজবহেরীর বিষয়ে জানা যায় এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে, মৃগয়ায় শিকারী শ্যেনের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক খবরও পাওয়া যায়। পরে মধ্য-যুগে, এদেশে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইরান, আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ার বাজবহেরী খেলোয়াড়দের কায়দা এবং অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ-পরিচয় ভারতবাসীরা পেতে লাগল। মনে হয়, মুসলমানদের এদেশে আসার পরে বাজবহেরী খেলার শখটা বেশি ছড়িয়ে পড়ে।

বন্দুকের ক্রমোন্নতি এবং সহজলভ্যতার ফলে এই শখ কমতে থাকে। কিছুদিন আগেও বড়ো বড়ো করদ রাজা-মহারাজাদের শিকারি বাজবহেরী পোষার একটা রেওয়াজ ছিল। এখন তাদের রাজত্বলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শখটাও লোপ পেয়েছে এবং অধুনা শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এই শখ আর নেই বললেই চলে। তবে খুঁজলে, দু-একজনের সাক্ষাৎ মিলতে পারে। একজনের কথা বলতে পারি, তিনি হচ্ছেন মদীয় অনুজ শ্রীমান কার্তিক বসু। বাংলাদেশের নিপুণ ও সুখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়।

যাঁরা গিরেবাজ পায়রা পোষেন, তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়, 'শিকরেতে পায়রা নিয়েছে।' এসব ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, শিকরে বলতে তাঁরা যে পাখিটাকে বুঝছেন, সেটা বহেরী জাতের পাখি (Peregrine)। শিকরে বলে যে পাখি আছে তার কর্ম নয় পায়রা ধরা। বিশেষ করে উড়ন্ত পায়রা ধরা।

জংলি অবস্থায় শিকরে পাখি বড়ো একটা পাখি ধরে খায় না— এক চোট-খাওয়া পাখি বা পাখির বাচ্চা ছাড়া। ইঁদুর, গিরগিটি, ব্যাং এই সবই এর শিকার ও খাদ্য। তবে, মানুষের হাতে পড়ে সে পাখি শিকারের কায়দা শেখে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস আর সাহসও বেড়ে যায়। একটা শেখানো শিকরে একবার শিকারের সময়ে জঙ্গলে হারিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তার কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। শিকরের মালিক ছুটিতে বিদেশে এসেছিলেন, শিকরে নিয়ে শিকারের অভিপ্রায়ে। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে তখন, তিনি শিকরে ত্যাগ করেই ফিরলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে। চার-পাঁচদিন পরে, সেই শিকরেকে দেখা গেল সেই বাড়ির বাগানে, যে বাড়িতে শিকরের মালিক মাসখানেক কাটিয়েছিলেন তাঁর শিকরে নিয়ে। তার একটা পায়ে তখনও ফিতের 'বেড়ি' বাঁধা রয়েছে, অপরটা সে দাঁতে কেটে ফেলে দিয়েছে।

বাড়ির গায়ে-লাগা একটা আম গাছে বসে সেটা টিঁউ-টিউ করে ডাকতে লাগল। শিকরের মালিকের পরিবারের কেউ কেউ তখনও ওই বাড়িতে বাস করছিলেন। তাঁদের সবাই চিনতে পারলেন শিকরেটাকে। বাগানে যে-কটা পাখি দেখতে পেলে, সবকটার পেছনে ধাওয়া করতে লাগল সেই শিকরেটা। কিছুক্ষণ পরে, বাড়ির পোষা মুরগিগুলো ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করেছে শুনে বাড়ির লোকেরা বাগানের দিকে নজর দিলেন, দেখতে পেলেন, একটা মুরগিকে শিকরেটা আঁকড়ে ধরে আছে, মুরগিটা ছোটাছুটি করছে আর চেঁচাচ্ছে। সবাই মিলে তাড়া দিতে শিকরেটা ছেড়ে দিলে মুরগিটাকে, কিন্তু

BanglaBook.org

মুরগিটা তার কিছু পরেই মারা যায়। শিকরের বড়ো বড়ো নখওলা আঙুলের পেষণে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল মুরগির পিঠের দিকটা।

যত্ন করে শেখানো শিকরে, তাই মুরগির মতো বড়ো বড়ো পাখিকেও ধরতে ইতস্তত করেনি, কিন্তু একটা জংলি শিকরে ওরকম হামলা করবে না।

শিকরে : ছোটো জাতের পাখি; লম্বায়-চওড়ায় একটা পাপিয়ার মতো। ভালো করে শেখালে এরা অপেক্ষাকৃত বড়ো পাখি ধরে ফেলে। তবে দ্রুতবেগে উড়তে পারে না। শিকারের (যে পাখিকে শিকার করা হবে) কাছে গিয়ে, হাতে মুঠো করে ধরে (যেমন করে পায়রা ধরা হয়) শিকারের দিকে শিকরে পাখিকে ছুড়ে দেওয়া হয়। এই ছোড়ার কায়দাটা আয়ত্ত করতে পারলে, শিকার আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার বা উড়ে পালিয়ে যাবার আগেই শিকরে উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের উপরে, আর তার বড়ো বড়ো নখওলা অত্যন্ত শক্তিশালী পাঞ্জার চাপে শিকারকে কাবু করে ফেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই।

বাশা : শিকরেরই কাছাকাছি একটা জাত, শিকরের চেয়ে অনেক দ্রুতগামী এবং কিছু বড়ো পাখি। শিকরের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার করে না, আর তাকে মুঠো করে ধরে ছুড়ে দিতেও হয় না। এরা শিকার করে মালিকের হাত থেকে উড়ে শিকারকে সোজাসুজি শূন্যে তাড়া করে। বটের ও ঘুঘু এরা ধরে ফেলতে পারে, যদি শিকারের কাছে গিয়ে এদের ছাড়া যায়। কদাচিৎ তিতিরও শিকার করে। তবে, এদের দম খুব বেশি নয়। আন্দাজ এক-শো গজের মধ্যে শিকার ধরতে পারলে তো ধরলে, নতুবা পিছু ধাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিকটের কোনো একটা গাছে আশ্রয় নেয়, বিশ্রামের জন্য।

কথায় বলে ‘শ্যেনদৃষ্টি’। বাস্তবিক শ্যেনজাতি অন্তর্ভুক্ত পাখিদের দৃষ্টি খুবই প্রখর— বিশেষ করে বহেরী গোষ্ঠীর পাখিদের। এরা আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ে উড়েও খেতের পাখির চলাফেরা লক্ষ করে। সাধারণত এবং মোটামুটিভাবে, বাজ-খেলোয়াড়েরা শ্যেনজাতীয় পাখিদের দু-ভাগে বা জাতে বিভক্ত করেন। বহেরী জাতের পাখিদের বলেন ‘লম্বা ডানার পাখি’ (falcons), আর বাজ জাতের পাখিদের বলেন, ‘ছোটো ডানার পাখি’ (hawks)। লম্বা ডানার পাখিরা উড়তে পারে অনেক জোরে আর অনেকক্ষণ ধরে; আর এরা শিকার করে শূন্যে ছোঁ মেরে, পেছনের আঙুলের বৃহৎ নখ দিয়ে উড়ন্ত শিকারের পিঠ ফেড়ে দিয়ে। তবে, ছোটোপাখি হলে, দু-পায়ের নখ বসিয়ে উড়ন্ত শিকারও ধরে। ছোটো ডানার পাখিরা (বাজ, বাশা ইত্যাদি) কেবল বৃহৎ নখওলা পাঞ্জার পেষণের জোরেই শিকারকে কাবু করে। এদের পাঞ্জায় অসাধারণ শক্তি।

লম্বা ডানার পাখিদের মধ্যে সেরা পাখি হল ‘বহেরী’ আর ছোটো ডানার পাখিদের মধ্যে সেরা হল, ‘বাজ’। বাজের পাঞ্জায় বাস্তবিকই অসাধারণ শক্তি। যদিও ‘পাঞ্জা’ কথাটা ব্যবহার করছি, তবুও একথাটা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, পাখিদের পায়ে পাঁচটা আঙুল থাকে না। বড়োজোর একটা কাঁটার মতন থাকে ঠ্যাঙের পেছন দিকে।

‘ছোটো ডানা’র বাজ আর ‘লম্বা-ডানা’র বহেরী, এরা নিজের নিজের জাতের মধ্যে

BanglaBook.org

শ্রেষ্ঠ শিকারি। তাই লোকে বলে, 'বাজ-বহেরী' বা চলতি কথায়, বাজ-বউরী।

বহেরী : বহেরী দিয়ে শিকারের কায়দাটা অনেকটা এইরকম : শিক্ষিত বহেরীকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আকাশে বহেরী উড়ছে, ক্রমশ উপরে উঠছে। উঠতে উঠতে এত উঁচুতে উঠেছে যে, প্রায় বুঁদ হয়ে গিয়েছে। লম্বা লম্বা চক্কর দিচ্ছে; নীচে বিস্তৃত প্রান্তর; মাঝে মাঝে দু-চারটে ঝোপ আর ঘাসের জঙ্গল। উপরে শিকারি শ্যেনকে দেখে মাঠের সমস্ত পাখি ঝোপেঝাড়ে ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়েছে— আর বহেরীর মালিক চলেছে ওই ঝোপঝাড় জঙ্গল পিটতে পিটতে। ফলে, হয়তো একটা পাখি তাড়া খেয়ে উড়ল আকাশে— সঙ্গেসঙ্গে বহেরী উপর থেকে বিদ্যুদ্‌গতিতে মারলে ছোঁ, আর তার পিছনের আঙুলের লম্বা নখ দিয়ে তাড়া খাওয়া পাখিটার পিঠ ফেড়ে দিলে।

সাধারণত তিতির শিকার এই পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। তবে, তিতিরের কৌশলের কাছে মাঝে মাঝে বহেরীকে হার মানতে হয়। দেখা গেছে, আকাশে বহেরী দেখামাত্র তিতির ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়ে, কিংবা একেবারে নিঃসাড় হয়ে পাথর বনে যায়; সাধ্য কী তখন তাকে খুঁজে কেউ বার করে। অদ্ভুত ক্ষমতা, বলতেই হবে। যা হোক, তিতিরকে ওড়াতে পারলে, তবেই তাকে বহেরী দিয়ে শিকার করানো সম্ভব। তাই লাঠি দিয়ে পিটে পিটে বা শিকারি কুকুর দিয়ে জঙ্গল ভাঙিয়ে ঝোপঝাড় থেকে তাকে ওড়ানো হয়; আর তখনই সেই তিতিরের উপর বহেরী ছোঁ মারে এবং তার দু-পায়ের পেছনের আঙুলের বৃহদাকার নখ দিয়ে তিতিরের পিঠটা একেবারে ফেড়ে ফেলে। কখনো-বা তিতিরকে শূন্যেই ধরে ফেলে বহেরী তার পাঞ্জা দুটো দিয়ে, আর ঘুরতে ঘুরতে প্যারাসুটের মতন মাটিতে নেবে আসে।

আবার মালিকের হাত থেকে উড়ে ধাওয়া করে শিকার ধরার কায়দাও শেখানো হয় বহেরীকে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও বহেরী চক্রাকারে উড়ে শিকারের ঊর্ধ্বে ওঠে, তারপর সুবিধা বুঝে উপর থেকে ছোঁ মারে।

কালিজ : (Black Pheasant) বা ওই গণের পাখি এই পদ্ধতিতে শিকার করানো হয়। বহেরীকে (বা বহেরী গণের অন্যান্য পাখিকে) পোষ মানানোর সময় চোখ-ঢাকা টুপি পরানো হয়, নতুবা সে ভয় পেয়ে ঝটপট করতে থাকে আর নানা রকমের চোট খায়। পোষ মানার সঙ্গেসঙ্গে টুপিটা মাঝে মাঝে খুলে দেওয়া হয়। যখন তাকে শিকারে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাকে টুপি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক শিকারের জন্য তাকে ছাড়ার পূর্বে তার টুপি খুলে দেওয়া হয়।

বহেরী যে গণের পাখি, সেই গণ-অন্তর্ভুক্ত একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো পাখি (একটা পায়রার মতন)। শিকারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের নাম 'তুরমতী'। এরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওড়ে এবং সহজেই পোষ মানে। এদের দিয়ে বটের ও গুঁড়ুর জাতীয় ছোটো ছোটো পাখি শিকার করানো হয়।

শ্যেন জাতীয় সমস্ত পাখির শিকার পদ্ধতি লেখা এখানে সম্ভব নয়। সামান্য বারো-তেরো ইঞ্চি শিকরে থেকে আরম্ভ করে প্রায় তিন ফুট ইগল, নানা জাতের শ্যেন

BanglaBook.org

দিয়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকমের শিকার করানো হয়— সামান্য আঘিন বা বাগেরী থেকে অতি দ্রুতগামী 'চিংকারা-হরিণ' পর্যন্ত। শ্যেন দিয়ে চিংকারা শিকার এখন আর হয় না বোধ হয়, তবে সুবর্ণ ইগল দিয়ে নেকড়ে শিকার করানো এখনও হয়ে থাকে— মধ্য এশিয়ায়।

শ্যেন দিয়ে চিংকারা শিকার আগে ভারতে অনেক জায়গাতেই দেখা যেত। এই শিকারে শ্যেনের সঙ্গে তাজী কুকুর ব্যবহার করা হত। যাঁরা এইরকম শিকারে যেতেন, তাঁরা ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যেতেন, নইলে শিকারের আসল ও পরিপূর্ণ রূপটি পাওয়া অসম্ভব হত। তাজী-কুকুরের (Greyhound) সাহচর্যে শ্যেন দিয়ে চিংকারা শিকার দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই (তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজ) এই শিকার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লিখে গিয়েছেন এবং একবাক্যে বলে গিয়েছেন যে, এ শিকারের তুলনা হয় না। বাজবহেরী খেলায় অভিজ্ঞ একজন ইংরেজ চিংকারা-শিকার দেখে যা লিখেছিলেন, তার কিছু অংশ নীচে অনুবাদ করে দেওয়া হল :

'...আমরা তখন প্রান্তরটার কাছাকাছি এসে গিয়েছি। নবাব সাহেবের প্রধান শিকারী, সঙ্গে যে-সব তাজী-কুকুর (Greyhound) আনা হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে দুটো কুকুর বেছে নিলে আর যে-লোকটার হেফাজতে বাজ-বহেরীগুলো ছিল, তার কাছে গিয়ে পাখীগুলোকে একনজর দেখে একটা "চরখ" (বহেরী গণের পাখী) তার নিজের হাতের উপর বসিয়ে নিলে। পাখীটা তখন টুপি-পরা অবস্থাতেই ছিল, যেমন ছিল আর সব ক'টা পাখীই। অদূরে চিংকারা হরিণটা একটা ছোট গাছের পাতা খেতে ব্যস্ত। অমনোনীত কুকুর ও পাখীগুলোকে দুজন লোকের জিম্মায় একটা গাছের ছাওয়ায় রেখে, এ-ঝোপ ও-ঝোপের আড়ালে আড়ালে তখন অগ্রসর হওয়া শুরু হলো আমাদের— যতটা সম্ভব, ওই চিংকারার কাছে যাওয়াই হলো আমাদের উদ্দেশ্য। কারণ, চিংকারার সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেওয়া কোনও তাজী-কুকুরের সাধ্য নয়। মতলবটা হচ্ছে, আকস্মিক একটা আক্রমণে শিকারকে হতভম্ব করে দেওয়া, তাকে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে তার পলায়ন চেষ্টাকে কিছুটা প্রতিহত করা।

বার বার করে হাওয়ার গতির দিক নির্ণয় করা হচ্ছে... যখন চিংকারাটার কাছে, প্রায় ষাট গজের মধ্যে এসে গিয়েছি, তখন দেখতে পেলাম, বাছাই করা কুকুর দুটো চিংকারার পেছনে ধাওয়া করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, তারা থেকে থেকে সামনের দিকে সজোরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঝুঁকছে। যে লোকটা শেকল ধরে আছে, সেও কুকুরগুলোর হ্যাঁচকা টানের চোটে ঝুঁকে পড়ছে... আবার সামলে নিচ্ছে। শিক্ষিত কুকুর, মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

প্রধান শিকারী একটা বড় গাছের ঝোপের পেছনে গিয়ে থামল, পেছনের দিকে তাকিয়ে "ডোরিয়া"কে (কুকুরের রক্ষী) ইশারা করলে এগিয়ে আসতে... তারপর ঝোপটা পার হয়ে খোলা প্রান্তরের এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল তারা। দেখলাম, প্রধান শিকারী

BanglaBook.org

"চরখ" পাখীটার চোখ-ঢাকা টুপি খুলে সেটাকে উড়িয়ে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে সংকেত করে দিলে ডোরিয়াকে তার কুকুর ছাড়তে।

লক্ষ্য করলাম চরখ পাখীটাকে। সেটা সোজা চিংকারার দিকে না গিয়ে, ডান দিকে বাঁক নিয়ে আকাশে উঠতে লাগল। তলার দিকে তাকিয়ে দেখি, কুকুর দুটো সোজা ছুটেছে হরিণটার দিকে। আমরা সকলেই যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

চরখ পাখীটা তখন বেশ উঁচুতে উঠেছে... বৃত্তাকারে উড়ছে। চিংকারা ছুটছে, পেছন পেছন কুকুর দুটো প্রাণপণ ছুটছে— তাদের বুক মাটি ছোঁয় ছোঁয়। নিমেষের মধ্যে দেখি, চিংকারাটা কুকুর দুটোকে অনেকখানি পেছনে ফেলে দিয়েছে— আর দু'শো গজ আন্দাজ যেতে পারলেই বড় বড় ঝোপ-ওলা জঙ্গলে সে ঢুকে পড়বে, আর তা-হলেই সে একরকম নিরাপদ। কারণ, ওই জঙ্গলে চরখের খেলা অসম্ভব— আর কুকুরও বেকার। ঠিক তখনই কালো তীরের মতন কি একটা আকাশ থেকে বিদ্যুদ্‌বেগে পড়ল এসে চিংকারাটার মাথার ওপর— একেবারে আকস্মিকভাবে! মনে হলো, চিংকারাটা আছাড় খেলে... তারপরই

দেখি সেটা আবার ছুটছে। কিন্তু এবার সে দিক পরিবর্তন করেছে... মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ওই চরখ পাখীটা... চিংকারা তার গন্তব্যস্থান ওই জঙ্গলে আর যেতে পারলে না— যেতে দিলে না ওই চরখ। পটের এই হঠাৎ পরিবর্তনে কুকুর দুটো দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটছে— ব্যবধান কিছু কমেছে চরখের কারসাজিতে। ওদিকে, ছোঁ মেরেই চরখ আবার উড়ছে আকাশে... বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠেছে সে।

...কুকুর দুটো আবার পেছিয়ে পড়ছে— আমরা তারও পেছনে। ... কুকুর দুটো ক্রমান্বয়ে পেছিয়ে পড়ছে... আমরা কোণাকুণি চলেছি। চিংকারাটা ডান দিকে মোড় নিয়েছিল বলে এ-সুবিধা আমরা পেয়েছি। ঘোড়াগুলো নতুন উৎসাহ নিয়ে ছুটছে... শিকারের নেশা যেন এদেরও চেপেছে!

কিন্তু সবই যেন বৃথা... ওই তো, অদূরে আর একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, চিংকারাটা আর আন্দাজ তিন-শো গজ গেলেই ঢুকে পড়বে ওই জঙ্গলে! কুকুর দুটো হরিণটার অন্ততঃ পঞ্চাশ গজ পেছনে...যখন ওই জঙ্গলটায় গিয়ে ঢুকবে ওই চিংকারা তখন অন্ততঃ একশো গজ পেছনে থাকবে কুকুর দুটো। চরখটা গেল কোথায়! এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে আকাশটাকে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম— কিছুই দেখতে পেলাম না। এখনও যদি একটা ঝাপট মারতো ওটা, তা'হলেও উপায় ছিল!

নাঃ, চিংকারা শিকার দেখার সৌভাগ্য নেই আমাদের; ও জিতে গেল আজকের লড়াইয়ে। তা জিতুক, কোনও ক্ষোভ নেই—অন্ততঃ আমার মনে। চিংকারা অত্যন্ত দ্রুতগামী, বরাবরই শুনে এসেছি। তাই ব'লে এত? আর এতক্ষণ ধরে এত দ্রুত সে ছুটতে পারে! স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। ওই তো, জঙ্গল সে ঢুকলো বলে... নাঃ, বাহাদুর চিংকারা!

ওকি! ওকি!! চিংকারাটা আছাড় খেয়ে পড়ল যেন! ওই তো চরখটা তার পাশ থেকেই আবার উড়ল! চিংকারাটাও উঠেছে... বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে— চরখটা এবার বেশী উঁচুতে উঠল না। হাত-চল্লিশ উপরে উঠেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল চিংকারাটার উপর। কিন্তু এবারে ঠিক ছোঁ মারা নয়, মনে হ'ল যেন, তার পাঞ্জা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে হরিণটার মাথা। হরিণটা হোঁচট খেয়ে আবার সামলে নিলে, মাথা ঝেড়ে চরখের হাত থেকে নিজেকে ছাড়ালে! কিন্তু চরখ হরিণটার হাত চার-পাঁচ উপরে উঠে গোটা দুই পাক দিয়ে আবার পড়ল ঝাঁপিয়ে, তার মাথার উপর! এবারে হরিণটা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চরখও ছেড়ে দিলে তাকে। হরিণটা আবার উঠেছে, কিন্তু তার আগেকার ক্ষিপ্রতা আর দেখা যাচ্ছে না, উঠতে-না-উঠতেই, চরখটা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে... চিংকারা মাটিতে পড়ে গিয়ে পা ছুঁড়ছে— তাজী কুকুর দুটো গিয়ে ধরেছে ওই ধরাশায়ী হরিণকে— এ যেন ভেল্‌কি দেখছি!

আমরাও গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। গিয়ে দেখি, একটা কুকুর ধরেছে হরিণটার গলা কামড়ে, অপরটা ধরেছে তার কোমরে... চরখটা হাত দুই তফাতে তার ডানা উঁচু করে ছড়িয়ে দিয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে আর মাটির উপর লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। প্রধান শিকারী ঘোড়া থেকে নেমেই হরিণটাকে দিলে একটা ছুরি দিয়ে জবাই

BanglaBook.org

করে। উদ্দেশ্য, হরিণ-মাংসকে মুসলমানের খাদ্য হিসাবে উপযোগী করা।

...কুকুর দুটো একটু তফাতে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। হরিণটার কাছে গিয়ে দেখি, তার মুখটা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে ওই চরখটা। একটা চোখ কোটর থেকে বা'র করে নিয়েছে, অপরটাও অক্ষত অবস্থাতে নেই। কুকুর দুটোর কাছে গিয়ে দেখলাম... একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তারা। আমাদের ইংলণ্ডের জাত-গ্রেহাউণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলাম— অনেক প্রভেদ। এই কুকুরগুলো আরও শক্তিশালী, চোয়াল আরও মজবুত পায়ের তলাকার (তেলোর) চামড়া অনেক বেশী কড়া, যার দরুন অসমান কাঁকর-ওলা জমিনের উপর দিয়ে এরা স্বচ্ছন্দে দৌড়তে পারে। দমও এদের বেশী। তবে নিছক গতিবেগের হিসাবে ইংলণ্ডের গ্রেহাউণ্ডই শ্রেষ্ঠ...'

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

একবার শিকারে গিয়ে বন্দুকের ছিটে একটি মেয়ের পায়ে লাগায় শপথ করেছিলাম— এক বছর বন্দুক ধরব না। প্রতিজ্ঞা পালন করেছি— এক বছর বন্দুক ছুঁইনি। বলেও দিয়েছিলাম— শিকারের খবর কেউ যেন না দেয়। তাই, ভগবান আমাকে বাজিয়ে পরীক্ষা করে নিতে চান বলেই বুঝি অনেকরকমের বাঘ-শুয়োরের খবর আসতে থাকে। বুকে ঝড় বয়ে যায়— তবুও যাই না। সদীর্ঘ নিশ্বাস ফেরত দিই। এমনকী, যেসব বালিহাঁসের জন্যে পদ্মার চরে কত কষ্ট স্বীকার করেছি— তারাই এখন আমার বাড়ির উপর খুব নীচু করে রোজ সকালে উড়ে যায়— আমি চোখ ফিরিয়ে নিই।

এই অজ্ঞাতবাসের পর, শুভ পয়লা বৈশাখে ঘুমন্তপুরী সচেতন হয়ে উঠল। একটা দাঁতাল বন্যবরাহ শিকার করে আমিও হালখাতায় নাম লেখালাম। দেখলাম— দীর্ঘ একবছর আমি বন্দুককে ভুলে থাকলেও সে আমায় ভোলেনি।

এর পরই ছোটো-বড়ো শিকারে দস্তুরমতো মেতে উঠলাম।

বাঘ-শুয়োরের চাইতে পাখি শিকার যে খুব সহজ, তা নয়; বিশেষ করে পদ্মার ফাঁকা বালুচরে।

মাঘ মাস। দুর্দান্ত শীত তার দাঁতের কামড়ে যেন ঘুমন্ত পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে আছে! অতি প্রত্যুষে, অরুণোদয়ের আধ-ফোটা কচি আলো কুয়াশাচ্ছন্ন পদ্মার প্রশান্ত বক্ষে

BanglaBook.org

নামতে এসেও প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। এইরকম একটা শীতের প্রভাত।

পদ্মার বুকে নোঙর-করা আমার বজরাখানা সমস্ত রাত ধরে ঢেউয়ের সঙ্গে হেলে-দুলে নেচে উঠছিল। আমি তার মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে কখনো-বা ঘুমিয়ে নিয়েছি, আবার কখনো-বা ঘুম ভেঙে দেখেছি— পদ্মার তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করেও আমার বজরাখানা সেইখানেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক ভোর হবার মুখেই শিকারে বের হব। বজরার সঙ্গে একটা ছোট্ট জেলে-পানসি বাঁধা ছিল। আমি খাকি হাফ-শার্ট-প্যান্ট পরে নিলাম, কারণ কটকটে সাদা বা উজ্জ্বল রঙের কোনো পোশাক পরা থাকলে, পাখিরা শিকারিকে শিগ্‌গির কাছে ভিড়তে দেয় না। কারণ, তাদের ভগবানের দেওয়া সহজাত একটা তীব্র বোধশক্তি আছে, আর সেটা এত প্রবল যে, তারা ঠিকই বুঝতে পারে, কে বন্ধু আর কে তাদের শত্রু। আমি বহুবার দেখেছি, চাষিরা পদ্মার চরে চাষ করে— পাখিরা তাদের গ্রাহ্যই করে না; কিন্তু শিকারিদের তারা দূরে দেখতে পেলেই হুশ করে উড়ে যায়। আমি বন্দুক টোটা সব নিয়ে পানসিতে চেপে বসে মাঝিদের ছেড়ে দিতে বললাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা পদ্মার বুক চিরে হেলেদুলে চলতে লাগল— ছপ ছপাৎ ছপ—ছপ ছপাৎ ছপ!

এই পদ্মা! এরই নাম কীতিনাশা! যুগযুগান্তের কত না ধ্বংসলীলা তার বুকে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে। ছোটো ছোটো ঢেউগুলি তীরে আছড়ে পড়ে বলতে চায় কত না অকথিত বাণী! আমার কৈশোর ও যৌবনের নিত্য-সহচর এই পদ্মার জীবন যেন আমার জীবনের সঙ্গে একসঙ্গে মিশে আছে।

দূর থেকে অস্পষ্ট আলোকে দেখলাম, নানান জাতীয় হাঁস, বন্য রাজহাঁস, চকাচকি পদ্মার চরে মেলা বসিয়েছে— তাদের অফুরন্ত কাকলি দিয়ে যেন নিস্তব্ধ প্রভাতকে সচকিত করে তুলতে চায়। যেন তাদের পাখার ঝাপটে জাগিয়ে তুলতে চায় ঘুমন্ত ধরণীকে।

কিন্তু থাক, কবিত্ব করলে তো আর শিকার করা যায় না!

এদিকে ধীরে ধীরে প্রকৃতি দেবী তাঁর কুয়াশার অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিয়েছেন। এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পাখিগুলো দূরে— অপর পারের বালুচরে, এক এক স্থানে তাদের স্বজাতিবর্গ নিয়ে আহারের অন্বেষণে খুব ব্যস্ত। একটা দলপতি বন্য রাজহাঁস গ্রীবা উচ্চ করে সতর্ক প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত আছে— কোথাও কোনোদিক থেকে শত্রুর আগমন হচ্ছে কি না তাই নিরূপণ করবার জন্যে। সেই দলপতি 'প্যাঁক প্যাঁকোর প্যাঁক' শব্দ করলেই সকলে আহার ছেড়ে চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আর যেই দলপতি উড়লেন, সকলেই অনুরূপ শব্দে আকাশ-পথযাত্রী হলেন। কিন্তু অন্য কোনো জীব যতই সুচতুর হোক না কেন, ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষই হচ্ছে সব চাইতে চালাক।

একটু এগিয়ে যেতেই পাখিগুলো পিছনে ফিরতে লাগল। তখনও তারা বন্দুকের পাল্লায় আসেনি। আমি মাঝিকে বললাম— 'না, আর কাজ নেই— নৌকা ফিরিয়ে ওই যেখানে নদীর ধারে একটা চাষি জমি চাষ করছে, ওইখানে আমাকে নামিয়ে দাও।' তারাও আমায় সেই নির্দিষ্ট স্থানেই নামিয়ে দিলে। তারপর সন্তর্পণে নেমে দেখলাম,

BanglaBook.org

অনতিদূরে একটি কৃষক জোড়া বলদের পুচ্ছ মর্দন করে লাঙল চালিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ গো-জাতির চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চলেছে— তার মুখে অকথ্য ভাষা যেন খই ফুটছে। বলদ দুটো অনাহারে দুর্বল—কৃশ; তাই তাদের দুর্বহ জীবনভার যেন আর বইতে পারে না— তার উপর অজস্র লাঠি প্রহারে জর্জরিত। সেই কৃষকের কাছে গিয়ে বিনা ভূমিকায় বললাম— 'ভাই, একটু সাহায্য করতে হবে যে। বলদ দুটো খুলে নিয়ে ওই পাখিদের বাঁয়ে রেখে আমার সঙ্গে এগিয়ে চল না— না, আমিই তোমার সঙ্গে এগিয়ে যাব? আর তোমার একটু সময় নষ্ট হবে বলে এই নাও দু-টাকা।' সে তৎক্ষণাৎ টাকা দুটো ট্যাঁকস্থ করে নিয়ে, বলদ দুটো খুলে চলতে লাগল। আমি তার মাথার মাথল অর্থাৎ আমাদের দেশি হ্যাট খুলে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিলাম। সে তো হেসেই অস্থির! সেও তার কোমরে বাঁধা গামছাখানি খুলে মাথায় জড়িয়ে নিলে। আমি আমার Long range Duck gun-এ 3A shot ভরে বন্দুকটি পিছনে লুকিয়ে তার স্কন্ধে হাত দিয়ে চললাম, যেন আমরা কতকালের চেনা বন্ধু। সেই চাষি বন্ধু এগিয়ে যাবার সময় কত গল্প বলতে লাগল— কত হাকিম-হুকুম সব আসে এখানে শিকার করতে— আমি কেমন ভালো করে শিকার করিয়ে দেই।' এই বলে সগর্ব দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাইল— যার অর্থ, শিকারের বাহাদুরির সবটাই যেন তারই প্রাপ্য। তারপর কথার মাঝেই ফস করে বলে বসল— দ্যান না ম'শয়, আপনাদের একটা ভালো বিড়ি-টিড়ি। আমি বললাম— আমার কাছে তো বিড়ি নেই, তবে সিগারেট আছে। —হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও ওই কথাই বুলছি। —আপনাদের ওই সাদা বিড়ি। বাস্তবিকই, তাদের সরলতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। আমি পিঠ চাপড়ে বললাম— 'দেখ, এখন ওসব খায় না— শিকারটা হয়ে যাক, তারপর একটা কেন— দশটা দিয়ে যাব— আর এসময় বেশি কথা বলতে নেই— শিকার পালিয়ে যাবে।' কে কার কথা শোনে! সে অনর্গল বকেই চলেছে— পূর্বে যারা সব শিকার করতে এসেছিল তাদের ইতিহাস। আমি তার হাত ধরে বললাম— দয়া করে একটু চুপ কর ভাই। কী বুঝে সে তার বিরামবিহীন বক্তৃতায় ছেদ টানল। কিছুক্ষণ পরেই শিকারটা প্রায় আশি-নব্বই গজের মধ্যে এসে পড়তেই আমি আর কাল বিলম্ব না করে বন্দুকটি উঠিয়ে ধাঁ করে পর পর দুটো আওয়াজ করলাম। দেখলাম, দুটি সুবৃহৎ বন্য রাজহাঁস তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। আর একটি ডানা ভেঙে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। তার প্রাণপণ চেষ্টা যে, একবার কোনোরকমে পদ্মার জলে গিয়ে পড়তে পারলে স্রোতে ডুব দিয়ে ভেসে যাবে— তাকে আর ধরা যাবে না। আমিও বন্দুক ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম, সেও প্রাণপণে ছুটে চলেছে। এ যেন রাজপুতের প্রতিজ্ঞা— জীবন্তে ধরা নাহি দিব।

সে তখন প্রায় জলের কাছাকাছি পৌঁছে যায় আর কি— এমন সময় ছুটতে ছুটতে 'মহাপঙ্কে নিপতিতং'— গভীর পাঁকের মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় আমার কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। আমি কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম, কোনোমতে প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্যে। তা নইলে হয়তো আমার জীবন্ত সমাধি হয়ে যেত। এ-রকম চোরাবালি পদ্মার চরে প্রায় থাকে—দেখে ঠিক ধরা যায় না। আমার তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব। এইরূপ দুর্দশা

BanglaBook.org

দেখে, আমার সেই কৃষক বন্ধুটি ছুটে কাদায় লম্বা হয়ে শুয়ে যেন সাঁতার কেটে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার একটি হাত ধরে, আমরা দুটি বন্ধু মুখোমুখি শুয়ে আছি সেই পাঁকের উপর। আমার দেহ অবশপ্রায়— কম্পিত কণ্ঠে তাকে বললাম— আর বুঝি আমার ওই হাঁসটা পাওয়া গেল না। সে প্রায় ধমকের সুরেই আমায় বললে— ওসব কথা ছাড়ান দ্যান— আল্লার নাম করেন— কোনো ভয় নাই। ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলাম— সে তো বুঝলাম, —কিন্তু খোদার পবিত্র নাম যে এখন আমার মুখে আর আসছে না বন্ধু। সে কিন্তু ক্ষান্ত হবার পাত্র নয়। সে তার মৌলবির কাছে শেখা দু-এক লাইন কোরানশরিফের বয়েত আমার কানের কাছে আওড়াতে লাগল। দেখলাম, সে চাষি হলেও নিরক্ষর নয়, এ বিষয়ে একটু জানাশোনাও আছে। সে আমায় সান্ত্বনার সুরে বললে— আমাকে ধরে কোনোরকমে উঠে আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন কত্তা। আমি তাকে ধরে উঠবার চেষ্টা করতেই, বিপরীত ফল হল। আগে কোমর পর্যন্ত ছিল, এখন আবক্ষ পাঁকে ডুবে গেলাম। অসহায় কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে, তার হাত দুটো চেপে ধরে বললাম— আর বুঝি এযাত্রা উঠতে পারলাম না ভাই! আমার তখন অর্ধচেতনাহীন অবস্থা। যাই হোক, আমার জীবননাট্যের যখন এইরকম পরিস্থিতি, ঠিক সেই সময় আমার মাথার উপর খুব নীচু দিকে এক ঝাঁক হাঁস যেন ব্যঙ্গ করেই উড়ে গেল— প্যাঁক, প্যাঁকোর, প্যাঁক। আমার মনে হল— 'দল দলায় পড়লে হাতী, চামচিকেয়

Banglabook.org

মারে লাথি।' ওদিকে দূর হতে আমার মাঝিরা আমার প্রায় অন্তিম অবস্থা দেখতে পেয়ে, একগাছা মোটা দড়ি নিয়ে ছুটে এল। নৌকা বাঁধবার জন্যে এধরনের দড়ি, সাধারণত নৌকোতেই থাকে।

একে দুর্দান্ত শীত, তারপর পাঁকের মধ্যে ডুবে আছি— যেন মৃত্যুর অন্ধকার আমার চোখে নেমে আসছে। যেখান থেকে পাঁক শুরু হয়েছে, সেখানে মাঝিরা দাঁড়িয়ে পড়ল, আর ঠিক যেমন করে জেলেরা নদীর জলে ঘুরিয়ে জাল ফেলে, ঠিক তেমনি কসরত করে তার দড়িটা আমার দিকে ছুড়ে দিলে। আমার কৃষক বন্ধুটি তাড়াতাড়ি করে একটু সরে গিয়ে দড়িটা টেনে এনে আমার হাতে দিয়ে বেশ জোর গলায় বললে— খুব চেপে ধরেন কত্তা! আমি এক হাতে দড়ি আর এক হাতে আমার নবলব্ধ বন্ধুটিকে খুব জোরে ধরে উঠবার চেষ্টা করলাম, আর মাঝিরাও দড়ির উপর দিকটা ধরে প্রাণপণে আমায় টেনে তুলবার চেষ্টা করলে— যা হোক, জীবন-মৃত্যুর এই tug of war-এ জীবনই জয়যুক্ত হল। কোনোপ্রকারে উঠে আবার পাঁকের উপর সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। নবপরিচিত বন্ধুটিকে বললাম— 'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।' কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, পাঁকে সাঁতার কেটে আমরা দুজনে যেখান থেকে মাঝিরা দড়ি ছুড়েছিল, সেইখানে উঠে এলাম। সর্বশরীরে এত কাদা লেগে গিয়েছে যে, আমার ওজন দুই মণের জায়গায় বোধ হয় আড়াই মণটাক হয়ে গিয়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কোনোমতে নৌকোয় চেপে বসলাম।

নৌকোয় আসবার পথে, কৃষক বন্ধু পিছন থেকে অনর্গল বক্তৃতা আর উপদেশ-বাণী বর্ষণ করে চলেছে। কিন্তু আসবার সময় শিকার-করা সেই দুটো রাজহাঁস, আমার বন্দুক আর তার মাথলটি কুড়িয়ে আনতে ভোলেনি। কারণ আমি যখন পিছন ফিরে বললাম— আমার হাঁস দুটো? সে উত্তর না দিয়ে শুধু হাত দুটো উঁচু করে দেখাল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম— তোমার জন্যই আমি আজ বেঁচে গেলাম। আমার বন্ধুটি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে— 'রাখে আল্লা, মারে কেডা?' কিন্তু আমার নৌকোয় ওঠবার সময়েই মাঝিদের কাছে আমার পরিচয়টা জেনে নিতেই সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। নৌকোয় উঠে আমি বললাম— কী হে, হঠাৎ চুপ মেরে গেল কেন? সে বললে— আপনি যে আমাদের গরিবের মা-বাপ, আপনার নাম খুব শুনেছি, চোখে দেখিনি হুজুর। আমার গোস্তাকি মাফ করতে আজ্ঞা হয়। আমি বললাম— তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তাই আমাকেই তোমার গোস্তাকি মাফ করতে হবে বই কী! আচ্ছা বেশ, মাফ করব— কিন্তু একটা শর্তে— এই সাদা বিড়িটা আমার সামনে ধরিয়ে যদি তুমি আগের মতো আমার সঙ্গে কথা বলে যাও! সে বহু সংকোচ, আপত্তি জানিয়ে শেষটা রাজি হল— আমিও তার হাতে একটা সিগারেট দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটা ধরিয়ে দিলাম— আর সিগারেটের টিনটাও তাকেই দিয়ে দিলাম।

এমন সময় অদূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। দূরবিনটা নিয়ে দেখি, আমার অতিথি স্যার নাজিমুদ্দিন, পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল, আমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর, পরলোকগত স্যার আজিজুল হক,

BanglaBoi.org

তাঁদের মধ্যে কে একজন কী-একটা শিকার করে সেটাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নেবার জন্যে জোরে নৌকো চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা দু-দিন আগে শিকারের জন্যে লালগোলার 'গেস্ট হাউসে এসে' আমার অতিথি হয়েছিলেন। গতকাল আমরা শিকার করেছি। আজও তাঁরা সারাদিন শিকার করে আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন। বাড়িতে তাঁদের জন্যে যথোচিত বন্দোবস্ত করে আমি রাত্রেই বজরাতে এসে ঘুমিয়ে ছিলাম। প্রত্যুষে চা পান করে পদ্মাবক্ষে তাঁরা আমার সঙ্গে মিলিত হবেন— এটা পূর্বেই তাঁদের সঙ্গে কথা ছিল। যা হোক, আমি আমার এই নূতন বন্ধুটিকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলাম। পরস্পরের কর্দমাক্ত দেহ— কারো কোনো অসুবিধার কারণ নেই। বিদায়ের সময় আমার ত্রাণকর্তা আমাকে গা-হাত-পা ধুয়ে নেবার জন্যে উপদেশ দিতেও কসুর করেনি। তাকে বুঝিয়ে বললাম— শিকারিরা বন্দুকের আওয়াজ শুনে কি আর চুপ করে থাকতে পারে, বন্ধু! যাক, আর আমার সময় নেই— চললাম; তুমি ভাই, দু-দিন পরে একবার রাজবাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করো। মাঝিদের বললাম— শিগ্‌গির ওই নৌকোটার কাছে আমায় নিয়ে চলো। তারাও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনটি দাঁড় একসঙ্গে ফেলে পঙ্খিরাজের মতো আমার পানসিখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। কিছু দূর যাওয়ার পর পিছন ফিরে দেখি, আমার সেই উপদেষ্টা বন্ধুটি তখনও তীরে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে। কী সহজ, সরল, গ্রাম্য মানুষটি— আর সেইসঙ্গেই মনে পড়ল, শহরে গড়ে ওঠা নকল সভ্যতার কথা!

আমায় আসতে দেখে, খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁদের নৌকো থামালেন। কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম— আপনাদের কী শিকার হল? আমার সেই কিম্ভূতকিমাকার রূপ দেখে তাঁরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। উত্তর দিলেন স্যার আজিজুল হক— কথায় নয়— নৌকোর তলা থেকে একটা রাজহাঁস দু-হাতে তুলে ধরে। তারপর বললেন— মাঝ-পদ্মায় একটাই ভেসে যাচ্ছিল— আর এটা আমিই মেরেছি। তারপর আমার দিকে চেয়ে, হেসে, ঠাট্টা করে বললেন— কোথাও বেড়া টপকাতে গিয়ে খানায় পড়েছিলেন নাকি? আমিও তেমনি সুরেই উত্তর দিলাম— বেড়া টপকাতে নয়, আপনার হাতের ওই হাঁসটাই আমায় খানায় ফেলেছিল! স্যার নাজিমুদ্দিন বললেন— ওঃ, তাই বুঝি উড়তে পারছিল না! গুলি না করলেও লাঠি দিয়েই সাবড়ে দেওয়া যেত! আমি তখন তাঁদের কাছে আমার সেই মহাপঙ্কে উত্থান-পতনের ইতিহাসটা আনুপূর্বিক খুলে বললাম। আমার এই কথা শুনে স্বভাব-গম্ভীর স্যার নাজিমুদ্দিন খুব জোরে হেসে উঠলেন। আর স্যার আজিজুলের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। স্যার আজিজুল বললেন— কালও আমাদের সঙ্গে আপনার হয়রানি হয়েছে, আজও আপনি ক্লান্ত, আপনি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। তা ছাড়া, আপনি তো আমাদের জন্যে সবরকম বন্দোবস্তই করে দিয়েছেন। আমি দ্বিরুক্তি না করে ফিরে এলাম।

ফিরবার পথে দেখি, একজোড়া চকাচকি বেশ মনের সুখে বসে আছে, ভাবলাম, দেখি, এটাকেও যদি মারা যায়। 'অধিকন্তু না দোষায়।' জেলে-পানসি তাদের পাশ দিয়েই চলেছে— কিন্তু এরকমের নৌকো দেখাতে অভ্যস্ত বলেই সচরাচর তারা উড়ে যায় না।

প্রায় পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছে, তখনই তারা 'ককর কোঁ, ককর কোঁ' শব্দ করে উঠল— এটা উড়বার পূর্বাভাস। আমার মাঝিরা আমাকে নিয়ে বহু শিকার করিয়েছে— তাদের কিছু বলতে হল না। আমি বন্দুক তুলতেই তারাও দাঁড় থামিয়ে দিলে। আমিও তৎক্ষণাৎ আওয়াজ করলাম— তখনই একটা পাখি তার অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলে। অন্য চকাটি কেঁদে কেঁদে তাকে ঘিরে চারিদিকে উড়তে লাগল। তার বিরহের আর্তনাদ যেন আমার বুকে তীরের মতো এসে বিঁধল। আমি তার এই দুঃখের অবসান করতে আর একটি shot করলাম— লাগল না। সে ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে— সূর্যোজ্জ্বল নীলিমায় তার অভিযোগ জানাতে জানাতে আমায় যেন অভিশাপ দিয়ে চলেছে। মাঝিরা পাখিটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এল— তারপর পদ্মার এপারে না আসা পর্যন্ত সেই অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে আসতে লাগল— তার কণ্ঠে যেন অনাদিকালের বিরহের আর্তধ্বনি। মানুষ যখন নীড় রচনা করতে শুরু করেনি— তখন হয়তো এদের মর্মকথা বুঝত। তারপর মানুষ যখন ভাষা পেল, তখনই বুঝি এদের ভাষা বুঝবার শক্তি সে হারিয়ে ফেললে!

এপারে এসে দেখি, আমার জনৈক আত্মীয় এসেছে আমাদের শিকার দেখার জন্যে। আমার এই কর্দমাক্ত অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে সে ছুটে এল— হাতে তার ভরা বন্দুক। আসবার সময় হঠাৎ তার বন্দুকটির আওয়াজ হয়ে গেল; আমার পাশ দিয়েই গুলিটা গেল বেরিয়ে। সে অপ্রতিভের মতো একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে— আজ কী হত তোমার? আমি নির্বিকারভাবে উত্তর দিলাম— হত আর কী, মরে যেতাম। চেয়ে দেখ দূরে, ওই পাখিটার কান্না আর সইতে পারি না।

এখানে আমার সেই আত্মীয়টির প্রথম জীবনের শিকার-নৈপুণ্যের ইতিহাস না বললে কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম বন্দুক কেনবার শখ ভূতের মতো তার ঘাড়ে চাপতেই, সে হঠাৎ একদিন একটা বন্দুক কিনে বসল, কিন্তু তাতে টোটা ভরে ট্রিগার টানাতে তার আর ভরসা হয় না— শখ আছে, সাহস নেই; তবু সে করলে কী, একটা লম্বা বিশ-ত্রিশ গজ দড়ি এনে ট্রিগার বেঁধে দূর থেকে টান দিয়ে গুলি ছোড়ার অভ্যাস করে নিলে; আর এমনি করেই সে সাহসও সঞ্চয় করলে। তারপর, যেদিন থেকে তার তাক করে পাখি শিকার করবার পুলক জাগল, বিল খালের আশপাশের ছাগল, ভেড়া, কুকুরগুলো কত যে অক্কা পেতে লাগল, তার আর সীমা সংখ্যা নেই— তার প্রাণে শিকারি হবার ইচ্ছেটা ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা ছিল কিনা!

লালগোলা ঘাটে আমার মোটর প্রস্তুত ছিল। সোজা বাড়ি ফিরলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটে। সদর দরজায় গাড়ি থামতেই, সম্মুখে দেখলাম, ভটচার্য মশায়ের সুদীর্ঘ একটা নাসিকা। পাঁজি-পুথি বগলে নিয়ে তিনি বেরিয়ে আসছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন— এটি চক্রবাক, না চক্রবাকী? উত্তর দিলাম— ঠিক জানা নেই। আপনি স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখুন। অর্ধহস্ত পরিমিত জিহ্বা কর্তন করে গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন— আহা, শ্রীকৃষ্ণের জীব। বাঘ-শুয়োর ছেড়ে শেষকালে কিনা নিরীহ পক্ষী শিকার? আমি বললাম— আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না পণ্ডিতমশাই।

এইজন্যেই মনটা ভালো নেই। আমি যখন উপরে উঠে আসি, তখনই শুনলাম—

BanglaBook.org

কয়েকজন ভদ্রলোক কলিকাতা থেকে শিকার করতে এসেছেন। উপরে আমার বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং তাঁর সঙ্গে দু-তিনজন ভদ্রলোক। প্রাণচঞ্চল তুষারকান্তি আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল— এই যে ধীরেন-দা, অ্যাঁ— তোমার এসব কী ব্যাপার? বলে দু-পা এগিয়ে এসেই আবার পিছিয়ে গেল। আমিও ছুটে গিয়ে এই অবস্থায় তাকে আলিঙ্গন করবার লোভটুকু সামলাতে পারলাম না। তার ধপধপে সাদা পাঞ্জাবিটা কর্দমাক্ত হয়ে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম— তুমি এমনি মাহেন্দ্রক্ষণে এসে পড়েছ, এ অবস্থায় হয়তো আর জীবনে এমনি করে তোমায় কখনো কাছে পাব না। সকলেই বিকট হাস্যে ঘরটাকে যেন ফাটিয়ে দিলে। আমি ওই ঘরে একটা প্রকাণ্ড আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অপরূপ মূর্তিটা ভালো করে দেখে নিলাম। অজ্ঞাতে মুখ থেকে বেরিয়ে এল— কী সুন্দর, কী বীভৎস!

তুষার বললে, এক্ষুনি শিকারে যাব। আমি বললাম— সে কী হে? এই এলে— একটু জিরোও— দম নাও— তারপর কাল ভোররাত্রে আবার বেরুনো যাবে। সেকথা কে শোনে? তাই আশেপাশে শিকারের জন্যে সব ঠিক করে তাদের মোটরে উঠিয়ে আমি একটি লোককে তাদের সঙ্গে দিলাম। গায়ে আমার এঁটেল মাটি— একবার লাগলে আর সহজে ছাড়তে চায় না, তারপর শুকিয়ে উঠেছে— তাই স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম ঘণ্টা দুই কাদার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সন্ধ্যা হয়ে এল; স্নানান্তে নবজীবন লাভ করে বৈঠকখানায় গিয়ে, তুষারদের অপেক্ষায় আছি, এমন সময় সে কতকগুলো ঘুঘু ফতাকা, হরিতাল মেরে হইহই করে সদলবলে ফিরে এল। আমার তখন শরীর ভীষণ ক্লান্ত। পরদিন ভোররাত্রে শিকারে বের হবার সব ব্যবস্থা করে, নৈশভোজনান্তে আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। অবশ্য মাথার কাছে অ্যালার্ম দেওয়া ছোটো ঘড়িটা রাখতে ভুল করিনি।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠে দেখি, গায়ে অসহ্য ব্যথা— তাহলেও তুষার আর তার সঙ্গীদের ডেকে তুললাম— সবাই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিল। তারপর সাজ সাজ রব।

আমরা দু-খানা মোটরে, কয়েকটি বন্দুক আর টোটা নিয়ে পদ্মার দিকে রওনা হলাম।

BanglaBook.org

তুষারকে বললাম— বাইরে তোমার বন্ধু তুষারের বড়ো অত্যাচার—হাত-পাগুলো যেন হিম হয়ে আসছে! সে হেসে বলল— কুছ পরোয়া নেই— শিকার পেলেই আবার গরম হয়ে উঠবে। চা পান ও খাবারের আয়োজন নৌকোতেই ছিল— আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেগুলির সদ্‌ব্যবহার করলাম। দুজন শিকারি দুই নৌকোয় চেপে বসে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করল। আমি আর তুষার এক নৌকোয় গেলাম— আমাদের সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোকও উঠলেন— তাঁর নাম সূর্যবাবু। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বেই নৌকো ভাসিয়ে দিলাম। খাবারের নৌকোকেও আমাদের পিছনে আসতে বলা হল। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সূর্যদেব দুলতে দুলতে উঠতে শুরু করলেন। আমি সূর্যবাবুকে বললাম— ওই দেখুন, আপনার মিতে আপনাকেই বুঝি উঁকি মেরে দেখছেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— আপনি আর কোথাও শিকার-টিকার করেছেন? তদুত্তরে কিঞ্চিৎ কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন— না মশায়, ওসব বিদ্যে-টিদ্যেও আমার নেই, তবে শিকার দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আর তার চাইতেও ভালো লাগে সেটা খেতে। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আগমন। বলে তিনি কোঁত করে একটা ঢোঁক গিলে ফেললেন। যাই হোক, আবার সেই বিভিন্ন পাখির কলরবের মধ্যে এসে পড়লাম— আমার মনে হল, কালকের সেই বিরহী চকার ক্রন্দন এখনও যেন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে! আমি আনমনা হতেই আমাকে ঠেলা দিয়ে তুষার বললে— দেখুন, দেখুন দাদা, ওই চরে কত হাঁস, কত চকা, কত নাড়োল!— কতকগুলি অস্ফুট অব্যয় শব্দ ব্যবহার করে নৌকোর এধার থেকে ওধার পর্যন্ত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সে অস্থির হয়ে উঠল। তুষারের দৃষ্টি সম্মুখে আবার সূর্যবাবুর দৃষ্টির পশ্চাতে। কারণ তিনি মাঝে মাঝে বলে উঠছেন— খাবারের নৌকোটা ঠিক আসছে তো? তুষারের দিকে ফিরে বললাম— ধীরে, বন্ধু ধীরে, এত ব্যস্ত হলে পদ্মায় শিকার করা অসম্ভব! আমি সেকথায় উত্তর না দিয়ে তুষারকে বললাম— দেখ ভাই, আমায় প্রথম shot করতে দাও। সে রাজি হয়ে বলল— তাই হোক ধীরেনদা, তাই করো— তোমার শিকারের অনেক গল্পই শুনেছি। এবার চাক্ষুষ দেখা যাক!

আবার সেই কালকের চর। দেখেই মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল— তুষারকে একবার সেই পাঁকের মধ্যে ডুবিয়ে দি! কিন্তু ভাবলাম, টেনে তুলবে কে? বেচারা বড়ো ভালোমানুষ— সহজ, সরল, ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই— তাকে আমার বড়ো ভালো লাগে— তারপরেও সে আমার অতিথি। তুষার আমার ভাবান্তর লক্ষ করে বলল— তুমি হেসে উঠলে যে? আমি বললাম— ও কিছু না। বালিহাঁসগুলো কালকের মতো চরের মাঝে না বসে ঠিক জলের ধারেই বসেছে— এই যা সুবিধে। পাল্লার মধ্যে আসতেই আমার বন্দুক গর্জে উঠল— গুড়ুম, গুড়ুম! —কিন্তু একটাও হাঁস পড়ল না। প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করে ফিরে এল— গুড়ুম, গুড়ুম! তুষার আমার দিকে চাইল— তার দৃষ্টি তীক্ষ্ন— সে-চাউনির অর্থ— বাঃ, চমৎকার শিকারি বটে! সূর্যবাবু আমায় বললেন— ছাড়ান দিন— গুলি লাগুক-না-লাগুক, ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এই বলেই তিনি পিছনের নৌকোকে আমাদের নৌকোর কাছে আসতে বললেন। অন্য একদল পাখি এসে আবার সেই চরেই

BanglaBook.org

বসল। তুষার মারবার আগেই আমি আবার shot করলাম— এবারও চিচিং ফাঁক। কিছুই পড়ল না! তুষারের দৃষ্টি এবার তীক্ষ্ণতম। এ চাউনির অর্থ, আরে ছ্যাঃ— তুমি কোনো কম্মের নও। আমি ঘোর অপ্রস্তুত— এ-রকম তো আমার কখনো হয় না— এ কি কালকের সেই চকারই অভিশাপ!

তুষার আমায় ঠেলা দিয়ে বললে—

—তোমার মনে আছে ধীরেনদা, একদিন তোমাকেই সম্বোধন করে বলেছিলাম— আজ একজন মানুষের মতো মানুষ দেখলাম? আজ আবার সেই আমি তোমাকেই বলছি, হ্যাঁ, একটা শিকারির মতো শিকারি দেখলাম।

—দু-দু-বার যখন miss করেছি, তা বলতে পার বটে— তবে এটা আমার আসল রূপ নয়, কিন্তু আমাকে মানুষের মতো মানুষ আবার দেখলে কোথায়?

তুষার একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল— তারপর বলতে শুরু করে দিলে—

সেই যে মেদিনীপুরে মস্ত বড়ো একটা বিয়ের প্রীতি-সম্মেলন থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে আমরা ফিরছিলাম— বাংলার বড়ো বড়ো রাজন্যবর্গ, দু-একজন হোমরাচোমরা দেশনেতা, আরও বহু অ্যারিস্টোক্র্যাট ছিলেন— ফারপো-র অনুগ্রহে ট্রেনেই যাদের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল— সবারই আঁখিয়া লালে লাল— স্খলিত চরণের কত না বিচিত্র ভঙ্গি— মুখে খিস্তির ফোয়ারা বস্তিকেও হার মানিয়ে দেয়। সপ্তরথী মিলে তোমাকে অভিমন্যু বধের চেষ্টায় ছিল— তুমি কিন্তু একবিন্দুও ছুঁলে না!

—শুধু আমি নয়, তুমিও; আমি তবু সিগারেট খাই— তুমি আমার চেয়েও এক কাঠি সরেস— তাও খাও না— আবার সবারই মুখের ওপর কীরকম কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলে— খুব মনে আছে— সে কি ভোলা যায়!

—হ্যাঁ, ধীরেনদা, সেদিন তোমার আসল রূপ দেখেছিলাম— এক ধাক্কায় সবাইকে দূরে ঠেলে দিয়ে বললে— No earthly power can make me drink. সেদিন তোমার গলায় যে সুর উঠেছিল, তা এখনও আমার কানে লেগে আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাওড়া স্টেশনে নেমে আমায় বুকে জাপটে ধরে তুমি ওই ধরনের কী-একটা কথা বলেছিলে বটে!

এমন সময় খাবারের নৌকোটিও আমাদের কাছে ভিড়িয়েছে। সূর্যবাবুও তখুনি তড়াক করে ওই নৌকোয় লাফিয়ে গিয়ে চপ, কাটলেট প্রভৃতির সদ্ব্যবহারে মনোযোগ দিলেন। আমি মাঝিকে বললাম— ওই আলাতুলির চরে শিগ্‌গির নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাও। সূর্যবাবু খাবারের ডিশ হতে মুখ না তুলেই বললেন— হ্যাঁ, তাই হোক— কোনো আপত্তি নেই, তবে আমার ভোজনটা শেষ হবার পর! তাই করা হল— তারপর আমাদের নির্দিষ্ট পথে নৌকো ছেড়ে দিলে।

নৌকো চলেছে— হঠাৎ এক ঝাঁক স্নিপেট আমাদের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র বালুচরে এসে বসল। তুষার লাফিয়ে উঠে 'এবার আমি মারব' বলেই বন্দুকটা বেশ বাগিয়ে ধরে জুতসই হয়ে বসল— তারপর বন্দুকটা একবার উঁচু, একবার নীচু, এপাশ-ওপাশ দেখে ভালো করে তুলে ধরল— নিশানা করা চাই তো! তারপরই গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

BanglaBook.org

একেবারে double shot, অনেকগুলো স্নিপেট তুড়ুক তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠে শেষ হয়ে গেল। তুষারের কী চেঁচামেচি— আর কী আনন্দ! ভোজনবিলাসী সূর্যবাবু নৌকোর মধ্যে হতে কচ্ছপের মতো গলা বের করে বললেন— ওগুলো বেশ একটা আলুর মতো হবে— এখুনি ছাড়িয়ে শিককাবাব বানিয়ে খাব। তুষার কিন্তু ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বললে— না, আজকের সব শিকার কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। অগত্যা ভদ্রলোকটি আবার একটি ছোটো ঢোঁক গিলে চুপ করে রইলেন।

মাঝি স্নিপেটগুলো কুড়িয়ে আনবার পর, আমাদের নৌকো আবার চলতে লাগল। পথে আমার আর তুষারের মধ্যে সবরকমের আলোচনার দানা বেশ জমাট বেঁধে উঠল— কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, দর্শন, রাজনীতি— কিছুই বাদ পড়ল না। সব কিছুরই চচ্চড়ি বানিয়ে আমরা পূর্ণচ্ছেদ টানলাম। সূর্যবাবু পেটে হাত বুলিয়ে বললেন— আমার এ নৌকোয় থাকা আর পোষাবে না। ওই খাবারের নৌকোয় আমায় চাপিয়ে দিন। আমিও একটি ছোট্ট কেয়াবাত বলে তাঁকে পিছনের নৌকোয় উঠিয়ে দিলাম। একটু পরেই আলাতুলির চরে পদ্মার জলেই আমাদের নৌকোও এসে খস করে থেমে গেল!

দূরে ওই ধূসর বালুস্তূপ যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। তারই আশেপাশে অজস্র বালিহাঁস, চকাচকি আর নানান জাতীয় পাখি দেখে তুষারের আনন্দে হার্টফেল হয়ে যাবার জোগাড়। তার ভাবটা যেন, এক আওয়াজেই সে সব পাখিগুলোকে মেরে কুড়িয়ে আনবে। আমারও হাত নিশপিশ করছে। আমার ভাবগতিক দেখে সে আগেই বলে উঠল— 'না, ধীরেনদা, এবারটি তা আর হতে দিচ্ছি না।' 'তবে তাই হোক— নেমে যাও। আর দেখ, ওই যে রাখাল ছোড়াটা গোরু চরাচ্ছে, ওই ওকে আর গোরুটাকেও সঙ্গে নিয়ো— আর ওর মাথলটা তোমার মাথায় দিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে যেয়ো, বুঝলে!' 'সে আর বলতে হবে কেন? দেখ না, কী করি'— বলেই সে লাফিয়ে পদ্মায় নামল। সেখানে একটু বেশি জল— তার বুক পর্যন্ত ভিজে গেল। কিন্তু ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সে বন্দুকটি উঁচু করেই ধরে রেখেছে। আমি সহাস্যে বললাম— হ্যাঁ, দেখলাম বটে প্রথম নমুনা— তুমি কী কর! এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো উঠে এসে দিকি! সেকথায় কর্ণপাত না করে তাড়াতাড়ি সে তীরে উঠল— আর ভিজে বিড়ালটির মতো পাখিগুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। হ্যাঁ, একাগ্রতা বটে! অস্ত্রশিক্ষার সময় দ্রোণাচার্য যেমন তাঁর শিষ্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কী দেখছ? অর্জুন উত্তর দিয়েছিলেন, শুধু ওই পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, গুরুদেব। গুরু তখন অনুমতি দিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ করো। আজ্ঞার সঙ্গেসঙ্গেই অর্জুন পাখিটার চক্ষু বিদ্ধ করে ভূতলশায়ী করলেন! দুর্ভাগ্যবশত যদিও আজ আমি নিজেই দু-বার ব্যর্থ হয়েছি, তবুও গুরুর মতোই তাকে আদেশ দিলাম— এগিয়ে যাও— ঠিক পারবে। মাঝিও টোটার ব্যাগ ঘাড়ে করে তার সঙ্গে যেতে লাগল।

এদিকে পিছনে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সূর্যবাবু তখনও খুব নিবিষ্টচিত্তে ভোজন করে চলেছেন— তাতে কমা নেই, কোলন নেই, ফুলস্টপ নেই— তুষারের জলে পড়াটাও তিনি দেখতে পাননি! যদি পৃথিবীতে প্রলয় হয়ে যায়, তাহলেও হয়তো তিনি টের পাবেন

BanglaBook.org

না! এও আর এক রকমের একাগ্রতা! আবার ওদিকে তুষারও চলেছে রাখাল আর গোরুটিকে সঙ্গে নিয়ে। একবার উঠছে আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে। হঠাৎ সে বসে পড়ল। আমি দেখলাম, একটা দলছাড়া চকা একা একদিকে বসে আছে; কালকের সেই বিরহী চকা কিনা কে জানে! তুষার যে পাখির ঝাঁকের দিকে অগ্রসর না হয়ে বুদ্ধিমানের মতো সেই একটা চকার দিকেই এগিয়ে গেল, এতে তার শিকার চাতুর্যেরই পরিচয় পেলাম। কারণ, পাখির দঙ্গলের মধ্যে চেষ্টা করতে গেলে, যদি একটা পাখি ওড়ে, তবে আর তাদের কাউকেই পাওয়া যাবে না। তুষার বেশ তাক করে আওয়াজ করার সঙ্গেসঙ্গেই সেই চকার নিঃসঙ্গ জীবনটাও শেষ হয়ে গেল। চিরকল্লোলময় তুষার বন্দুক উঁচু করে নৃত্য জুড়ে দিয়েছে; তার আনন্দ দেখে মনে হল, এ-রকম শিকার তার ভাগ্যে বুঝি এই প্রথম। তার উচ্ছল প্রাণশক্তি দেখে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগল। তারপর ওই পাখিটাকে কুড়িয়ে আনার জন্য তুষার একটা লম্বা দৌড় দিতেই একবার ডিগবাজি খেল, কিন্তু উঠেই আবার ছুটল। চকাটি নিয়ে ফিরে আসবার সময় তার ভাবটা এই, যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসছে। তার প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে একটা দৃপ্ত ভঙ্গিমা। নৌকোয় উঠে তার মুখে যেন তুবড়ি ছুটতে লাগল, আর তার সঙ্গে কী প্রাণখোলা হাসি! এমন সময় এক ঝাঁক 'টিল' সামনে উড়ে আসতেই তুষারের উপর্যুপরি দুই নলের আওয়াজে চার পাঁচটা পাখি পদ্মার বুকে ঝুপঝাপ করে পড়ে গেল— তার সেদিনকার অব্যর্থ সন্ধান দেখে চমৎকৃত হলাম।

আমার তখন পেটে আগুন জ্বলছে, বেলা প্রায় দুটো। আমি বললাম— এসো, খেয়ে নেওয়া যাক। বলেই পেছনের নৌকোর দিকে ফিরে গেলাম। তখনও তুষারের প্রচণ্ড বক্তৃতা অনর্গল বয়ে চলেছে। ওই নৌকোয় গিয়ে দেখি সূর্যবাবু কুম্ভকর্ণের মতো নাসিকা গর্জন করে নিদ্রা যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি বড়ো টিফিন-ক্যারিয়ারটি এনে খুলে দেখলাম, সেটা একেবারে শূন্য। তুষারের বক্তৃতাও হঠাৎ থেমে গেল। তারপর—

তারপর আর কী? আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে বুদ্ধিমানের মতো চেয়ে রইলাম!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তুষার বললে— এতগুলো খাবার হল কী? শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলাম— সূর্যবাবুর পেট চিরে দেখো না কী হল।

আমরা ক্ষুধাতুর দুটি প্রাণী, পিছনে সেই মোটা বেঁটে ভদ্রলোকটি ভুঁড়ি খুলে নিদ্রা যাচ্ছেন।

আমাদের নৌকো আবার চলতে থাকে। তুষারের এত স্ফূর্তি যে কোথায় নিবে গেল, তার পাত্তাই নেই। অবশ্য তার সঙ্গে আমারও। তবে এইটুকুই পার্থক্য যে আজ আমি কিছুই শিকার পাইনি।

আমাদের অবস্থা দেখে বোধহয় মাঝিদের দয়া হল। তারা বললে— আমাদের চিঁড়ে-মুড়ি আছে হুজুর, দেব কি? আর কয়েকটা ডিমও আছে, হুকুম দেন তো সিদ্ধ করে দেই।

আমি বললাম— আজ আমার যে কপাল— দেখো আবার যেন সব ঘোড়ার ডিম না হয়ে যায়! আমার কথা লুফে নিয়ে তুষার বলে উঠল— দাও, দাও, তাই দাও! চিঁড়ে-মুড়ি

BanglaBook.org

নিয়ে নুন-তেল মেখে সবেমাত্র মুখে দিয়েছি, সূর্যবাবু জেগে উঠে তাঁর তেল-চুকচুকে প্রকাণ্ড টাকখানা বের করে বললেন— আপনাদের নৌকোয় যাব কি?

তুষার সেকথায় উত্তর না দিয়ে একবার শুধু ভ্রূভঙ্গি করে তার দিকে চাইল। তারপরেই মাঝিকে জোরে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে বললে।

ইতিমধ্যে অপর দুটি নৌকোও ফিরে এল। মাঝ-পদ্মায় আমরা সবাই মিলিত হতেই তুষার দূর হতে জিজ্ঞেসা করলে— তোমাদের শিকার-টিকার কিছু হল? তাদের মুখ বিবর্ণ— উত্তর এল কিস্সু হয়নি— পদ্মায় আবার কোনো ভদ্রলোক শিকার করতে আসে? আরে ছ্যাঃ!

তুষার সেকথা শুনতে পেয়েছিল কি না বোঝা গেল না, তবে খুব আগ্রহের সঙ্গে বললে— তোমাদের নৌকোয় কিছু খাবার-টাবার আছে?

তারা উত্তর দিলে— আমাদের খেয়েদেয়েও যথেষ্ট বেঁচে গেছে— মানুষ কি এত খেতে পারে?

—'পারে বই কী' বলে একবার পশ্চাতে চাইলাম— দেখি সূর্যবাবুর নৌকো অনেকটা পিছনে পড়ে আছে— তাই তাঁর অজ্ঞাতে আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে নিলাম। তুষার মৌনব্রত ভঙ্গ করে আবার মুখর হয়ে উঠল। আমাকে দেখিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে সে তার বন্ধুদের বললে— আজ ধীরেনদাও কিস্সু মারতে পারেনি। বলার সময় তার সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফের আড়ালে যে একটা চাপাহাসি লুকিয়ে ছিল, সেটাও বেশ লক্ষ করলাম। আমি নীরব— দৃষ্টি ব্যথাতুর। ভগবান বুঝি আমার অন্তরের ব্যথা টের পেয়ে এক ঝাঁক হাঁস আমার মাথার উপর পাঠিয়ে দিলেন।

তুষার বা অন্য কেউ তা লক্ষ করেনি। হাঁসগুলো যদিও দূরে— তবু পাল্লার মধ্যে আসতেই, আমি এঁটো হাতেই ভরা বন্দুকটা তুলে fly shot করলাম। একটা সুবৃহৎ বন্য রাজহাঁস উলটেপালটে ঝপাৎ করে পদ্মার বুকে পড়ল। তুষারকে বললাম— আর একবার আমার দিকে আগের মতো একটা কটাক্ষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করো তো বন্ধু! তুষার তখন লাফিয়ে উঠে আবার কী চিৎকারই শুরু করে দিয়েছে— তার কী আনন্দ!

হাঁসটা পড়েছিল সূর্যবাবুর নৌকোর ঠিক সামনেই। তিনি জল থেকে পাখিটা তাড়াতাড়ি তুলে হাতে করে ওজন নিচ্ছিলেন। তাঁর কাছে আসতেই তিনি সাড়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললেন— সের আড়াইটাক ওজন হবে নিশ্চয়, কি বলেন? বলে কোঁত করে একটা ঢোঁক গিললেন।

তুষার তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বললে— সেটা বাড়ি গিয়ে ওজন করব— এখন দাও তো পাখিটা।

সূর্যবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে হাঁসটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আমাদের নৌকোয় চেপে বসেই বললেন— নৌকোভ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো, ঘন ঘন খিদে পায়— হেঁঃ, হেঁঃ, হেঁঃ। খাবারদাবার কিছু আছে নাকি?

তুষার ওইসব খালি বাসনপত্রের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে— ওই দেখতেই পাচ্ছ তো— কিছুই নেই। বলেই মাথাটা এগিয়ে দিলে— তবে আমার এই মস্তকটাই

BanglaBook.org

আছে— চর্বণ করো।

আমাদের সকলের দম-ফাটা হাসি পদ্মার বুকে উথলে উঠে আবার পদ্মার বুকেই মিলিয়ে গেল।

সূর্যবাবু কিন্তু সপ্রতিভ; স্লিপেটগুলো ভালো করে গুনে দেখলেন— মোট উনপঞ্চাশটি।

আমাদের মধ্যে কে যেন টিপ্পনী কাটলেন— এবার সূর্যবাবুকে ফট্টিনাইনে পেয়েছে। তাতেও তাঁর মুখে কোনো ছাপ পড়তে দেখা গেল না!

হয়তো তিনি তখন শিককাবাবের চিন্তায় মশগুল।

তারপর—

এর পরেও আবার তারপর কী? আমরা হইহই করে বাড়ি ফিরে, স্নান সেরে কাপড়-জামা বদলে নিলাম।

তুষারের প্রাণে আজ স্ফূর্তির জোয়ার। তার নিজের হাসির তুফানে সে নিজেই হাবুডুবু খাচ্ছে। হারমোনিয়াম খুলে আলিবাবার সব গানগুলো এক এক করে সে গেয়ে যেতে লাগল, আর আমিও তবলায় চাঁটি দিয়ে বোল উড়িয়ে চললাম।

আসর ভরপুর। এদিকে কিন্তু সূর্যবাবুর পেটে আবার দ্বাদশ সূর্যের উদয়। তিনি গানের মজলিশ ত্যাগ করে সটান উঠে গিয়ে বেয়ারাকে বললেন,— 'শিগ্‌গির আমার খাবার আনো।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

শিকার অন্বেষণে গমনেচ্ছু ব্যক্তি বা শিকারীর পক্ষে সাধারণত যে সকল প্রচলিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, অথবা প্রাসঙ্গিকভাবে যে সকল বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিচয় থাকা প্রয়োজন, এই অংশে সেই সকল তথ্য বিভিন্ন শিকার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অবলম্বনে এস্থলে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

শিকারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

শিকারে যেতে হলে যথেষ্ট সরঞ্জামের প্রয়োজন এবং আয়োজনে কোন ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শিকারকালীন যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক তা সংগ্রহে ত্রুটি হলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়। শিকারের প্রধান সরঞ্জাম বন্দুক, টোটা, তাঁবু, খাটুলি, বিছানা। এছাড়া যাঁদের যেমন খেয়াল ও সখ সেই প্রকার জিনিসপত্র তাঁরা সঙ্গে নেবেন।

*

শিকার নানাভাবে হয়ে থাকে, যথা— হাওদা শিকার, হাঁটা শিকার, মাচা শিকার ও ডালা শিকার (আলো ও বাদ্যের সাহায্যে রাত্রে বনে প্রবেশ করে।)

*

হাওদায় যাঁরা শিকার করবেন, তাঁদের দু-রকমের রাইফেল রাখা কর্তব্য এবং ভালো 'প্লেনবোর' বন্দুকও থাকা চাই। 'প্লেনবোর' বন্দুক নিকটস্থ শিকারের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। 'এক্সপ্রেস রাইফেল' বিশেষত cordite গুলির penetrating power অর্থাৎ বিদ্ধ করার শক্তি অত্যন্ত অধিক, অথচ shocking power অর্থাৎ ধাক্কা দেবার শক্তি কম। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, যদি পঞ্চাশ-ষাট গজ দূর থেকে কোন বাঘ সবেগে আক্রমণ করতে আসে, এবং সেই সময় যদি তাকে .৩০৩, .৪৫০ বা .৪৭০ 'এক্সপ্রেস' বা 'কর্ডাইট' দিয়ে গুলি করা যায়, এবং তার ফুসফুসে বা মর্মে (heart or lung) যদি গুলি লাগে, তাহলে তার গতিরোধ হলেও হতে পারে, নচেৎ নিষ্ফল। কিন্তু ১২ বোর রাইফেল বা ঐ magnum দিয়ে গুলি করলে, সেই গুলি তার যেখানেই লাগুক, তাকে এক পটকান খাওয়াবেই খাওয়াবে! সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে শিকারী একটু সময় পাবেন।

*

আহার্য সামগ্রীর অভাবে শিকারীদের যাতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেজন্য সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই থাকা উচিত। চা, চিনি, বিস্কুট প্রভৃতি ড্রাই জিনিস, টিন ফুড এই সময় বিশেষ কাজে লাগে। লোকালয় থেকে বহুদূরে, দুর্গম গহন অরণ্যের মধ্যে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলে, চাল, ঘি, তেল, নুন, গুঁড়ো মসলা আটা প্রভৃতিও সঙ্গে কিছু কিছু থাকা প্রয়োজন।

BanglaBook.org

*

শিকারী দলের সঙ্গে একজন ডাক্তার বন্ধু থাকলে ভাল হয়। ডাক্তার না থাকলেও কতকগুলি 'ফার্ষ্ট এড্' দেবার মত ওষুধপত্র না নিয়ে শিকারে বেরুনোই উচিত নয়। একটি স্বতন্ত্র বাক্সে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি যথা— বোরিক অ্যাসিড, কারবলিক অ্যাসিড, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, আইওডিন, এ্যাসপিরীন, ডেটল, স্পিরিট, কুইনাইন, কলেরার প্রতিষেধক, ফ্লিট, সিট্রোনিলা অয়েল প্রভৃতি থাকা বিশেষ বিধেয়। এছাড়া ভাল ছুরি, কাঁচি, বড় টর্চ (একটি বা দুটি), ব্যাটারী, কাটারি এবং সম্ভব হলে বায়নাকুলার ও ক্যামেরাও সঙ্গে নেওয়া উচিত।

'শিকার-স্মৃতি' নামক জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর গ্রন্থ হইতে আংশিকভাবে গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৩৩১।

*

*   *

সাধারণতঃ বাঘ শিকারের জন্য ডবল-ব্যারেল বন্দুক (১২ বোর), রাইফেল .৪০০ অথবা .৩৭৫ ম্যাগনাম ব্যবহৃত হয়। কম বোরের বন্দুক ব্যবহৃত হয় অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জন্তুদের জন্য। 'সফ্ট-নোজ' বুলেটই সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'সলিড-বুলেট' বন্য মহিষ, বাইসন এবং হাতীর ক্ষেত্র ছাড়া ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। বন্দুক, কার্তুজ ও বুলেট প্রভৃতিগুলি সবই তাজা হওয়া চাই।

'With Gun and Rod in India.' The Govt. of India, Tourist Branch, Ministry of Transport, New Delhi, Price Rs. 3-00

*

*   *

শিকার, শিকারী ও জীবজন্তু সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য

অরণ্য-বিদ্যায় দক্ষ অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য ও শিক্ষা ব্যতীত হাতে-কলমে বনের জন্তুকে সন্ধান করে আবিষ্কার করবার বিদ্যা কোন রকমে লাভ হতেই পারে না। ...প্রথমত যে-জন্তু শিকার করতে যাবেন তার অভ্যাস, স্বভাব ও গতিবিধির সম্বন্ধে আপনার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

*

বনের ভিতর যে সব সুঁড়ি-পথ দিয়ে জানোয়াররা আনাগোনা করে, তা খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। ...আমরা যে শুনতে পাই, শিকার করতে গিয়ে অমুক লোক হঠাৎ মারা গিয়েছে কিংবা ঘায়েল হয়েছে, এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ তো নয়ই। এর মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিংবা দুঃসাহসিকতা; চলতি কথায় যাকে বলে, বোকামি ও গোঁয়ারতুমি!

*

BanglaBook.org

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক। তাই সাহস আর বুদ্ধি দুয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে এ খেলায় কোন আমোদই থাকত না!

*

শিকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদ দেওয়া উচিত। তিনিই এ রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এই রাজকীয় সংখ্যা অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্য-প্রদেশে তাদের নির্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

*

যে ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, যার যথার্থ এ-সম্বন্ধে যার অনুরাগ আছে, সে কখনও নির্বিকার জীবহত্যা করে না। যাদের সঙ্গে শত্রুতাচারণ করে, তারা প্রায়ই প্রবল জোয়ান। আর যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শিকার যাদের ব্যবসা ও জীবিকাঅর্জনের উপায়, তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করে না; জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা নিয়মিত করার চেষ্টা তাদের আদৌ নেই! এই অত্যাচার রহিত করার জন্যে অনেক বিধি-বিধান প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আরও সতর্ক ও সাবধান হওয়া আবশ্যক।

*

নরমাংস ও মৃগমাংস লোভী ব্যাঘ্রদের কথা বলতে গেলে বলা উচিত তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও এক জাতীয়। তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের কিছু উপর (রোলাণ্ড সাহেবের পরিমাণরীতি অনুসারে)। শস্য-শ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্ররাজ'। বঙ্গভূমির জল-বাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়। তাই তারা দেখতে শহরের কাঙাল কেরানীদের মত নয়। মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজা-রাজড়ার মত মেদমাংসবহুল। চাল-চলনও বিশেষ গম্ভীর রকমের। ...তারা চতুর, সতর্ক, দ্রুতগতি, সহসা তাদের শিকার করা কঠিন।

*

ব্যাঘ্রের স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আয়তনে ও চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশী। এইভাবেই বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়। ...সন্তান-পালন ও রক্ষণের জন্যও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশী সতর্ক হতে হয়। কেন না, বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করার জন্য অনেক বুদ্ধি খরচ, অনেক ফন্দী আঁটা দরকার। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণপোষণের ভার নিজেকে না নিলে চলে না। যিনি জন্মদাতা তিনি কিছুই করেন না; উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন সেই মতলবে ফেরেন। ছেলেগুলি যখন কিছু বড়সড় হয়ে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়, তখনই তাদের মায়ের ভাবনা যায়।

*

বাঘ কিংবা চিতা জলের ঘেঁষ নিতে চায় না মনে করা ভুল। সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্যি, তবে দরকার হলে স্রোতে গা-ভাসাতে আপত্তি কিংবা অনিচ্ছা দেখায়

BanglaBook.org

না। ...এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হয়ে যায়।

*

পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া যায়। চিতাদের সম্বন্ধেও এ কথাটা খাটে। বাঘের পায়ের দাগ অনেকটা চৌকো গড়নের; বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে বাচ্চাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে ওঠা দায়। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্যারও মীমাংসা করা যেতে পারে। পায়ের একটা দাগ হতে অন্য দাগের ব্যবধান কতখানি দেখলেই সেটা সহজে বোঝা যায়। পায়ের দাগের আকার দুইয়েরই সমান; তবে খোকা বাঘের পায়ের ফাঁদ খাটো, আর খুকীর লম্বা।

*

বাঘ ও চিতার শিকারপদ্ধতি ভিন্ন। বাঘ কোন জন্তুর পিঠে বা ঘাড়ে পড়েই সামনের পায়ের থাবা দিয়ে তার ঘাড় মটকে ভেঙে দেয় এবং মারবার পরই তাকে মুখে করে কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন ঝোপের আড়ালে কিংবা তলায় লুকিয়ে রাখে। চিতা তার শিকারের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে বা গলায় কামড় দিয়ে ধরে থাকে। জন্তুটি মরে পড়ে গেলে তবে তাকে ছাড়ে। লোকে বলে রক্ত শুষে নেবার জন্যে সে এমন করে; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে এটাকে সাক্ষ্যরূপ মেনে নেওয়া যায় না।

*

একই দৈর্ঘ্য ও আয়তনের বাঘ বা চিতা কিন্তু ওজনে সমান। একটা বড় বাঘের ভারে একখানি বড় শক্ত চারপাই মড় মড় করে ভেঙে পড়তে পারে। চিতা ওজনে ১ মণ ৩৫ সেরের বেশী হতে প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটি বড় বাঘ ওজনে সাড়ে ৭ মণ পর্যন্ত হতে পারে।

*

এদেশীয় ভল্লুক আলাস্কাবাসী ভ্রাতার মত বৃহদাকার হয় না, তবুও তার দৈর্ঘ্য ও আয়তন কিছু মন্দ নয়। কখন কখন তাদের প্রায় ৭ ফুট কিংবা তার কাছাকাছি হতে দেখা যায়। ...মানুষের মত সমস্ত পায়ের পাতা দিয়ে সে হাঁটে। পথে যে পায়ের চিহ্ন রেখে যায়, তাও মানুষের মত। ... ভালুক আক বড় ভালবাসে; যে সব চাষীর আকের ক্ষেত একটু নির্জন জায়গায়, সেখানে এদের ক্ষেত-ছাড়া করা বড়ো শক্ত কাজ। ...আহার সন্ধানে এরা বড় শুদ্ধাচারী। বেশীরভাগ ফলমূল খেয়েই জীবনধারণ করে। তা বলে সম্পূর্ণ অহিংস বলা চলে না। নিতান্ত দায়ে পড়ে মাংস ভক্ষণও করে থাকে। ভালুক তার ছানাদের পিঠে করে ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়। তার নখ এবং দাঁত দুই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক। এর দ্বারাই শত্রুকে আক্রমণ করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

BanglaBook.org

*

শিকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শিকারীর প্রধান কর্তব্য একে অপরকে প্রীত মনে সাহায্য করা। যদিই বা শিকার নিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয়, তা'হলে

শিকারকর্তা এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন সেইটিই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল, তবু কলহ করে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনও উচিত নয়।

'ঝিলে-জঙ্গলে শিকার'— কুমুদনাথ চৌধুরী। প্রিয়ম্বদা দেবী কর্তৃক গ্রন্থকারের 'Sports in Jheel & Jungle' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ থেকে অংশত গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৩৩১।

*

ব্যাধের শিকার উপজীবিকা মাত্র, কিন্তু ভদ্রের শিকার খেলার (sports-এর) পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং ব্যাধের হত্যা ব্যাপক হতে পারে, কিন্তু ভদ্রের শিকার বিচারসহ মাত্রার মধ্যে হতেই হবে। খেলার জন্যে হলেও ভদ্র-সন্তানের মনে রাখতে হবে যে শিকার অতি নিষ্ঠুর খেলা— এ যাতে মানুষকে হিংস্র বা ঘৃণ্য করে না তোলে তার জন্যে অনেক সময়ই সজ্ঞান সাবধানতা দরকার।

*

সংযত ভাবে শিকার করলে মানুষের মন সবল থাকে, উৎসাহ যোগ্য হয়, শরীরে চর্বি বাড়তে পারে না, লোকে আত্মবিশ্বাসী হয়, কষ্টসহিষ্ণু হয়, মানুষের মন অযথা দুর্বল হয় না ইত্যাদি। আবার অতিরিক্ত শিকার-প্রিয় হলে মানুষের মন চঞ্চল হয়, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়, স্বাস্থ্য ক্ষয় পায়, মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে এবং তার আচরণ কর্কশ হয়— ফলে এ হেন লোকের সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং ভদ্র-শিকারী হতে হলে সর্বদা মাত্রাজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন থাকতেই হবে।

*

জায়গার তারতম্য অনুসারে শিকারের লক্ষ্যবস্তু এবং শিকারের প্রণালীরও পার্থক্য ঘটে।

...পলি মাটির জঙ্গলে শিকার দুই রকমের করা চলে— (১) সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকা, মোটর বোট অথবা ষ্টীমলঞ্চ নিয়ে, (২) অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটির জঙ্গলে, যেমন শ্রীহট্ট এবং আসামের সমতটের জঙ্গলে হাতী নিয়ে শিকারই সহজসাধ্য। পাহাড় অঞ্চলে শিকার— (১) পায়ে হেঁটে, (২) মোটর গাড়ি চলার রাস্তা থাকলে, মোটর গাড়ি চড়ে রাত্রিতে আলো নিয়ে, (৩) মাচান থেকে, (৪) অথবা হাঁকাও করে করা চলে।

সম্ভবপর জায়গায় বন হাঁকাও করে শিকারই সুবিধা। সব দেশে আবার হাঁকাও করার লোক পাওয়া সহজ নয়। কাজেই দেশ, কাল এবং আপন সামর্থ্য অনুসারে শিকারীকে শিকারের লক্ষ্য, স্থান এবং উপায় ঠিক করে নিতে হবে।

BanglaBook.org

*

যেখানেই শিকার করতে যাওয়া যাক না কেন, প্রথম প্রথম অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত শিকারীর সঙ্গে গিয়ে বন-জঙ্গল ও শিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। শিকারের জায়গা ও জন্তু-বিশেষের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন শ্রেণীর বন্দুক ও গুলি ব্যবহার করা উচিত তা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। গুলি ও বন্দুক নির্বাচনের উপর শিকারের সাফল্য অনেক

পরিমাণে নির্ভর করে।

...সম্ভবপর হলে বন্দুক চালনা সম্বন্ধে আবশ্যক শিক্ষা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে নেওয়া ভালো। শিকারে বেরুবার পূর্বে নিজের নিশানার অব্যর্থতার উপর আস্থা জন্মানো চাই— সেটা কিছু ব্যয় এবং আয়াস সাধ্য কিন্তু অপরিহার্য।

*

আপনি কি শিকার করতে চান সেটা মোটামুটি ঠিক করে নিয়ে শিকারের জায়গা নির্বাচন করা উচিত এবং সেই অনুসারে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেই শিকার কোন্ সময়ে গেলে সুবিধামত পাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সাধারণতঃ প্রায় সব জায়গায় মোটামুটি সব রকম শিকার করতে হলে জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সময় সুবিধাজনক। গবয় ও বন্য মোষ শিকারের পক্ষে বৈশাখের প্রথম বৃষ্টি হবার পর যাওয়াই সুবিধা।

'শিকারের কথা' নামক ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ-র গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রকাশকাল, ১৩৫৫।

*

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, মানুষের সাড়া পেলেই বনের ভিতর থেকে বাঘ-ভালুক গর্জন শুরু করে। আসলে কিন্তু তা নয়— দেখা গেছে, দিনের পর দিন ক্যাম্প করে বনে বাস করলেও বাঘ-ভালুকের ডাক খুব অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ জঙ্গলে তাদের চলাফেরা টের পাওয়া যে যায় না তা নয়।

*

পশুদের মধ্যে হিংস্র জীব বলতে বাঘের কথাই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে বাঘ সেরকম হিংস্র নয়। নিজের খাবারের তাগিদেই সে শিকার করে এবং যাকে আক্রমণ করে, মুহূর্তের মধ্যেই তার যন্ত্রণা শেষ করে দেয়। ...কিন্তু খাবারের জন্যে শিকারের তাগিদ না থাকলে মানুষ বা অন্য কোন জানোয়ার দেখলে পাশ কাটিয়ে যায়। তবে প্রায়ই দেখা যায় যে, বাঘিনী অনবরত শিকার করে বাচ্চাদের শেখাবার জন্যে; কিন্তু ভালুকের বেলায় তা নয়— অনেক সময়েই দেখা যায় যে তারা পথ আটকে দাঁড়ায় এবং বিনা কারণে চার্জ করে। সাধারণতঃ বাঘ বুড়ো হলে যখন বুনো জন্তু শিকার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখনই গোরু, ভেড়া প্রভৃতি জানোয়ারের দিকে ধাওয়া না করে মানুষের দিকে লক্ষ্য যায়— তখনই আশপাশের গ্রামের লোকদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

*

বাঘের চার্জ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তার গায়ে গুলি লাগলে শতকরা আশী ভাগ ক্ষেত্রেই সে মুখোমুখি চার্জ করে। শতকরা ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে— যে-দিক থেকে গুলি করা হয়, সে-দিক লক্ষ্য করেই চার্জ করে। আর বাকী শতকরা পাঁচভাগ ছোবা থেকে দেখে দেখে চার্জ করে।

BanglaBook.org

*

বাঘ একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেলে তা ভুলতে পারে না। অনবরত মানুষ মেরে চলে। এ সম্বন্ধে অনেক রকম মত আছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের মাংস বেশ সুস্বাদু— সেই জন্যই বাঘ মানুষ মারে। আবার অনেকের বিশ্বাস, বুড়ো হলে যখন শক্তি কমে আসে, তখন মানুষ শিকার সহজ বলে সে মানুষ শিকার করে।

*

বাঘ এক বছরের হলেই তার সঙ্গী খুঁজে নেয়। অনেক দিন পর্যন্ত তারা এক সঙ্গেই থাকে। ক্রমশঃ বাচ্চাদের কলরবে তাদের সংসার ভরে ওঠে। বাঘ কিন্তু তার পুরুষ-সন্তানকে মোটেই সহ্য করতে পারে না, কারণ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার বাপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

*

শীতের সময় বাঘ রোদে গা মেলে দিয়ে আরাম করে, গরমের দিন আবার গাছের ছায়ায় কিংবা পাহাড়ের গুহায় গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকে। বাঘের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। চলন্ত জিনিসই বাঘের চোখে পড়ে সহজে এবং স্থির জিনিস অনেক সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে বসে থাকলেও বাঘ হয়ত অনেক সময় লক্ষ্যই করে না, কিন্তু কোন লোক হঠাৎ গাছে উঠছে দেখতে পেলেই সেদিকে তার চোখ যায়। ভারী শিকার সঙ্গে নিয়েও বাঘ অনায়াসে প্রায় পনর ফিট লম্বা খাল লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারে।

*

শিকারীদের মতে বাঘকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।— (১) Man-eater-মানুষখেকো, (২) Cattle-lifter—সাধারণতঃ এরা বেশ মোটা ও ভারী। সেইজন্য অনায়াসে মোষ, গোরু ইত্যাদি মুখে করে নিয়ে যায়, (৩) Game-killer— এরা হরিণ, শূকর প্রভৃতি বুনো জানোয়ার মেরে খায়। এদের শরীর অন্যান্য বাঘের তুলনায় হালকা ধরনের।

*

চিতা বাঘকে অনেক সময়েই হিংস্র হতে দেখা যায়। ...যে জঙ্গলে বাঘ খুব বেশী আছে, সেখানে চিতা খুব কমই দেখা যায়; আবার বাঘ কমলে চিতার সংখ্যা বাড়ে। চিতারা গাছে উঠতে পারে। অনেক সময় মুখে শিকার নিয়ে ১৪-১৫ ফিট লম্বা গাছ বেয়ে উঠে যায়। চিতারা বাঘের চেয়ে নিঃশব্দে বনের মধ্যে চলাফেরা করে। শিকারে গেলে বাঘের আসা-যাওয়া হয়ত টের পাওয়া যাবে, কিন্তু চিতা হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে চোখের সামনে এসে পড়ে— কি করে, কোথা দিয়ে এলো কিছুই টের পাওয়া যায় না। অন্ধকারে বাঘের চোখ আগুনের গোলার মত জ্বলতে দেখা যায়। রাত্রে বাতির আলোতে সব মাংসাশী জীবের চোখ লাল এবং অন্য সব জীবের চোখ সবুজ দেখা যায়।

*

শিকারীর কোন সময়েই বন্দুক ছাড়া জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নয়। ... কোন সময়েই

BanglaBook.org

cross-fire করা বা বন্দুকে গুলি থাকুক বা না থাকুক, ঠাট্টা করে কোন মানুষের দিকে টিপ করা উচিত নয়। অহিংস মাদী জানোয়ার শিকার করাও নিষেধ।

*

হাতী কতটা উঁচু তার সামনের পায়ের পরিধি থেকেই বোঝা যায়। দড়ি দিয়ে পরিধি মেপে দেখলেই দেখা যাবে যে, হাতী ঠিক তার পায়ের দ্বিগুণ উঁচু।

*

Beat প্রথায় শিকার হলো বাঘকে জাগিয়ে ক্রমশঃ মাচানের অথবা stop-এর কাছে টেনে আনা। ...পিছন থেকে তাড়া দিয়ে সামনে শিকারীর দিকে নিয়ে যেতে হয়। যাতে সে পালাতে না পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার। খুব বড় জঙ্গলে হয়ত বাঘের খবর পাওয়া গেছে, তখন বাঘ ঠিক কোথায় আছে জানতে হলে, তিন-চার জায়গায় ছাগল বেঁধে চেষ্টা করে দেখতে হয়। যেখানে নালা বা ছোট নদী আছে, সেখানেই ছাগল বেঁধে রাখা দরকার। কারণ, খাবারের কাছে বাঘের জল থাকা চাই এবং ছাগলটা যাতে সব সময় ডাকে এরকম ব্যবস্থা করা চাই— তা না হলে বাঘ টের পাবে কী করে! ...বীটের ব্যবস্থা করতে হলে অনেকটা জায়গা বেছে নিতে হবে। বীট যেখানে করা হবে, সেটা অন্তত ৭৫০-৮০০ গজ লম্বা হওয়া চাই, যাতে বাঘের সামনে বেশ খানিকটা জায়গা থাকে। ...তারপর মাচান থেকে জঙ্গলের দু-পাশে পরপর বাঘ যেখানে থাকা সম্ভব সে পর্যন্ত লোক সাজান থাকে— যারা জঙ্গলে বীট করবে। প্রথম বাঘের ঘুম ভাঙানোর জন্য বীটাররা চেঁচাতে থাকে। ক্রমে বাঘ জেগে চোখ মেলে চায় এবং শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেখান থেকে দূরে যেতে চায়। জঙ্গলের দু-দিক থেকেই শব্দ হলে, সে জঙ্গলের মাঝখানে এসে পড়ে— বীটাররা পিছনে শব্দ করে আসতে থাকে। বাঘ ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে যেতে মাচানের মুখেই পড়ে যায়; তখন শিকারী তাড়িয়ে আনা বাঘটাকে খুশিমত শিকার করে।

*

বাঘ গুলির আঘাতে জখম হলে কখনও পায়ে হেঁটে তার কাছে যাওয়া উচিত নয়— অন্তত দু-ঘণ্টা সময় দিয়ে নিজেকে ঠিকমত প্রস্তুত করে তবে এগিয়ে যেতে হয়।

*

উঁচু শক্ত গাছের উপর বসে যে শিকার করা হয়, তাকেই মাচান-শিকার বলা হয়ে থাকে। মাচানের জায়গাটা বেশ মজবুত ও প্রশস্ত হওয়া চাই। মাচানে চুপ করে বাঘের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকাই সার হয়, বাঘ আর মেলে না। কিন্তু শিকারী অধীর হলে শিকার হারাতে হয়— অসীম ধৈর্য আর কষ্টসহিষ্ণুতা না থাকলে চলে না। অনেক শিকারী Spot-light ফেলে জানোয়ারকে বিব্রত করে শিকার করতে ভালবাসে। এতে জানোয়ারের চোখ ঝলসে যায়, সে কিছুই বুঝতে পারে না, আচমকা গুলি এসে তাকে শেষ করে দেয়— জানোয়ারকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় না— এতে কোন আনন্দ নেই।

BanglaBook.org

*

কয়েকটি জানোয়ার থেকে আত্মরক্ষার উপায়। যথা— সাপ তাড়া করলে এঁকে-বেঁকে ছুটতে হয়, কখনো সোজা যেতে নেই। বন্য শূকর আক্রমণ করলে ডাইনে অথবা বাঁয়ে হঠাৎ সরে যেতে হয়। শূকর সোজা বেরিয়ে যায়, চট করে ঘুরতে পারে না। বন্য মহিষের কবলে পড়লে, কোন নালা বা গর্তের ভিতরে শুয়ে পড়লে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। মোষ নালা টপকে বেরিয়ে চলে যায়। হাতী পিছু নিলে নড়বড়ে পুলের তলায় আশ্রয় নিতে হয়। হাতী শুঁড় দিয়ে বুঝতে পারে, পুল তার দেহের ভার সইতে পারবে কিনা। যে জিনিস তার ভার সইতে পারবে না, তার উপর তারা কখনও যায় না।

*

কোনো জানোয়ারের ছাল মাটিতে পাপোশ বা কারপেট হিসাবে ব্যবহারের জন্য রাখতে হলে ঠিক পেটের মাঝামাঝি কাটতে হয়। মুখ থেকে ন্যাজ পর্যন্ত mount করে দেওয়ালে রাখতে হলে মাথার দিক থেকে ছাড়াতে হয়। এক কথায় বলতে গেলে ছালটা এমন ভাবে ছাড়াতে হয় যাতে সেলাইটা কোন রকমে চোখে না পড়ে। এরকম ভাবে ছাড়িয়ে নিতে হয় যাতে একটুও মাংস বা চর্বি লেগে না থাকে। নাকের ও চোখের নীচের মাংস খুব সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হয়। বাঘ, চিতা ও সিংহের বেলায় মাথার খুলির খুব কাছ থেকেই কানের চামড়া ছাড়াতে হয়। কানের ফুটো দুটো যাতে ঠিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ছালে কোন মাংস বা চর্বি লেগে থাকলে শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে লোমগুলো নষ্ট হয়ে খসে পড়ে। ছাল থেকে সম্পূর্ণভাবে মাংস ছাড়িয়ে নেবার পর নুন এবং ফিটকিরি গুঁড়ো করে সমান অংশে মিশিয়ে চামড়ায় লাগিয়ে দিতে হয়। চোখের পাশে, নাকের ফুটোর মধ্যে, নীচের ঠোঁটে, কানের ভিতরে এবং বাইরে খুব ভালোভাবে লাগানো চাই। তারপর ছায়ায় শুকোতে দেওয়া দরকার। মুখটা হাঁ করিয়ে রাখতে হয় যাতে বাতাস চলাফেরা করতে পারে। রাতে চামড়াটা বিছিয়ে পাথর চাপা দিয়ে রাখা চলে। শুকোবার সময় সমান ভাবে টান দিয়ে রাখা উচিত, এবং তুলে রাখার আগে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার যে কোন রকম নষ্ট করছে কি না। ছাল প্যাক করে পাঠাবার সময় লোমের অংশ ভিতর দিয়ে রেখে টারপিন তেল ছিটিয়ে কিম্বা ন্যাপথলিন দিয়ে গুটিয়ে প্যাক করা উচিত। কখনও রোদে শুকোতে দিতে নেই।

*

নতুন শিকারীর কোন সময়ই বন্দুক ছাড়া জঙ্গলে ঢোকা উচিত নয়। শিকারের যিনি নায়ক তাঁর কথা মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। কোন সময়েই বা বন্দুকে গুলি থাকুক বা না থাকুক ঠাট্টা করেও কোনও মানুষের দিকে টিপ করা উচিত নয়। অহিংস মাদী জানোয়ার শিকার করা নিষেধ।

'আসামের জঙ্গলে' নামক সুধাংশুকান্ত আচার্যের গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ গৃহীত। ময়মনসিংহ প্রিন্টার্স লিঃ, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। প্রকাশকাল, ১৩৫২।

*

বন্দুক স্কন্ধদেশের মূলভাগে স্থাপন করতে হয়। তাছাড়া বাঁ হাতে শক্ত করে বন্দুক না ধরে, হালকা হাতে, হাতের পাঞ্জা ঠিক ব্র্যাকেটের মত সঙ্কোচ করে তার উপর বন্দুক স্থাপন করা বিধি। শিকারের সময় অনেকে বাঁ চোখ মুদ্রিত করেন, কিন্তু বাঁ চোখ না বুজে ডান চোখ বুজে 'নিশানা' করলেই সহজে লক্ষ্য স্থির হয়। হালকা নরম হাতে বন্দুকের কুঁদো ধরা ঠিক নয়। তার পরিবর্তে বন্দুক শক্ত হাতে বুকের দিকে চেপে রেখেই গুলি ছোঁড়া উচিত। তাতে তীব্রভাবে পিছু ধাক্কা মারার ভয় থাকে না।

'শিকার-কাহিনী' নামক সূর্যকান্ত আচার্যের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। সান্যাল এণ্ড কোং, কলিকাতা। প্রকাশকাল, ১৩১৩।

*

শিকারী হওয়া একটা শিক্ষা। এ-শিক্ষা বিনা সাধনায় হয় না। এই সখের জন্যে যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতে হয়। শুধু তাস-পাশা খেলে অবসর সময়ে দুই-চারিটি চাঁদমারী করিলেই শিকারী হওয়া যায় না। এর জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিশেষ পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন।

'শিকার ও শিকারী' নামক ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর গ্রন্থ হইতে গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৩৩৬।

*

এদেশে বন্দুক-রাইফেলের যখন বিশেষ প্রচলন হয়নি, তখন বাঘ ও বন্যবরাহ— জাল পেতে বড় বড় বর্শার দ্বারা শিকার করা হ'ত।

*

শিকারের আরও একটি কৌশল ছিল : বাঘের অত্যাচার হলে বাণ বা 'বিশাল' পাতা। যে-পথে বাঘ চলাচল করে, রাত্রে সেখানে ফাঁদ পাতা হত, দড়িতে পা দেওয়া মাত্রই, ভীষণ তীর— নাম 'বিশাল' তাকে বিদ্ধ করত। কখনও কখনও সেটা বিষ-মাখানোও থাকত। বিশাল পাতবার পূর্বে পথিক ও দেশস্থ লোকজনকে সাবধান করে দেওয়া হ'ত— যেন সে অঞ্চলে তারা রাত্রে না যায়। এ ছাড়াও বাঘ মারবার জন্যে বহু প্রকার খাঁচা তৈরী হ'ত— তার মধ্যে ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বাঘের লোভনীয় খাদ্য এমনভাবে রেখে দেওয়া হ'ত যে, বাঘ ভিতরে এসে প্রবেশ করলেই ফাঁদে আটকা পড়ে যেত। ফাঁদ পাতারও বৈজ্ঞানিক মাপজোক ছিল— এবং এতেও শিকারীর সাহস ও নিপুণতা প্রকাশ পায়।

BanglaBook.org

*

কোনও কোনও জাতির মধ্যে বন্যজন্তু শিকারে, গর্ত করে শিকার ধরার প্রথা এখনও বর্তমান আছে। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে বন্যশূকর শিকারের জন্যই শিকার-যাতায়াতের পথে এই উপায় অবলম্বন করা হয়। জন্তু-জানোয়ার সাধারণতঃ যে-পথে চলাফেরা করে, যাকে game-track বলা হয়, সেখানে নীচু জায়গা থেকে ওপরে উঠবার পথের কোনও বাঁকে এইরকম ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। পাঁচ-ছ-ফুট লম্বা— ওপরে দু-আড়াই ফুট প্রশস্ত, নীচে চার-পাঁচ ফুট গভীর গর্ত করা হয়। তলদেশ সংকীর্ণ, উপরের পরিসর চার-পাঁচ ফুট

হলে, নীচে থাকবে দেড়ফুট দু'ফুট। গর্তের মুখে বাঁশ অথবা নল-খাগড়ার সরু সরু কাঠি দিয়ে ঢাকা থাকে— তার উপর ঘাস ইত্যাদি দিয়ে চারপাশের জঙ্গলের সঙ্গে মিশ খাইয়ে দেওয়া হয়— যাতে, সেখানে যে একটা নূতন কিছু হয়েছে, তা যেন জানোয়ারে টের না পায়। সাধারণতঃ শূয়োর ধরার জন্যই এই ব্যবস্থা।

*

আমাদের দেশে, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হওয়ার প্রথম দিকে, যে-সব ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাবিক, সৈনিক ও কর্মচারী এদেশে আসতে থাকেন, তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার এদেশের লোককেও শিক্ষা দেন। মুঙ্গেরে দেশী বন্দুকের কারখানা স্থাপিত হয়। স্থানীয় কারিগরগণ বন্দুক তৈরী করতে আরম্ভ করেন। ...কিন্তু যদিও উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, তবুও দেশে এত বেশী সংখ্যায় শিকার ছিল যে, শিকারী যথেষ্ট শিকার পেত। সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে, কোম্পানির রাজত্বকালে, পুনার কাছে একজন ব্রিটিশ অফিসার দু-মাসের মধ্যে চল্লিশটি সিংহ শিকার করেছিলেন। সে সময় কোনও ভাল শিকারীর পক্ষে একশো দেড়শো বাঘ মারাটা একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল না।

*

বন্যজাতির মধ্যে (শিকারের জন্য) অবশ্য তীর-ধনুকই বেশী প্রচলন ছিল। গারো অঞ্চলে ভল্ল ও দা'(স্লাম) শিকারের অস্ত্র। তারা তীর-ধনুক ব্যবহার করে না। আসাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে হাতী মারবার জন্যে স্থানীয় শিকারীরা গাদা-বন্দুকই বেশীর ভাগ ব্যবহার করত। হাতীর মত বিশালকায় জন্তুর কড়া চামড়া ও হাড় ভেদ করার জন্যে তারা সীসের সঙ্গে টিন মিশিয়ে শক্ত করে নিত। সীসে ও টিন একসঙ্গে গালিয়ে বালি অথবা মাটির মধ্যে গর্ত করে ঢালাই করা হ'ত। হাতী-শিকারের সময় সাধারণ পরিমাণ অপেক্ষা অনেকটা বেশি বারুদ ভর্তি করা হ'ত। যাতে অতিরিক্ত চাপে নল ফেটে না যায়, সেজন্য নলের গোড়ার দিকটা লোহার তার বা বেত দিয়ে খুব মজবুত করে বেঁধে নেওয়া হত।

*

আমাদের দেশের বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গের শিকার-খ্যাতি সাগর পারেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নেপালের মহারাজা ও কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরও পূর্বে পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রঞ্জিৎসিংহের পুত্র দলিপসিংকে ইংরেজ যখন শিক্ষার্থে ইংলণ্ড নিয়ে যায়, সেখানে তিনি বন্দুক চালনায় এতটা দক্ষতা অর্জন করেন যে, ওখানকার শ্রেষ্ঠ লোকদের সমকক্ষ বলে তাঁকে সম্মান দেওয়া হ'ত। বিকানীর ও ঢোলপুরের মহারাজার উড়ন্ত পাখী শিকারের নৈপুণ্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকারীর সমতুল্য। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং ব্যারিস্টার কুমুদনাথ চৌধুরীর শিকার-নৈপুণ্য সম্বন্ধে বাংলা দেশের সকলেই অবহিত আছেন। বর্তমান শিকারীদের মধ্যে সুরগুজার মহারাজাও একজন বিখ্যাত শিকারী। তিনি আফ্রিকায় সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, জলহস্তী প্রভৃতি হিংস্রজন্তু শিকার করেছেন। কয়েক বছর আগেই তাঁর Royal Tiger শিকার ছিল ১,১১২ এবং ২,০০০ চিতা বাঘ।

Banglabook.org

সে যুগে ঘোড়া ছুটিয়ে বর্শা দিয়ে বন্যবরাহ বিদ্ধ করা (Pig-sticking) শিকারে একটা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। এর জন্য অশ্বকে উপযুক্ত শিক্ষাও দেওয়া হত। এই শিকারের নিয়ম এই যে, ঘোড়া ছুটিয়ে বর্শা দিয়ে শূকর বিদ্ধ করে বর্শা তুলে নিতে হয়। স্ত্রী-শূকরকে শিকার করা হয় না।

*

হাতি খুব উঁচু জায়গায় উঠতে পারে, আবার ঢালুতেও নামতে পারে। অতি সংকীর্ণ খাড়াই পাহাড়ের পথে কিভাবে যে তারা ওই বিপুল দেহ নিয়ে ওঠা-নামা করে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। উঠবার সময়, তারা পা গুটিয়ে নেয় আর পেছনের দুই পায়ের ধাক্কায় দেহটাকে উপরে তুলে দেয়। আবার নামবার সময়, পেছনের দু'পা গুটিয়ে নিয়ে, সামনের দু'পা লম্বা করে দিয়ে হড়হড়িয়ে নেমে যায়।

*

হাতীর দোষেরও সীমা নেই। অকারণে মনুষ্যহত্যায় হাতী পশ্চাৎপদ নয়। প্রতিশোধস্পৃহা ভয়ংকর, শস্য নষ্ট করতে অতিশয় তৎপর— বৃক্ষাদিও নষ্ট করে। এই দেশেরই বানর, হরিণ, বিশেষতঃ হাতির অত্যাচারে বৎসরে প্রায় নব্বুই কোটি টাকার শস্যহানির সংবাদ পাওয়া যায়।

*

এদেশে হস্তী শিকার অপেক্ষা হাতী ধরা ও বশ করে শিক্ষা দেওয়ার প্রথাই বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। ...শিক্ষিত হস্তী যেমন শিকারের অঙ্গ, তেমনি জাঁকজমকের খাতিরে এবং কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের কাজে হাতীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। সমস্ত প্রাচ্য দেশেই হাতী একটি মূল্যবান সম্পত্তি। যার জন্য আজও একটা প্রবাদ চালু আছে— 'মরা হাতি লাখ টাকা!'

'শিকারী জীবন' নামক ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। প্রকাশকাল, ১৩৩২।

(বানান অপরিবর্তিত)

*

লক্ষ্যভেদ

বাঘকে মারতে যাওয়া তারই সাজে, (ক) নিজের হাতিয়ারে যার ভরসা আছে এবং (খ) চলন্ত জিনিসে অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করার কায়দাকানুন যার আয়ত্তে। এ দুটো গুণ যার নেই, বাঘ শিকার করতে গিয়ে সে যে সম্ভবত নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে তাই নয়, সঙ্গীসাথীদেরও সে বিপদে ফেলবে; আর তার জন্যে মুশকিলে পড়বে নিরীহ গ্রামবাসীরা— কারণ, জঙ্গলে সে ফেলে রেখে আসবে চোট-খাওয়া বাঘ, যে বাঘ পরে হয়ত নিদারুণ নরখাদকে পরিণত হবে।

কখনই তাড়াহুড়ো করে গুলি করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তাহলে আজ

BanglaBook.org

হোক কাল হোক শিকারের আয়ু তার হঠাৎ অকালেই ফুরিয়ে যাবে। এটা সব সময় মনে রাখা ভালো যে, বাঘের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানে দুনিয়ার সবচেয়ে ধূর্ত, সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়া— যে লড়াইতে আবেষ্টনী এবং আক্রমণের আর আত্মরক্ষার ক্ষমতার দিক দিয়ে বাঘেরই ষোল আনা সুবিধে।

বাঘকে মারতে এবং ঘায়েল করতে গেলে নিচেকার মোক্ষম জায়গাগুলোতে গুলি করা দরকার।

(ক) গলা, (খ) কণ্ঠা, (গ) কাঁধের ভেতর দিয়ে কল্‌জে, (ঘ) বুকের ভেতর দিয়ে কল্‌জে, (ঙ) দুই চোখের মাঝখান দিয়ে মগজ।

বাঘ যদি শিকারীর দিকে তিন-চতুর্থাংশ ফিরে থাকে, তাহলে গুলি করার সবচেয়ে ভালো জায়গা হল কণ্ঠা। বাঘ তাহলে সোজা ধরাশায়ী হবে— কেননা তাতে গলা থেকে নামা শরীরের শিরাগুলো যেমন ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে, তেমনই বুলেটটি স্নায়ুকেন্দ্র ভেঙে কলজে আর ফুসফুস ফুঁড়ে চলে যাবে।

বাঘ যদি পাশ ফিরে থাকে, তাহলে কল্‌জেই হবে নিশানা। কিন্তু বাঘকে তৎক্ষণাৎ অসাড় অচল করে দেবার জন্যে গুলিটা চালাতে হবে কাঁধের কেন্দ্রস্থল ভেদ করে। অনেক সময় কল্‌জে ফুঁড়ে গুলি করলেও বাঘকে ধরাশায়ী করা যায় না এবং মৃত্যুর আগের কয়েক সেকেণ্ডে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বাঘ যদি শিকারীর দিকে মুখ করে একই জমিতে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে গলার ঠিক নিচে বুকের ঠিক মাঝখানটায় গুলি করাই প্রশস্ত। গলা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে গুলি করলেও সমান ভালো ফল পাওয়া যাবে। মাথার সামান্য ডাইনে বা বাঁয়ে কাঁধের ভেতর গুলি চালাতে পারলে বাঘকে চূড়ান্ত রকমের ঘা দেওয়া যায়। এতে হয়তো কল্‌জে ফুটো হয়ে যাবে। অথবা সম্ভবত শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে। বুলেটটা লম্বালম্বিভাবে ঢুকে পড়ে শরীরটাকে অবশ করে দিতে পারে, অথবা— যেটা সবচেয়ে জরুরি— কাঁধের হাড় ভেঙে দেওয়ার ফলে বাঘ মারাত্মকভাবে আর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না।

যে বাঘ সিধে চলে আসছে, বন্দুকের ঘোড়া টানার আগে তাকে হয় একটু পাশ ফেরার, নয় সামনে একটু সরে যাবার সুযোগ দেওয়া উচিত— কারণ, বাঘদের স্বভাব হল যেদিকে ফিরে আছে— চোট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে— সেইদিকে তেড়ে যাবার। এমনও অনেক অবস্থা আছে, যেক্ষেত্রে বাঘের গায়ে গুলি লাগলেও তার দিক থেকে তেড়ে আসবার কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু যে বাঘ আপনাকে দেখে ফেলেছে এবং দেখা সত্ত্বেও যার নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি, তার সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার হবেন।

মগজে গুলি চালাতে পারলে তৎক্ষণাৎ দফা রফা হয়— কিন্তু কাজটা যেমন শক্ত, তেমনি যেটা ভাবা যায় সেটাও নিচের দুটো কারণে প্রায়ই শেষ পর্যন্ত ঠিক ঘটে ওঠে না। প্রথমত, বাঘের মগজ নিশানা হিসাবে নেহাৎ ছোট— আকারে একটা আপেলের মত; আরো বেশি ছোট দেখায় তার হাড়সর্বস্ব বিরাট মুণ্ডুটার তুলনায়; চোখের প্রায় তিন-চার ইঞ্চি পেছনে তার মগজের আধার। দ্বিতীয়ত বাঘের কপাল দেখে যে-রকমটি মনে হয় আসলে সে-রকমটি নয়। চোখের ঠিক ওপরে চামড়ার ভাঁজ এবং জায়গাটার

BanglaBook.org

রং এমন যে, দেখে মনে হবে আমাদেরই মতো নাকের ঠিক ওপরে চামড়ার নিচে বুঝি উঁচানো হাড়ের কাঠামো আছে। বাঘের মাথার খুলি খুঁটিয়ে দেখলে আশ্চর্য হবেন— যাকে আমরা কপাল বলি, বাঘের সে জিনিস আদৌ নেই; সে জায়গায় তার একটা হাড় বিষম ঢালু হয়ে পেছনের দিকে নেমে গেছে— শুধু মানুষ কেন, অন্য জানোয়ারদের মতনও তার মাথার খুলিতে সামনের দিকে খাড়া হয়ে কপালের মতো কিছু নেই।

সুতরাং চোখের ওপর গুলি লাগলে ভেদ করে তো যাবেই না, বরং হাড় ঘেঁষে পিছলে চলে যাবে। একমাত্র চোখের ভেতর দিয়ে কিংবা নাকের ঠিক গোড়ায় তাক করতে পারলে তবেই সেই গুলি বাঘের মগজে পৌঁছুবে।

সেইজন্যেই, আমার মতে, বাঘের মগজ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়াটা ভুল। তার চেয়ে গলায় গুলি করাটা সহজ এবং তাতে মগজ ফুটো করারই সমান ফল মেলে।

বাঘ যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে, শিকারী যখন তার চেয়ে উঁচুতে রয়েছে— তখন ঘাড় আর শিরদাঁড়ার সন্ধিস্থলে গুলি লাগাতে পারলে বাঘ আর নড়তে পারবে না। শিকারী যদি একই জমিতে থাকে, তাহলে নিশানা করতে হবে ল্যাজের ঠিক গোড়ায়। গুলিটা পেছন থেকে বাঘের বুকে গিয়ে ঘা দেবে। তবে এটা একটা কদাকার ব্যাপার, পারতপক্ষে এভাবে গুলি না করাই ভালো।

কোনো মোক্ষম জায়গায় গুলি যদি না লাগে, তাহলে দেখে অবাক হবেন— গুলির পর গুলি খেয়েও বাঘ কি রকম দিব্যি হেঁটে চলে ফিরে বেড়াবে। বার ছয়েক মারাত্মক গুলি খাওয়ার পরেও তার দৌড় বড় কম হয় না এবং অতগুলো চোট নিয়েও সে জান দিয়ে লড়ে যাবে।

শের জঙ্গ-এর 'ডোরাকাটার অভিসারে' (অনুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়) গ্রন্থ হইতে এই বিশেষ অংশটি গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৯৬৯।

শিকারের নিয়মের লঙ্ঘনে শিকারীর কীরূপ বিপদ ঘটতে পারে

বেড় শিকারে যদিও শিকারী মাচানে বসেই শিকার করে তবুও সময়ে সময়ে তার অত্যন্ত বিপদ ঘটে যায়। আমি জঙ্গলের জানোয়ারের আক্রমণে শিকারীর যে বিপদ উপস্থিত হয় তার কথা বলছি না, কারণ সে রকম বিপদ বেড় শিকারে খুবই কম ঘটে এবং ঐরূপ বিপদ অন্যরকম শিকারে বেশী ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। বেড় শিকারে কোনও শিকারীর যে বিপদ অন্য শিকারীর কাছ থেকে আসতে পারে তার কথাই এখানে বলছি। এই বিপদ অধিকাংশ সময়ে শিকারীর নিজের অবিবেচনার অথবা অন্য শিকারীর শিকারের নিয়মের অজ্ঞতা বা অতিলোভের ফলে ঘটে থাকে। শিকারের একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে যে শিকারী কখনও অন্য শিকারীর মাচানের নিকটবর্ত্তী স্থানে গুলী করবে না। তার কারণ, গুলী কঠিন মাটিতে বা গাছে লেগে প্রতিহত হয়ে, ঊর্দ্ধ দিকে এবং অন্য পথে চালিত হয়ে অপর শিকারীর মাচানের দিকে ছুটতে পারে, বা পাথরে লেগে খণ্ড খণ্ড হয়ে খণ্ডগুলি চার দিকে ছিট্‌কে গিয়ে অপর শিকারীকে আঘাত করতে পারে। এই জন্য বেড়

BanglaBook.org

শিকারের নিয়ম এই যে প্রত্যেক শিকারী তার নিজের মাচানে বসবার আগে তার দু'দিকেই ভাল ক'রে দেখে নেবে অপর শিকারীর মাচান কোন লাইনে এবং কতদূরে অবস্থিত, এবং ঐ দু'দিকে কখনও গুলী চালাবে না।

'শিকারের কথা' নামক অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে
এই বিশেষ অংশটি গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৯৪১।
(বানান অপরিবর্তিত)

*

শিকারী কী কী উপায়ে শিকারের জন্তু হতে আত্মগোপন করে

মাচানে বসে বাঘকে লক্ষ্য করার সময় গাছের পাতায় বন্দুকের নলা লেগে শব্দ হওয়ায় বাঘ সতর্ক হয়ে মাচানের দিকে চেয়ে দেখল। ঐটা বলবার সময় মনে হ'ল যে মাচানের সম্বন্ধে এবং অন্য যে উপায়ে শিকারী লুকিয়ে শিকারের প্রতীক্ষায় বসে থাকে তার সম্বন্ধে দু-চারটা বিশেষ কথা এর আগেই আমার তোমাদের বলা উচিত ছিল। আরও বাঘের গল্প বলার আগে এইখানে সেকথা কয়টা বলে নিই।

উঁচু জায়গায় গোপন ভাবে স্বচ্ছন্দে বসে থাকার জন্য মাচান তৈরী করা হয় তা আর বলে দিতে হবে না। যেমন তেমন ক'রে খানিকক্ষণ বসে থাকতে হ'লে বোধ হয় অনেকের পক্ষে গাছের ডালই যথেষ্ট হত। কিন্তু তা করলে ত হবে না। শিকারীর যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, ইচ্ছামত ঘোরার দরকার হয়, বন্দুকে লক্ষ্য করার সময় দুই হাতই ব্যবহার করতে হয়, এবং এই সব কারণেই তার নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার স্থানের এত প্রয়োজন।

দুইটা যথাসম্ভব সমান্তরাল মোটা ডালের উপর একটা দড়ি দিয়ে ছাওয়া হালকা খাটিয়া বেঁধে বা কতকগুলো গাছের ডাল কেটে এনে সেগুলোকে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ঐ সমান্তরাল ডাল দুইটার উপর সাজিয়ে বেঁধে দিয়ে একটা বসবার আসন তৈরী ক'রে নেওয়া হয়, আর একেই মাচান বলে। যেখানে এমন গাছ পাওয়া যাচ্ছে না যার দুইটা ডালের উপর ঐ রকম মাচান তৈরী করা যায় সেখানে মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার উপর মাচান তৈরী করতে হয়। কিন্তু যেখানে আগে মাচানের মতো কোন জিনিষ ছিল না সেখানে খুঁটির উপর ঐ রকম একটা জিনিষ দাঁড় করালে তা শিকারের জন্তুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সেইজন্য খুঁটির উপর মাচান তৈরী করতে হ'লে তাকে কোন গাছের সঙ্গে লাগিয়ে তৈরী করা দরকার, যাতে সেটাকে হঠাৎ গাছেরই একটা অংশ বলে মনে হবে। খুঁটিগুলোতেও এমনভাবে পাতা সাজিয়ে দিতে হয় যেন সেগুলোকে গাছ বলে ভ্রম হয়।

মাচান কখনও আয়তনে বেশী বড় হওয়া উচিত নয়। দু'জনের বসবার জায়গার চেয়ে বেশী জায়গা কখনই দরকার হয় না। মাচান আয়তনে যত বড় হবে তত বেশী জঙ্গলের জানোয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভব। যাঁরা শিকারে অভ্যস্ত নন এমন সহুরে ভদ্রলোকদের কখন কখন শিকারের জন্য মাচানে বসতে দেখেছি। তাঁদের সঙ্গের সাজ-সরঞ্জাম, দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে মড়ির উপর মাচানে বসে শিকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের চা খাওয়ার সরঞ্জাম, টিফিন্ কেরিয়র্, সিগারেট্ কেস,

BanglaBook.org

অনেকগুলো রাগ্ ইত্যাদি যা নিয়ে মাচানে ওঠেন, তা দেখলে মনে হয় যে তাঁরা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েও এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হতে রাজী নন। মড়ির সন্নিকটে মাচানের উপর বসে যদি কেউ 'ফিষ্টি' করতে, বা ডিশ পেয়ালার ঠুন্ঠান্ শব্দ ক'রে চা খেতে বা দেশালাই জ্বালিয়ে সিগারেট্ ধোঁয়া ছাড়তে লেগে যান, তা হ'লে শিকারের জন্তুটি যে ঐ 'ফিষ্টি' ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে কৃতার্থ করতে আসবে না এ তোমরা সহজেই বুঝতে পার। বেড় শিকারে মাচানে ব'সে এসব বরং চলতে পারে, মড়ির উপর ব'সে কখনও না। অল্পপরিসর মাচানের উপর দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ আর নিশ্চল হয়ে বসে শিকারের প্রতীক্ষা করা অনভ্যস্ত শিকারীর কাজ নয়।

মাচানের চার পাশে পাতার পর্দ্দা ক'রে ঢেকে দিতে হয় যাতে শিকারীকে সহজে দেখা না যায় এবং মাচানকেও যতটা সম্ভব গাছেরই একটা অংশ বলে মনে হয়। চার পাশে দড়ি খাটিয়ে, বা লম্বা-লম্বি ডাল বেঁধে দিয়ে তার উপর কতকগুলো পাতা ঝুলিয়ে দিয়ে পর্দ্দা তৈরী করা হয়। পর্দ্দার প্রত্যেক দিকে অন্ততঃ দুইটা করে ছিদ্র থাকা দরকার, যার ভিতর দিয়ে শিকারী এবং তার সঙ্গী মাচানের বাহিরে দেখতে পারবে। যেখানে গাছেরই ঘন পাতার ভিতরে মাচান তৈরী হয় সেখানে সব সময়ে এই পাতার পর্দ্দার দরকার হয় না তা বলাই বাহুল্য।

মাচানে উঠবার জন্য বা মাচান থেকে নামবার জন্য একটা সিঁড়ির দরকার। দুইটা লম্বা সরু গাছ কেটে তাতে আড়া-আড়ি ভাবে গোটাকয়েক ছোট ডাল বনের লতা দিয়ে বেঁধে দিয়ে তখনি তখনি এই সিঁড়ি তৈরী ক'রে নেওয়া যায়, যেমন বাঁশের মই আর কি। এই রকম সিঁড়ি কিন্তু মাচানের সঙ্গে লাগান থাকলে সতর্ক জন্তুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভব, সেইজন্য শিকারী মাচানে বসার পর সিঁড়িটা সরিয়ে ফেলে কাছেই জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা উচিত যাতে শিকারী নামবার সময় পুনরায় সহজে ব্যবহার করতে পারে। এ করাও কিন্তু অনেক হাঙ্গাম। সেই জন্য মড়ির উপর বসে শিকারে আমি দড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। ঐ সিঁড়ি দিয়ে মাচানের উপর উঠে সিঁড়িটা টেনে উপরে উঠিয়ে নিতাম, আর নামবার সময় আবার ঝুলিয়ে দিতাম। শিকারে যাবার সময় প্রায়ই ঐ রকম একটা সিঁড়ি সঙ্গে রাখতাম।

ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে বেড় শিকারে মাচানে বসে শিকার করা তত কিছু কঠিন নয়, কেবল দ্রুত লক্ষ্য করার ক্ষমতা থাকলেই যথেষ্ট; কারণ ঐ শিকারে শিকারের জন্তুকে শিকারীর কাছে তাড়িয়ে এনে হাজির ক'রে দেওয়া হয়। মড়ির উপর বা যেখানে জানোয়ার সচরাচর আসাযাওয়া করে এমন জায়গায় রাত্রিতে মাচানে বসে শিকারের প্রতীক্ষা করা খুব সহজ কাজ নয়, তা আমি আগে যা বলেছি তা থেকে কতক বুঝতে পেরে থাকবে। এতে বড়ই ধৈর্য্যের দরকার। ঐ অবস্থায় মাচানে বসা কতকটা যোগাসনে বসার মতো। নড়বে চড়বে তাতে এতটুকু শব্দ হ'লে চলবে না, কারণ তুমি জান না যে জানোয়ার মাচানের কাছে এসে গেছে কিনা। ঐ অবস্থায় এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে যখন পা বা শরীরের কোন অংশ অবশ হয়ে যায় তখন তাকে একটু সরিয়ে সহজ অবস্থায় আনতে গেলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে অনেকটা সময় নিয়ে তা করতে হয়। অন্ততঃ আমি তাই

BanglaBook.org

করতাম। আমার বিশ্বাস, অনেক নতুন শিকারী যে ঐরকম শিকারে ব'সে বার বার নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসেন তার প্রধান কারণ তাঁরা কখনও মাচানে বসতে শেখেন নি। তাঁদের মাচানে বসে উস্‌খুসুনির শব্দগুলো প্রায়ই তাঁদের উপস্থিতির সংবাদটা শিকারের জন্তুদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের সতর্ক ক'রে দেয়।

আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে শিকারী যদি মাচানে অন্য লোক নিয়ে বসেন তা হ'লে যেন একজনের বেশী না নেন, আর যাকে নেবেন সেও যেন মাচানে নিঃশব্দে দীর্ঘকাল বসতে অভ্যস্ত হয় এবং ভীরু স্বভাবের না হয়। এ না হ'লে প্রায়ই মাচানে বসা নিষ্ফল হয়, এবং সময়ে সময়ে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে তখন নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়— 'কেন এই লোককে নিয়ে মাচানে বসেছিলাম' বলে। আমার দু-একজন সাহসী পিয়নকে আমি ঐ ভাবে বসতে শিখিয়েছিলাম। তবুও জ্যোৎস্না রাত্রি হ'লে আমি পিয়নকে সঙ্গে নিতাম না। কেবল অন্ধকার রাত্রিতে তাদের কাউকে নিয়ে মাচানে বসতাম, কারণ ফায়ার্ করার সময় শিকারের জন্তুর উপর ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেলবার জন্য ঐ কাজে শিক্ষিত একজন সঙ্গীর দরকার হত আমার।

'শিকারের কথা' নামক অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে
এই বিশেষ অংশটি গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৯৪১।
(বানান অপরিবর্তিত)

জঙ্গলে বিট করে শিকার প্রণালী

বন্য জন্তু শিকার করতে হলে বনেই যেতে হয় একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বনে গেলেই কি এদের দেখতে পাওয়া যায়? বন ত ছোট জায়গা নয় যে সেখানে গিয়ে কোন একটা স্থানে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকালেই তার সবটা দেখে নেবে, আর সেই সঙ্গে সেই বনের জন্তুগুলোকেও দেখে ফেলবে। ছোট ছোট বনে বন্য জন্তু, বিশেষতঃ বড় বন্য জন্তু, প্রায়ই থাকে না। বড় জন্তু শিকার করতে হলে বিস্তীর্ণ জঙ্গল, যেখানে লোক সমাগম কম হয়, সেইরকম বনই প্রশস্ত। সহজেই বুঝতে পার যে সেরূপ বনে শিকারের জন্তু খুঁজে বা'র করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। তোমরা শুনে থাক যে অমুক বনে (যেমন সুন্দর বনে) অনেক বাঘ আর হরিণ আছে, কিন্তু ঐরকম বন একটা গ্রাম বা একটা সহরের মতো ছোট জায়গা নয়, তার চেয়ে অনেক বড় জায়গা সে সব। আর জন্তুরা ত মানুষের মতো এক জায়গায় ঘর বসতি ক'রে বাস করে না যে একটা কারও সন্ধান পেলে এবং সে কোথায় থাকে কোনমতে জেনে নিতে পারলে ঐ সঙ্গে আরো অনেকগুলির সন্ধান পাবে। ঐরকম জঙ্গলে বন্দুক ঘাড়ে করে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ালেও অনেক সময় শিকারের সন্ধান পাবে না।

তা হ'লেই বুঝতে পারছ যে তোমাকে এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে তুমি সহজে শিকারের জন্তুর কাছে পৌঁছুতে পার বা তুমি জঙ্গলে একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকলেও সে তোমার কাছে আসতে বাধ্য হয়। 'বাধ্য হয়' বলছি এইজন্য যে কতকটা জোর ক'রে ভয় দেখিয়েই তাকে আনা হয়।

তোমরা অনেকে কোন বড় পুষ্করিণীতে বেড়াজাল দিয়ে মাছ ধরা দেখেছ,— এই

BanglaBook.org

'বাধ্য করার' ব্যাপারটা সেই রকমের। পুষ্করিণীর একটা দিকে বেড়া জালকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে দিয়ে জালটাকে সেইভাবে টানতে টানতে পুষ্করিণীর অপর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর তার ফলে পুষ্করিণীর বড় মাছগুলি জলের আগে আগে চলতে থাকে। জালটী এগিয়ে আসতে আসতে যখন তার সম্মুখের জলভাগ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে তখন মাছগুলো ভয় পেয়ে কি রকম লাফাতে থাকে তা দেখেছ। সম্মুখে আর পালাবার পথ না পেয়ে মাছগুলো তখন জালভেদ ক'রে পালাতে চেষ্টা করে এবং জালে আবদ্ধ হয়। জঙ্গলের জন্তুদেরও কতকটা ঐ রকম উপায়ে শিকারীর কাছে তাড়িয়ে আনা হয়। একে চলতি কথায় জঙ্গল 'পিটা' বা জঙ্গল 'ঝাড়া' বলে। এর ইংরাজী কথা 'বিট্' (Beat) করা। এই শিকারের আর এক নাম হচ্ছে 'বেড় শিকার'। জঙ্গল ঝাড়া জিনিষটা এইরূপ :—

জঙ্গলের কোন একটা স্থান শিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানে শিকারী মাটিতে দাঁড়াবে বা গাছের উপর মাচান ক'রে বসবে। এই স্থান থেকে অনেকটা দূরে একদল লোক ঐ জঙ্গলের এক অংশে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে। লাইনটা হবে বেশ বড় আর কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, জেলেরা যেমন বেড়াজাল ছড়িয়ে দেয়। ঐ লাইনের বাঁকানো মুখ দুটো থাকবে শিকারের দিকে আর যারা লাইন ধরে দাঁড়াবে তারা সকলেই শিকারীর দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। আমি যেখানে বেশীর ভাগ শিকার করেছি বা দেখেছি সেখানে এই লাইনকে 'পন্তা' (পাঁতি?) বলে এবং লাইন ধরে দাঁড়ানকে 'পন্তা ধরা' বলে। আমিও তাই বলব এবং লাইনের লোকদের পন্তার লোক বা বিটার্ (Beater) বলব। বিটার্‌দের সঙ্গে তীর ধনুক টাঙ্গি কুড্ডুল লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র, আর নাগরা কাঁসর করতাল ইত্যাদি বাজনা থাকে। শিকারী তার নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবার পর একটা সঙ্কেত করা হয়; তখন বিটাররা বাজনা বাজাতে বাজাতে আর চীৎকার এবং গাছে লাঠি মেরে খট্‌খট্ শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করে, যার ফলে ঐ জালের মত পন্তার লাইনটি শিকারীর দিকে এগুতে থাকে। এতে বনের ঐ অংশের জন্তুগুলি তাড়া পেয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে শিকারী যেদিকে আছে সেই দিকে চলতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ বেশী ভয় পেয়ে ঐদিকে দৌড়ুতে থাকে। ফলে ঐ জন্তুর কতকগুলি শিকারীর দৃষ্টিপথে এসে পড়ে এবং শিকারী তার উপর গুলী চালাবার সুবিধা পায়।

তোমরা ভেব না যে, যে কোন বড় জঙ্গলে এই রকম বেড় শিকার করলেই শিকার পাওয়া যায়। কোন জঙ্গল বা জঙ্গলের কোন অংশ ঝাড়তে হবে তা বেছে নিতে হয় এবং বেছে নিতে হ'লে অধিকাংশ স্থলে স্থানীয় লোক, যারা জঙ্গলে কাঠ আনতে বা অন্য প্রয়োজনে যাতায়াত করে, তাদের সাহায্য নিতে হয়। এই সকল লোকের জানা থাকে যে কোন জঙ্গলে জন্তু বেশী দেখা যায়। জঙ্গলের কোন দিকে ঝাড়তে হবে এবং শিকারী কোথায় বসবে এ সবও প্রায়ই তারাই স্থির ক'রে দেয়। আমরা ভদ্র লোকেরা এই সব লোকদের 'ছোট লোক' ব'লে অবজ্ঞা ক'রে থাকি, কিন্তু তাদের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা, তাদের অভিজ্ঞতা, জঙ্গলের ভিতর নানা রকম চিহ্ন দেখে জানোয়ারের অবস্থান বা গতিবিধি স্থির করবার ক্ষমতা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। আমার শিকার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমি কখন কখন তাদের কথার উপর বেশী আস্থা না রেখে নিজের

BanglaBook.org

ইচ্ছানুযায়ী জঙ্গল বিট্ করাতাম, আর নিজের বসবার স্থান ঠিক ক'রে নিতাম, এবং এই সব শিকারে প্রায়ই কিছু পেতাম না। কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর আমি আর এই সব লোকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতাম না এবং তাতে খুব ভালো ফল পেতাম।

'শিকারের কথা' নামক অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে
এই বিশেষ অংশটি গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৯৪১।
(বানান অপরিবর্তিত)

অল্প কথায় বাঘ ও হাতি শিকার

শিকারের মধ্যে বাঘ-শিকার সত্যিই খুব বিপদসংকুল। অতীতে তরোয়াল, বর্শা, তির দিয়ে বাঘ শিকার করা হত। মুঘল যুগের তৈলচিত্রে দেখা যায় ঘোড়সওয়ার শিকারি বর্শা দিয়ে ছুটন্ত বাঘকে ঘায়েল করছে। বাঘকে গ্রামবাসীরা গর্ত খুঁড়ে ফাঁদে ফেলে মারত অথবা খাঁচায় আটকে খুঁচিয়ে মারা হত। এসব নিষ্ঠুর হত্যার মধ্যে মানুষ বীরত্ব খুঁজে পেত। কখনো বিষ মাখানো তির বা বিষ মেশানো টোপ দিয়ে বাঘ মারা হত। আরণ্যক প্রাণীকে মানুষ নিজের শত্রু বলে ভাবত, আজও সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। রাইফেল বা আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবন হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বন্যপ্রাণী হত্যা সহজ হয়ে যায়, শিকারের রীতিও পালটে যায়। জ্যান্ত মোষ বা ছাগলকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে শিকারীরা গাছের উপর মাচায় বা নিকটবর্তী কোনো গোপন স্থানে থেকে বাঘ আসার প্রতীক্ষা করেন। তারপর যথাসময়ে বাঘ শিকার। এ ছাড়া হাঁকোয়া দিয়ে অর্থাৎ ঢাক-ঢোল-টিন পিটিয়ে ঝোপ ঘিরে ফেলা হয়, ভয় পেয়ে বাঘ ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এলে শিকারিরা গুলি ছোড়েন। এ ছাড়া বহু প্রাচীনকাল থেকেই হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকারের প্রথা আছে, আধুনিককালেও শিকারীরাও হাতি ব্যবহার করেছেন। নেপালের তরাইতে শিকারের সময় চার পাঁচশো হাতি দিয়ে বাঘকে গোল করে ঘিরে ফেলা হত, একে 'রিংওয়ে হান্টিং' বলা হত। গুলিতে আহত বাঘ আরো বিপজ্জনক, আহত অবস্থায় আরো হিংস্র হয়ে ওঠে, এছাড়া আহতাবস্থায় শিকার ধরতে পারে না বলে মানুষখেকো হয়ে উঠতে পারে। শিকার ধরার প্রাণীর অভাবে ও বৃদ্ধ হলেও বাঘ গৃহপালিত পশু ও মানুষের উপর আক্রমণ করতে পারে। গুলি করে মৃত ভেবে বাঘের কাছে এগিয়ে যাওয়া শিকারির পক্ষে বিপজ্জনক, আহত বাঘ হঠাৎ তাদের আক্রমণ করতে পারে। সাধারণত বিকট আওয়াজ বা ফাঁকা বন্দুকের শব্দেই বাঘ পালিয়ে যায়। বাঘের পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ শিকারীর আবশ্যক কাজ, তবে মাটিতে হেঁটে বাঘের মুখোমুখি হওয়া দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই, পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে থাকলে বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না ও নিশ্বাস বন্ধ করে থাকলে মানুষকে খুঁজে বার করতে পারে না।

চিতাবাঘ বাঘের চেয়েও হিংস্র ও নিঃশব্দ, চুপিসারে শিকারির টোপ নিয়েও পালিয়ে যায়। বাঘের মতোই আহত চিতাও সেই অর্থে বিপজ্জনক। বাঘের মতো চিতাও ভালো সাঁতারু, উপরন্তু এরা গাছে উঠতে পারে। সবচেয়ে দ্রুত ছোটে বিশেষত শিকারি চিতা। বাঘের চেয়ে বেপরোয়া প্রাণী। প্রায় বাঘের মতোই এদের শিকার করতে হয় কিন্তু আরও

BanglaBook.org

সাবধানে। রাত্রে বাঘ ও চিতা উভয়ের চোখ জ্বলে, এরা নিশাচর ও অন্ধকারে ভালোই দেখতে পায়।

বাঘের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর, কিন্তু আশ্চর্য হল স্থির বস্তু বাঘের চোখ এড়িয়ে যায়, বরঞ্চ চলমান বা ধাবমান বস্তু সহজেই চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য বাঘের চোখ ফাঁকি দিতে এই কৌশল কাজে লাগে।

সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘের উপর একটি সমীক্ষা : পরিসংখ্যানভিত্তিক সমীক্ষার ভিত্তিতে সুন্দরবনের বাঘকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) সম্পূর্ণ মতলববাজ মানুষখেকো— সুন্দরবনের বাঘের পঁচিশ শতাংশ এ পর্যায় ভুক্ত। এই বিশেষ শ্রেণীর বাঘ মানুষ দেখামাত্রই ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে। জঙ্গলে বাঘের দ্বারা মৃত মানুষের সত্তর শতাংশ এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(২) মতলবহীন মানুষখেকো— সুন্দরবনের বাঘের পনেরো শতাংশ এ পর্যায় ভুক্ত। যখন মানুষ বাঘের বসবাসস্থলে এসে উপদ্রব করে কেবলমাত্র তখনই এই শ্রেণীভুক্ত বাঘ আক্রমণ করে। বাঘের দ্বারা মৃত মানুষের কুড়ি শতাংশ এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(৩) পরিস্থিতিভেদে মানুষখেকো— সুন্দরবনের বাঘের ষাট শতাংশ এ পর্যায় ভুক্ত। এই শ্রেণীর বাঘের মানুষ আক্রমণের প্রবৃত্তি বসবাসস্থলের পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। মূলত স্বাভাবিক শিকারের অভাব কিংবা শিকার প্রাণী গ্রহণের অক্ষমতার জন্য এরা মানুষকে আক্রমণ করে থাকে। এই শ্রেণীর বাঘেরাই নিজেদের বসবাসস্থল ছেড়ে লোকবসতিতে প্রবেশ করে গৃহপালিত পশু ও গ্রামের মানুষ আক্রমণ করে। বাঘের দ্বারা মৃত মানুষের দশ শতাংশ এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সমীক্ষাতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাঘের নরখাদক হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলি হল:

(১) শারীরিক দুর্বলতা, বৃদ্ধ বয়স ইত্যাদির কারণে জঙ্গলের স্বাভাবিক শিকার ও খাদ্য গ্রহণে অক্ষম হওয়া।

(২) অন্যান্য শিকার তথা খাদ্যের অপ্রতুলতা।

(৩) পূর্ব প্রজন্মের কাছ থেকে মানুষ খাওয়ার অভ্যাস বংশানুক্রমে পাওয়া।

(৪) অনিচ্ছা বা অন্য কোনোভাবে মানুষকে মারার পর তার রক্ত-মাংসের স্বাদ ভালো লাগা।

(৫) নদীচরে ভেসে আসা মানুষের মৃতদেহ খেয়ে ফেলার পর সেই জীবন্ত প্রাণীর উপরে নজর পড়া।

(৬) সুন্দরবনের নদীনালার জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ আছে। সেই লবণাক্ত জল বাঘ পান করলে তার কিডনি এবং মূত্রাশয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সুন্দরবনের বাঘের মানুষখেকো অভ্যাস ও স্বভাবগত হিংস্রতার সঙ্গে জলের লবণাক্ত ভাগ এবং জোয়ারের জলের ওঠানামার একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সুন্দরবনে 'অলবণাক্ত' জলের ভীষণ অভাব। বছরের বিশেষ কিছু সময়ে প্রাপ্ত বৃষ্টির জল সেই অলবণাক্ত জলের উৎস। সেই কারণে অরণ্য বিভাগ থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক ও কমপার্টমেন্টে মিষ্টি জলের পুকুর

BanglaBook.org

কাটা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ ওইসব অঞ্চলে মানুষ মৃত্যুর হার কমার সম্ভাবনা থাকে।

এদেশে প্রাচীনকাল থেকে বন্য হাতি শিকার ছিল রাজা মহারাজাদের বিলাস। বন্য হাতিকে বন্দি করে পোষ মানিয়ে যুদ্ধে ব্যবহার, পরে বনে কাঠ পরিবহণ ও অন্যান্য কাজে এদের ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া হাতি পোষা ও চড়া ছিল রাজা-বাদশা ও ধনীলোকদের ঐশ্বর্য ও অহংকারের প্রতীক। পোষাহাতিকে হাতি খেদানো, বন্দি করা এমনকী বন্য হাতি শিকারের কাজে ব্যবহার করা হত। প্রাচীন কালে হাতি শিকারের জন্য আদিবাসীরা বল্লম, তির ধনুক, ভল্ল, দা ইত্যাদি ব্যবহার করত, বিষতিরের প্রয়োগও ছিল। লোকালয়ে হানা দিয়ে অনেক সময় হাতি ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করে, সেসময় বাগে পেলে মনুষ্য হত্যায় পিছপা হয় না। মূলত বনে খাদ্যের অভাব হাতিকে লোকালয়ে আসতে বাধ্য করে। সেসময় শব্দ করে বাজি ফাটিয়ে ও আগুন দেখিয়ে বনকর্মীরা তাদের বনে ফিরিয়ে দেন। রাজ্যে এ ধরনের ঘটনার কথা প্রায়ই খবরের কাগজ মারফত জানা যায়। হাতি শিকার এখন নিষিদ্ধ তবে পাগলা হাতি বা খেপা হাতির আবির্ভাব হলে অবশ্য সরকারি আদেশ বলে শিকারিরা তাকে মেরে ফেলতে পারেন, এ প্রসঙ্গে দুর্ধর্ষ বাঙ্গালী হাতিশিকারি চঞ্চল সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। বাঘের চামড়ার মতো হাতির দাঁতের উচ্চমূল্য, চোরাশিকারিদের হাতি শিকার করার কারণ। কানের পাশে বা কপালের মধ্যস্থলে গুলি করে হাতি মেরে থাকেন শিকারিরা। বাঘের চেয়েও হাতি শিকার কঠিনতর, কারণ সোজা মাটিতে দাঁড়িয়ে সে-কাজটি করতে হয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বা আঘাত চরম না হলে আহত হাতি মৃত্যুর মতোই বিভীষিকাময়। কারণ হাতি তার শিকারকে মারার জন্য দীর্ঘক্ষণ গোঁ ধরে থাকে। হাতির বুদ্ধি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, দুষ্টুমি নিয়ে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে অনেক ঘটনা আছে তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

*

বাঘ, চিতা ও হাতির টুকিটাকি

বাঘ—কত রকমেরই না বাঘ। এদের হাবভাব ও রকমসকম বুঝতে হলে আগে কোন কোন দেশে বাঘ পাওয়া যায় তা জানতে হবে। পূর্ব এশিয়াতেই শুধু বাঘ পাওয়া যায়। উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় নয়। এমনকী আফ্রিকা, যেখানে সিংহ, চিতা ও আরও নানান ধরনের হিংস্র জংলি পশুদের দেখতে পাওয়া যায়, সেখানেও বাঘ মেলে না। বাঘের আসল ঘরবাড়ি উত্তর রাশিয়ায় অনুমান করা হয়। এখান থেকেই এরা পূর্বে মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, চিন, বর্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, জাভা, সুমাত্রা ও বালী দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। সিংহলে কিন্তু বাঘ পাওয়া যায় না। এতেই বোঝা যায় এরা সিংহলে পৌঁছোবার আগেই ভারত ও সিংহলের মধ্যে ডাঙা দিয়ে যাওয়ার যে পথটা ছিল, সেটা জলে ডুবে যায়। বর্মা দিয়েই এরা ভারতে ঢোকে। আস্তে আস্তে আসামে, বাংলাদেশে, হিমালয়ের পাদদেশে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এরা আস্তানা গাড়ে। গভীর বনে, উপত্যকায়,

BanglaBook.org

গুহায়, পাহাড়ি জঙ্গলে আর নদনদীর পাড়ে সাধারণত এরা ডেরা বাঁধে। হিমালয় পাহাড়ের ২৪০০ থেকে ২৭০০ মিটার উঁচু জায়গাতেও বাঘ দেখতে পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন জায়গার জল-আবহাওয়াও ভিন্ন। তাই এদের চেহারা, হাবভাব ও চালচলনে এত তফাত। বাঘ নানান জাতের, নামকরা যায় চার রকমের।

(১) মাঞ্চুরিয়া-কোরিয়া জাতের বাঘ— আকারে সবচেয়ে বড়ো, গায়ের জোরও বেশি। সারা গায়ে বড়ো বড়ো লোম। বরফ ও ঠান্ডা থেকে এদের বাঁচায়। গায়ের ধারীগুলোর রংও বেশ হালকা।

(২) ক্যাস্পিয়ান সাগরের বাঘ— ক্যাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশে, ককেশাস পাহাড়ে ও ইরাণের উত্তরে পাওয়া যায়। দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের বাঘের মতো। লোম শক্ত ও ছোটো।

(৩) জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের বাঘ— ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বালী ইত্যাদি দ্বীপে এদের পাওয়া যায়। এরা দেখতে ছোটো। এদের গায়ের রং আমাদের দেশের বাঘের চেয়ে গাঢ়। এদের মুখ অন্য সব জাতের বাঘের চেয়ে অনেক সাদা।

(৪) ভারতের বাঘ— এরা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামেই পরিচিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সায়েব-শিকারিরা এদের বাংলাদেশে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল।

মাঞ্চুরিয়া জাতের বাঘই যা একটু আলাদা। বাকি সব প্রায় একই রকমের। মাঞ্চুরিয়ার হাড়-কাঁপানো শীতে, মধ্য ভারতের প্রচণ্ড গরমে, হিমালয়ের পাদদেশের আর্দ্র জল-আবহাওয়ায় আর আসাম ও কেরলের দুর্দান্ত বর্ষায় বাঘেরা বেঁচে থাকে। উত্তরাঞ্চলের বরফে, তেরাইয়ের জলাভূমিতে, সুন্দরবনের লোনা জলে ও আসামের প্রচণ্ড বর্ষায় এরা অনায়াসে বাস করে।

বাঘের গায়ের রং সোনালি, তার ওপর গাঢ় কালো ডোরাকাটা— পিঠের শিরদাঁড়া থেকে শুরু হয়ে দু-ধার দিয়ে পেটের দিকে নেমে গেছে। ডোরাগুলোর রং কালো কিংবা গাঢ় ধূসর বর্ণের, পেটের তলার দিকে ক্রমশ হালকা হয়ে গেছে। বুক আর তলপেটের রং সাদা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ডোরাগুলোর রঙের জলুস কমতে থাকে, ফাঁকও বাড়ে। কিছু কিছু বাঘের গায়ের সামনের দিকে খুব অল্প ডোরা দাগ।

বাচ্চা বাঘেদের লোম তুলোর মতো নরম হলদেটে বালি রঙের। যেমন যেমন বয়স বাড়ে গায়ের রঙের জলুসও তেমনি বাড়তে থাকে, ডোরাকাটা দাগগুলো আরও গাঢ় ও পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। বাঘিনীর গায়ের রং বাঘের গায়ের রঙের চেয়ে অনেক বেশি চটকদার।

শীতকালে এদের গায়ে খুব ঘন লোম গজায়, লোমের রংও বেশ চকচকে হয়। গরমের সময় কিছু লোম ঝরে যায়। গায়ের ডোরাকাট রংও ম্যাড়মেড়ে হয়ে পড়ে। এদের গোঁফগুলো সাদা ও শক্ত। কানের পেছন কালো, মধ্যিখানে খালি একটা করে সাদা ছোপ।

বাঘের গায়ের এই রং ও ডোরাকাটা দাগগুলো আত্মরক্ষায় এদের সাহায্য করে। গরমের সময় গাছের শুকনো পাতার সোনালি রঙের সঙ্গে আর শুকনো ঝোপঝাড়ের মাঝে এদের গায়ের রং এমনভাবে মিশে যায় যে দেখতে পাওয়াই ভার। একবার

BanglaBook.org

পিলিভিতের জঙ্গলে একটা আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আমরা চার বন্ধুতে মিলে হাতির পিঠে চেপে খুব সাবধানে চারিদিক খোঁজাখুঁজি করছি। কিছুতেই বাঘের হদিশ মেলে না। হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে বাঘটা যখন আমাদের হাতির মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখনই তাকে দেখতে পেলাম।

বাঘের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা সাদা বাঘ। নৃপতি শাসিত রাজ্য রেওয়াতে পাওয়া যায়। বন্দি অবস্থায় সাদা বাঘ বাচ্চা দেয়। বাচ্চাও বন্দি অবস্থায় বড়ো হয়ে ওঠে। এদের গায়ের রং ধুলোটে, তার ওপর চকলেট ও বাদামি রঙের ডোরাকাটা।

বেড়াল কিংবা চিতার মতো এরা জল দেখে ভড়কায় না। জলকে এড়িয়েও চলে না। গরমকালে বাঘেদের প্রায়ই খানাডোবায় গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সাঁতার দিতেও ওস্তাদ। নেপাল থেকে সাঁতার দিয়ে সারদা খাল পেরিয়ে এরা ভারতে এসেছে, একথা আমাদের অজানা নয়।

বেড়াল জাতের জন্তুরা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঘ নিজেকে খুব পরিষ্কার রাখে। তবু বাঘের গায়ে একটা বিশ্রী ঝাঁঝালো বোটকা গন্ধ। এই গন্ধই তার শিকারদের সতর্ক করে দেয়। বাঘের নখও বেড়ালের মতো এদের নরম মাংসল থাবার মধ্যে লুকানো থাকে। মাঝে মাঝে গাছের ছালে নখগুলো ঘষে একটু শানিয়ে নেয়।

বাঘের কান বড়ো সতর্ক, ফিসফিস শব্দও কানে পৌঁছোয়, বিপদ বুঝলেই লুকিয়ে পড়ে।

খাওয়ার সময় শুকনো সরু ডাল ভাঙার সামান্য একটু শব্দেও এরা শিকার ছেড়ে লুকিয়ে পড়ে। বিপদ ঘাড়ে নেওয়ার চেয়ে খিদের জ্বালা সহ্য করা এদের কাছে অনেক সহজ। একবার কী হয়েছিল জান। এক শিকারি একটা বাঘকে ধরার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সময় কাটাতে শিকারি বই পড়ছিল। বইয়ের পাতা উলটোনোর খসখস শব্দ শুনে বাঘ তার মুখের গ্রাস ফেলে দু-রাত্তির লুকিয়ে কাটাল।

রোদ্দুর বাঘের মোটেই পছন্দ নয়। সারাটা দিন তাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। অন্ধকার হলেই পুরোপুরি চোখ মেলতে পারে। আঁধারেই ভালো দেখতে পায়। টর্চের আলোয় চোখদুটো আগুনের মতো জ্বলতে থাকে।

কুকুর, শেয়াল বা চিতার মতো বাঘের ঘ্রাণশক্তি অতটা তীব্র নয়। রাতের অন্ধকারে কিন্তু শুঁকে শুঁকেই এরা শিকার ধরে।

বাঘ নিঃশব্দে চুপিসাড়ে শিকার করে। সঙ্গীকে ডাকতেই যা হাঁক ছাড়ে। আর বাঘিনী শিকার করতে যাবার সময় ডাক দিয়ে বাচ্চাদের জড়ো করে।

বাঘের উঁচু জায়গা খুব পছন্দ। বসার সময় তাই আশপাশের সবচেয়ে উঁচু জায়গা বেছে নেয়। শীতের সময় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়ায়।

এদের বিরক্ত না করলে অযথা কাউকে আক্রমণ করে না। আলো, গোলমাল আর ভিড়ভাড়াক্কা এড়িয়ে চলে। আহত বাঘ কিংবা বাচ্চাদের পাহারা দেয় যে বাঘিনী— এদেরই শুধু হিংস্র হতে দেখা যায়। শিকারিদের কারুর কারুর মতে বাঘ শেয়ালের চেয়ে ভীরু। জখম না হলে বাঘের সাহস ও বীরত্ব জাগে না। রাখাল বালকেরাও গোরু চরাতে চরাতে বাঘকে শুধু চেঁচিয়েই তাড়ায়। বনেজঙ্গলে অন্য জন্তু জানোয়ারেরা বাঘ দেখলে

BanglaBook.org

কিংবা বাঘের গায়ের গন্ধ পেলে ডাক দিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়! খেপা হনুমান ও বাঁদরের কিচকিচ আওয়াজ, হরিণ জাতের পশু কিংবা ছোপকাটা চিতলের একটানা ডাক, মায়াহরিণ বা কাকারের অদ্ভুত অস্বাভাবিক চিৎকার, বুনো মোরগ আর ময়ূরের ডাক— সবকটা আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা গেলে বাঘ পালিয়ে বাঁচে।

বুনো শুয়োর বাঘের মুখোমুখি হতেও ভয় পায় না। বুনো মোষও বাঘের কবল থেকে অনায়াসেই নিজেকে বাঁচাতে পারে। সাধারণত বাঘ আলো ও আগুনে ভয় পায়। মানুষখেকো বাঘ শিকার পাবার লোভে কিন্তু আলোর দিকে এগিয়ে যায়।

বাঘ খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে ও চুপিসারে আঙুলে ভর দিয়ে চলে। পা ফেলে এক মিটার তফাতে। এদের সামনে দুটো পা, প্রত্যেকটায় পাঁচটা করে নখ। পেছনের দু-পায়ে কিন্তু চারটে করে। সামনের পা দুটো পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বায় খাটো কিন্তু খুব ভারী। পেছনের পা সুমুখের পায়ের চেয়ে সরু, থাবাগুলো ছোটো। কখনো কখনো সামনের পায়ের ছাপের ওপর পেছনের পায়ের ছাপ এমনভাবে পড়ে যেন মনে হয় কোনো দু-পাওয়ালা জন্তু হেঁটে গেছে। পায়ের ছাপ ধরে বাঘকে খোঁজা যায়। শুধু পায়ের ছাপ দেখেই বাঘের সাইজ, বাঘ না বাঘিনী বলে দেওয়া যায়। সাধারণত এরা ল্যাজ দোলাতে থাকে। রেগে গেলে বা খুব খুশি হলে ল্যাজ নাড়া বন্ধ করে দেয়।

বাঘ মাংসখেকো জন্তু। শুধু মাংস হলেই হল, কার মাংস, তাজা না বাসি, কিছুরই ধার ধারে না। মাংস ছাড়া আর কিছুই খায় না। মাঝে-সাঝে একটু-আধটু সবুজ ঘাস খায়, তাও ওষুধ হিসেবে। বাঘ নিজের শিকার করা মাংস ছাড়া খায় না, অনেকেরই তাই ধারণা। এটা কিন্তু ভুল। যে কোনো জন্তুর শিকার-করা মাংস এরা বিনা দ্বিধায়, বিনা কৈফিয়তেই খেয়ে নেয়। পোকা থিকথিকে পচা মাংস খুব ভালোবাসে।

খিদে পেলে বনের যেকোনো জন্তুজানোয়ার শিকার করে খায়, কোনো বাছবিচার করে না। বাঘ শুধু বুনো কুকুরের দলকে ভীষণ ভয় করে। শেয়ালও মাঝে মাঝে এদের হয়রান করে। খাবার পাবার লোভে বাঘের পিছু নেয়। বন্যার সময় বাঘেরা ব্যাং, কচ্ছপ আর মাছ খেয়ে খিদে মেটায়। বাঘ বাঘেরও মাংস খায়। বাঘিনীরা তাই নিজেদের বাচ্চাদের বাঘের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয় না।

অন্য জন্তুরা বাঘের শিকার খায় না, একথা কিন্তু সত্যি নয়। সুযোগ পেলে বাঘের শিকার-করা মাংস বনের আর সব জন্তুরাই খায়। তাই শিকার-করা মাংস রাখার জায়গা বাঘেরা রোজ পালটায়। পেট ঠেসে খেয়ে বাকি মাংস লুকিয়ে রাখে। একসঙ্গে পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোগ্রাম মাংস খেতে পারে।

বাঘ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। আস্তে আস্তে চুপিসারে শিকারের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দৌড়ে লাফ মারে। প্রথমে শিকারের ঘাড় মটকায় কিংবা টুঁটি চেপে ধরে। এদের খাওয়া খুব পরিষ্কার। অন্য কোনো জন্তুর এত পরিষ্কার নয়। পায়ের দিক থেকে খেতে শুরু করে। প্রথমে উরুর মাংস, তারপর আস্তে আস্তে সারা শরীরের মাংস, চামড়া, হাড় ও মাথার চুল চিবিয়ে খায়। নাড়িভুঁড়ি শুধু খায় না, সন্তর্পণে আলাদা করে সরিয়ে রাখে।

এরা একলা শিকার করে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা শিকার করার এলাকা আছে।

BanglaBook.org

খিদে পেলেই তবে শিকার করে। সাধারণত মাসে তিন-চার বারের বেশি এদের শিকার মেলে না।

বাঘ মানুষকে ভয় করে। মানুষের উচ্চতা, পোশাক-আশাক আর দুটো পা দেখে। তবুও এরা মানুষ মেরে খায়। বুড়ো, অসুস্থ, দুর্বল বা আহত বাঘের শিকার করতে খুবই কষ্ট হয়। খিদের সময় সামনে মানুষ পড়লে এরা মানুষখেকো হয়ে পড়ে। মানুষখেকো বাঘ গোরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে রাখালেরই পিছু নেয়। মানুষখেকো বাঘিনীর বাচ্চারাও মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়ে যায়। এরা কিন্তু মানুষের মাথা খায় না। কুকুরের মতোই বাঘ পাগল হয়ে যায়। পাগল হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনেককে আক্রমণ করে।

মানুষখেকো বাঘ মানুষ চেনে, মানুষের চালচলনও বুঝতে পারে। অসাবধানী পথিককে হঠাৎ কি করে আক্রমণ করতে হয়, চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকে কী করে ঘরের লোককে টেনে তুলে নিয়ে যেতে হয় কিংবা বিশ পঁচিশ জন যেখানে একসঙ্গে শুয়ে আছে সেখান থেকে একজনকে কী করে টেনে তুলে নিতে হয় তা এরা নিখুঁতভাবেই জানে। মানুষখেকো বাঘেরা কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ দেখতে কত বড়ো— এ নিয়ে নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প আছে। শিকারিরা যেসব বাঘ মারেন, বলার সময় বাঘের আসল সাইজের ওপর রং চড়িয়ে দু-এক ফুট বাড়িয়ে বলেন। আগেকার দিনে রাজামহারাজেরা বাঘ মারতেন। এঁদের খুশি করতে এঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা বাঘের সাইজ বাড়িয়ে বলত। মাপবার ফিতে একটু বেশি টেনে ধরে দেখার কিংবা ভুল মাপ পড়ার অভ্যাস শিকারিদের মধ্যে আকছার দেখা যেত। ছ-মিটার লম্বা বাঘও মারা হয়েছে, এমন কথাও শোনা গেছে। অথচ বাঘেরা সাধারণত সওয়া তিন মিটারের বেশি লম্বা হয় না। মাপার সময় বাঘের মাথা থেকে ল্যাজের শেষ প্রান্ত অবধি ধরা হয়। বাঘিনীরা তেত্রিশ-চৌত্রিশ সেন্টিমিটার ছোটো। উচ্চতা এদের এক মিটারের কিছু বেশি। ওজন দু-শো নব্বই কিলোগ্রাম।

বাঘিনীরা তিন মাস দশ দিন পেটে বাচ্চা ধরে। অধিকাংশ সময়ই একসঙ্গে তিনটে বাচ্চা দেয়। জন্মাবার পরই বাচ্চার ওজন দেড় কিলোগ্রামের মতো। বাঘিনী বাচ্চাদের পাহাড়ের গুহায়, নয় বড়ো বড়ো পাথরের পেছনে কিংবা গাছের ফোকরে লুকিয়ে রাখে। বাচ্চাদের ঘাড়ের চামড়া আলতো করে মুখে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। বাচ্চাদের ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। ন-দিনের দিন বাচ্চাদের চোখ ফোটে, পরিষ্কার চোখ মেলে দেখতে আরও দিন পনেরো লেগে যায়। মায়ের কোল ধরে বেশ কিছুদিন থাকে। বাঘিনীর আবার বাচ্চা হবার সময় হলে এইসব বাচ্চাদের ছেড়ে দেয়। শিকারিদের মতে বাঘিনীরা জঙ্গলে তিন বছর অন্তর বাচ্চা দেয়। এরাই বাচ্চাদের শিকার খুঁজতে আর শিকার করতে শেখায়। পুরোপুরি বড়ো হতে বাচ্চাদের পাঁচ বছর লাগে।

শিকারের মধ্যে বাঘ-শিকার সত্যিই খুব বিপজ্জনক। আগেকার দিনে তরোয়াল, বর্শা আর তির দিয়ে বাঘ শিকার করা হত। বাঘকে ফাঁদে ফেলার জন্যে গ্রামবাসীরা যারা জঙ্গলে বাস করত তারা প্রায়ই গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখ ঘাস পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দিত।

BanglaBook.org

বাঘ ধরার অনেক রকম ফাঁদ ছিল। কখনো কখনো ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাঘকে খাঁচায় পুরে বর্শা দিয়ে মারা হত। কোনো কোনো জায়গায় আবার বাঘেদের প্রিয় খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে টোপ ফেলা হত। সুন্দরবনে মাচা বাঁধার মতো বড়ো গাছ নেই। শিকারিরা তাই নিজেদের বাঁচাতে লোহার শক্ত গরাদ দেওয়া খাঁচার মধ্যে বসে গুলি ছোড়ে।

রাইফেল ও বন্দুকের পসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ শিকারের রীতিও পালটে গেছে। বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলে শিকারিরা সাধারণত একটা বছর খানেকের মোষের বাচ্চাকে সন্ধেবেলা একটা গাছ কিংবা একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আসেন। মোষের গলায় দড়ি না বেঁধে তার পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দেন। সন্ধেবেলা বাঘ এদিকে এসে পড়লে মোষটাকে মেরে টানতে টানতে আশেপাশের ঝোপঝাড়ে নিয়ে যায়। বেশ ঘন ঝোপঝাড় হলে বাঘও শিকারের সঙ্গে সেখানেই লুকিয়ে থাকে। পরের দিন হাঁকোয়া দিয়ে অর্থাৎ ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাড়া দিয়ে বাঘকে সেখান থেকে বাইরে আনা হয়। মাচায় শিকারিরা তো বন্দুক হাতে তৈরি। যেই বাঘ বন্দুকের রেঞ্জ বা পাল্লার মধ্যে এসে পড়ে, অমনি শিকারিরা গুলি ছোড়েন।

হাতির পিঠে চড়ে বাঘ খোঁজাই সুবিধে। এর জন্যে বিশেষভাবে শেখানো-পড়ানো হাতির দরকার। মাচায় বসে শিকার করার চেয়ে চারিদিক ঢাকা গভীর গর্তের ভেতর বসে শিকার করা অনেক শিকারি পছন্দ করেন। লুকিয়ে-থাকা বাঘকে তার জায়গা থেকে তাড়িয়ে মাচার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই তাড়ানোর কাজে অনেক সময় হাতিকেও লাগানো হয়।

সাদা জিনিসে বাঘ ভয় পায়। তাই বাঘের চলার পথ রোধ করতে বা তাকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবার জন্যে তার যাতায়াতের পথে সাদা চাদর টাঙিয়ে কিংবা সাদা কাগজ বিছিয়ে দেওয়া হয়। বাঘ আর এদিকে মাড়ায় না। যেসব বাঘ এই ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা বিপদ বুঝে জঙ্গলে ফিরে যায়। শিকারিদের কেউ কেউ মাচার চেয়ে হাতির পিঠে চড়ে শিকার করতে ভালোবাসেন। হাতি দিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে আনা হয়। হাতির পিঠই হয় মাচা। এর একটা সুবিধে। মাচা সরানো যায় না, কিন্তু হাতির পিঠে চড়ে খুশিমতো এগোনো-পেছোনো যায়।

নেপালের তরাইতে শিকারর সময় চার পাঁচশো হাতি দিয়ে বাঘকে গোল করে ঘিরে ফেলা হয়। এটাই বাঘ শিকারের 'রিং ওয়ে' পদ্ধতি বা গোলাকারে বাঘ ধরার প্রণালী।

বাঘ শিকারের সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। বাঘ তাড়ানো শুরু হলেই বনের আর সব জন্তুরা ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বাঘও এদের পিছু নেয়। বাঘ যখন ছুটে বেড়ায় তখন গুলি করা খুবই বিপজ্জনক। আহত বাঘ শিকারির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলতে পারে। গুলি বিঁধলেই বাঘ গর্জে ওঠে। হাঁকোয়ায় সাধারণত একটা বাঘই বেরোয় কখনো-বা একটার বেশি।

বেশির ভাগ মাচাই চার মিটার বা আরও একটু উঁচুতে বাধা হয়। মাচার চারদিক ভালোভাবে ঢেকে দেওযা হয়।

পায়ে হেঁটে বাঘ শিকার করা আরও শক্ত ও মারাত্মক।

BanglaBook.org

স্বভাবতই বাঘেরা শান্তিপ্রিয়। মানুষ বা অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে খামোখা ঝগড়া বা ঝামেলা বাধাতে চায় না। একবার আহত হলে আর দেখতে হবে না। ঝোপেঝাড়ে তখন ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আচমকা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত বাঘ হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বা মাচা বেয়ে ওপরে উঠতে এতটুকুও দ্বিধা করে না।

হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে কিংবা কোনো মানুষকে ধরে ফেলেছে এমন আহত বাঘকে লক্ষ করে কখনো গুলি ছুড়তে নেই। বাঘ এত তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করে যে গুলি ফসকে গিয়ে হয় হাতিকে নয় মানুষকে জখম করতে পারে। এইরকম বিপদের সময় গুলির ফাঁকা আওয়াজে বাঘকে ভয় দেখাতে হয়। গুলির শব্দে বাঘ ভীষণ ভয় পায়।

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাঘের হাতে জখম হলে বাঁচা খুবই শক্ত। আঁচড়গুলো ঘা হয়ে পচতে আরম্ভ করে। গুলি খেয়ে বাঘ সব সময় কিন্তু মরে না, কখনও কখনও শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। গুলি করে বাঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাই অনেক শিকারীই প্রাণ হারিয়েছে।

পাথরের মূর্তির মতো মানুষ স্থির হয়ে থাকলে বাঘ আক্রমণ করে না। নিশ্বাস বন্ধ করে থাকলেও মানুষকে খুঁজে বার করতে পারে না।

বাঘের চামড়া, গোঁফ, দাঁত, নখ, মাংস এমনকী চর্বিও কাজে লাগে। অনেকেরই বিশ্বাস বাঘের মাংস খেলে বাঘের মতোই শক্তিশালী আর সাহসী হওয়া যায়। বাঘের চর্বি বাতের খুব ভালো ওষুধ। বাঘের নখ সোনায় কিংবা রুপোয় বাঁধিয়ে তাবিজের মতো ব্যবহার হয়। বাঘের হাড় ইংরেজরা যাকে 'লাকি বোন' বলে, সেটাও সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে অনেকে পরে। বাঘের ছাল খুব টেকসই, কার্পেটের মতো ব্যবহার করা হয়। শোনা যায় বাঘিনীর দুধে চোখের অনেক রকম রোগও সারে।

চিতাবাঘ বা গুলবাঘ— চিতাবাঘের আর এক নাম গুলবাঘ। বেড়াল পরিবারেরই এরা। খুব চালাক, ধূর্ত আর বিশ্বাসঘাতক। বুন্দেলখণ্ডের লোকেরা বলে 'তেন্দুয়া'। গায়ের ছোপগুলো ফুলের মতো দেখায় বলে এদের 'গুলদার' বা 'গুলবাঘ' বলা হয়।

চিতা প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। আফ্রিকার বাঘ মেলে না, কিন্তু চিতার ছড়াছড়ি। 'জাগুয়ার' বলে এক জাতের বাঘ আমেরিকার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, দেখতে ঠিক চিতার মতো। সাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চল ছাড়া এশিয়ার সব জায়গায় এদের দেখা যায়। আন্দামানের দ্বীপগুলোয়, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মাদাগাস্কার ও সাহারার মরুভূমিতে কিন্তু চিতা মেলে না। আমাদের দেশে প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। হিমালয়ের দু-হাজার থেকে দু-হাজার আটশো মিটার উঁচু জায়গাতেও এদের দেখা মেলে। যেখানেই থাকুক, বসবার সময় এরাও সবসময় বাঘের মতো ঠিক উঁচু জায়গাটি বেছে নেয়।

চিতার গায়ের রং সোনালি। তলপেট সাদা, বাকি শরীর কালো ছোপে ভরতি। থাবা, ঘাড়, মাথা, পেট আর ল্যাজের ছোপগুলো ঘন কালো। আসাম ও কেরালায় গড়পড়তা বছরে দু-শো আশি সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়। এখানকার চিতা কালো কুচকুচে। যতই কালো হোক, কালো রঙের তলায় ঠিক ফুলের মতো ছোপ। কাছ থেকে দেখলেই বুঝতে

BanglaBook.org

পারবে। আত্মরক্ষার জন্যেই এই রঙের বাহার— সোনালি রং আর কালো ছোপ। জঙ্গলের ধূপছায়ায় এদের সোনালি রং ও কালো ছোপের ওপর যখন গাছের পাতার ছায়া পড়ে তখন কে বলবে এরা ঘাপটি মেরে বসে আছে। এত সুন্দর দেখতে যে গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে।

অনেকটা পোষা বিড়ালের মতো। ছিপছিপে গড়ন, নিঃসাড়ে চলাফেরা করে। তীক্ষ্ণ কান, খরখরে জিভ। ছোটায় জাতভাইদের হার মানায়। আশি সেন্টিমিটার উঁচু, ল্যাজের গোড়া থেকে নাকের ডগা অবধি লম্বায় আড়াই মিটার। শুধু ল্যাজটাই পঁচাত্তর সেন্টিমিটার। খুব বেশি করে হলে ওজন একানব্বই কিলোগ্রাম।

চিতা বাঘিনীরা আকারে ছোটো, ওজনও কম। একসঙ্গে এরা তিনটে থেকে চারটে বাচ্চা দেয়। চিড়িয়াখানায় দেখা গেছে এরা তিন মাস পেটে বাচ্চা ধরে। জন্ম থেকে কুড়ি দিন বাচ্চাদের চোখ খোলে না। চিতা বাঘও কখনো কখনো বাচ্চাদের পালতে সাহায্য করে। বাচ্চাদের নির্জন জায়গায় রেখে দেয়। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বাচ্চাদের ঘাড়ের চামড়া মুখে ধরে বাঘিনীরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

এদের থাবা খুব মাংসল। সামনের পায়ে পাঁচটা করে নখ, পেছনের পায়ে চারটে। হাঁটার সময় নখগুলো থাবার মধ্যে লুকোনো থাকে। সবসুদ্ধ আঠারোটা নখ ঠিক যেন আঠারোটা শানালো ছুরি। এদের খপ্পরে কোনো জন্তুজানোয়ার পড়লে তার রক্ষে নেই। গাছের ছালে ঘষে বলে নখ খুব ধারালো। বেড়ালের মতো তেরচা চোখ নয়, গোল কটা চোখ। টর্চের আলোয় চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলে। জোরালো আলোয় ভয় পায়। সূর্যাস্তের পর শিকারে বেরোয়, বাঘের চেয়ে ঘণ্টাখানেক আগে। বাঘ বা সিংহের মতো গর্জন করে না। শুয়োরের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ করে। করাত দিয়ে কাঠ কাটার মতো 'ঘোঁৎঘোঁৎ' আওয়াজ। চিতা বাঘকে ডাকবার সময়ও বাঘিনীরা এইরকম আওয়াজ করে। হাঁচি দিয়ে এরা রাগ দেখায়। বাচ্চাদের ধমকানোর সময় সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে।

বেড়ালের মতো অনায়াসেই এরা গাছে কিংবা বাড়ির ছাদে চড়তে পারে। বেশির ভাগ সময়ই শিকার মেরে গাছের ডালে লুকিয়ে রাখে। জলে ভীষণ ভয় পায় বলে গায়ে এক ফোঁটা জলও লাগতে দেয় না। বাঘের মতোই এদের শোনার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ, তারপর দেখার আর সব শেষ শোঁকার। প্রয়োজনে শরীরটা খুব ছোটো করে গুটিয়ে নিয়ে অল্প জায়গাতেই থাকতে পারে।

এরা সব সময় জন্তুজানোয়ারই ধরে খায়। পছন্দ করে কুকুরের মাংস। ঘুমন্ত লোকের খাটিয়ার তলা থেকে নিঃশব্দে কুকুর তুলে নিয়ে যায়। বাঘের শিকার করা লুকানো মাংস এরা অনেক সময় খেয়ে নেয়। তবে বাঘের মতো পরিষ্কার করে খেতে পারে না। খাওয়া দেখেই বোঝা যায়— বাঘ খেয়েছে না চিতা। বাঘের মতো এদের জিভের ওপর দিকটা শিরিষ কাগজের মতো বেশ খরখরে আর নীচের দিকটা মাখনের মতো মোলায়েম।

শিকারের ওপর এরা লাফিয়ে পড়ে না। বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষখেকো চিতা ধরা খুব শক্ত। গাড়োয়ালের রুদ্রপ্রয়াগে এক মানুষখেকো চিতা এক-শো পঁচিশটা মানুষ মারে। আট বছর ধরে চেষ্টা করেও শিকারিরা একে ধরতে পারেনি। বেশ কয়েক

BanglaBook.org

মাস ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিখ্যাত শিকারি জিম করবেট তাকে খতম করেন।

মাচায় বসে বাঘের হাত এড়ানো যায়, চিতার নয়। হাতিকেও ভয় করে না। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, সুযোগ বুঝলেই দে ঝাঁপ। আহত চিতা যেন সাক্ষাৎ যম। আহত চিতার খোঁজ করতে গিয়ে অনেক শিকারিই প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বাঘের চেয়ে আহত চিতা খোঁজা শক্ত। তবে বাঘে ছুঁলে যেমন আঠারো ঘা, চিতায় তেমন নয়। চিতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে অনেকেই বেঁচে আছে, কিন্তু বাঘের হাত থেকে নয়।

ধূর্ত বলেই বোধ হয় শিকারি আসার আঁচ পেলেই উধাও হয়ে যায়। বাঘের চেয়ে চিতাই আমাদের দেশে বেশি। চিতাবাঘেরা যত সহজে শিকারির হাত থেকে পালাতে পারে অত সহজে বাঘেরা নয়। যেখানে তিনটে বাঘ মারা হয় সেখানে চিতা মাত্তর একটা। চিতার ধূর্তমির অনেক গল্প আছে। চুপিসারে শিকারির সামনে দিয়ে টোপ নিয়ে এরা পালায়। শিকারি বেচারি বন্দুক হাতে অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকে।

সাধারণত এরা মানুষের সামনে আসে না। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কখনো কখনো রাস্তার চৌমাথায় এদের বসে থাকতে দেখা যায়।

আমাদের দেশে আরও দু-রকমের চিতাবাঘ আছে। 'হিম তেন্দুয়া' বা বরফের চিতা। কাশ্মীর কিংবা হিমালয়ের পশ্চিমে তিন হাজার তিনশো মিটার উঁচুতে এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। এরা সমতলভূমির চিতাবাঘের চেয়ে আকারে ছোটো। লম্বায় সওয়া দু-মিটার থেকে পৌনে তিন মিটার, ওজনে তেত্রিশ কিলোগ্রাম থেকে একচল্লিশ কিলোগ্রাম। ল্যাজ এক মিটারেরও বেশি লম্বা। উচ্চতায় পঁচাত্তর সেন্টিমিটার। মেটে রঙের গায়ের ওপর হালকা কালো ছোপ। পাহাড় কিংবা বরফে ঢাকা পাহাড়ে এদের গায়ের রং আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। লোহার তারের খাঁচায় ধরা হয়। গায়ের ছাল খুব দামি। লোমগুলো লম্বা লম্বা, নরম ও রেশমের মতো।

দ্বিতীয় জাতের চিতার নাম 'ক্লাউডেড চিতা'। আমরা 'বাদুলে চিতা' বলতে পারি। পূর্ব হিমালয়ে, আসাম, সিকিম আর নেপালের ঘন জঙ্গলে এদের বাস। সাধারণত এরা গাছের ওপরেই থাকে। মেটে খাকি গায়ের রং, মাথায় আর ল্যাজে বড়ো বড়ো কালো ছোপ। গায়ের ছোপ খুব বড়ো ও চৌকো। ডোরাকাটা বলে অনেক সময় ভুল হয়।

বাদুলে চিতারা উচ্চতায় প্রায় আশি সেন্টিমিটার, লম্বায় ল্যাজ সমেত দেড় থেকে সওয়া দু-মিটার। ল্যাজটা একষট্টি থেকে নব্বই সেন্টিমিটার। ষোলো থেকে তেইশ কিলোগ্রাম এদের ওজন। পা এদের অন্য সব চিতার চেয়ে ভারী। থাবাগুলো চেপটা ও পুরু। কষের দাঁত খুব লম্বা। মজবুতও খুব। বেশ চড়া দামে এই দাঁত বিক্রি হয়। বোর্নিয়োর অধিবাসীরা কানের গয়না করে পরে। এরা পোষ মানেও সহজে। খাবার সময় বিরক্ত না করলে মানুষ আক্রমণ করে না। বাদুলে চিতা সম্প্রতি দিল্লির চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছে।

আমাদের দেশের চিতাবাঘের নিকট আত্মীয় আমেরিকার 'জাগুয়ার'। আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও নেই। আমাদের চিতাবাঘের চেয়ে আকারে বড়ো, ওজনে ভারী। রংচঙে ও ছোপকাটা। খাড়া কান, কানের পেছনটা একেবারে কালো। নীচের ঠোঁটে একটা ঘন

BanglaBook.org

কালো ছোপ। জল দেখে ভয় পায় না। খুব ভালো সাঁতারু। বন্দি অবস্থায় মহানন্দে থাকে। চিতার মতো অত বাধ্য নয় বলে এদের পোষ মানানো শক্ত।

শিকারি চিতা— শিকারি চিতাও বেড়ালের পরিবারের। কুকুরের সঙ্গে কিন্তু এর বেশ সাদৃশ্য। পা কুকুরের মতো লম্বা। গড়নটুকু ছাড়া বাকি সব বেড়াল পরিবারের অন্য সব জানোয়ারের চেয়ে ভিন্ন। শিকারি চিতা দু-রকমের। আফ্রিকার খোলামেলা জঙ্গলে যে ধরনের শিকারি চিতা পাওয়া যায় আমাদের শিকারি চিতাও তাই। এদের উচ্চতা চিতা বা গুলবাঘের চেয়ে বেশি। তাই ল্যাজ পর্যন্ত ধরলে লম্বায় দুই থেকে আড়াই মিটার। শুধু ল্যাজটাই ষাট থেকে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার। উচ্চতায় এক মিটার, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি কিলোগ্রাম। বাচ্চারা মায়ের পেটে নব্বই দিন থাকে। একসঙ্গে দুটো থেকে চারটে বাচ্চা জন্মায়।

এদের গায়ের রং ও ছোপ চিতা বা গুলবাঘের মতো। ছোপগুলো গাঢ় কালো রঙের— এই যা তফাত। বাচ্চাদের গায়ের চামড়া হালকা নীলচে পীত রঙের রেশমের মতো। যত বড়ো হয়, ছোপগুলো তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাথাটা শরীরের অনুপাতে ছোটো, মুখ চিতার চেয়ে চেপটা। চোখের জলের মতো চোখের কোল বেয়ে দুটো কালো দাগ নাকের পাশ দিয়ে মুখের দু-দিকে মিলেছে। ছোট্ট কান, চোখের তারা গোল। শক্ত লোম, ঘাড়ে ঝাঁকড়া চুল। নখগুলো পুরোপুরি থাবা দিয়ে ঢাকা নয়। বেড়ালের মতো নখগুলোও পুরো গোটাতে পারে না। আর সবার মতো এরাও গাছের ছালে নখ শানিয়ে ধারালো করে। তফাত শুধু একই গাছের ছালে বার বার নখ শানায়। এদের ধরতে শিকারিরা গাছের চারদিকেই ফাঁদ পাতে। শিকারি চিতার দাঁত চিতার দাঁতের চেয়ে ছোটো।

এদের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চোখ দিয়েই এরা শিকার করে। শোঁকার ও শোনার ক্ষমতা কম। তাই হাবভাব ও চালচলন চিতার ঠিক বিপরীত। এরা দিনে শিকার করে, চিতা রাতে।

জন্তুদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে জোরে দৌড়োয়। হরিণ, চিতলদের পিছু পিছু ছ-সাত কিলোমিটার ছুটে ধরে খায়। চুপিচুপি নিঃসাড়ে শিকার খোঁজে। শিকার নজরে পড়লেই লাফিয়ে ধাওয়া করে। চোখের পলকে একশো কিলোমিটার বেগে দৌড় মারে। শিকার ধরেই মেরে খায়। শিকার মেরে ঝোপেঝাড়ে টেনে নিয়ে যায় না, লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা নেই। এধার-ওধার ছড়িয়ে খায়। খাওয়া বড়ো নোংরা।

আমাদের দেশের পশ্চিমের সমতলভূমি, মধ্যভাগের উচ্চভূমি দাক্ষিণাত্য অবধি পুরো এলাকায় এককালে শিকারি চিতা পাওয়া যেত। শিকারি চিতা এখন আর নেই বললেই হয়। ১৯৫১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে একজোড়া শিকারি চিতা শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল।

আগেকার দিনে শিকারের জন্য রাজামহারাজারা কুকুর-হাতির সঙ্গে শিকারি চিতাও পুষতেন। শিকারি চিতা নিয়ে শিকার করায় বেশ একটু দক্ষতার প্রয়োজন। শিকারি চিতার চোখ বেঁধে গোরুর গাড়িতে করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হত। শিকার দেখতে পেলে চোখের বাঁধনটা খুলে নেওয়া হত। শিকার দেখেই এরা পাঁই পাঁই করে ছুট দিত। শিকার ধরেই ঘাড় মটকাত পারিশ্রমিক হিসেবে এদের খানিকটা মাংস দেওয়া হত। তাই পেয়েই

এরা মহা খুশি। এইরকমই এদের শিক্ষা দেওয়া হত।

ছুটলে শিকারি চিতাকে খুব সুন্দর দেখায়। চলন কিন্তু বড়ো বিশ্রী। সাদাসিধে ও বাধ্য বলে সহজেই পোষ মানে। মালিকের দেওয়া নাম আর সেইসঙ্গে মালিকের নাম তাড়াতাড়ি মনে রাখতে শেখে। শিকারীচিতা বন্দি অবস্থায় থাকতে পারে। বন্দি অবস্থায় খুব কম বাচ্চা দেয়।

বাঘের গায়ের গন্ধ— 'বোঁটকা' গন্ধের কথা, আর চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচায়, বা আশেপাশে যে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে আগেই বলেছি। কিন্তু মুক্ত প্রকৃতিতেও অনেক শিকারি বাঘের 'বোঁটকা' গন্ধের উল্লেখ করেছেন। 'বোকা পাঁঠার' অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষ পাঁঠার গায়ের তীব্র দুর্গন্ধকে অনেকে বোটকা বলেন। দুজন জাপানি বিজ্ঞানী এ গন্ধের জন্য দায়ী রাসায়নিক পদার্থগুলি সনাক্ত করতে পেরেছেন। প্রধানত মিথাইল অক্টানয়িক অ্যাসিড আর এরই কাছাকাছি দু-একটি রাসায়নিক এ গন্ধের জন্য দায়ী।

বাঘের গায়ে কোনো তীব্র গন্ধ আদৌ আছে কি? খৈরির বা ডোরা-র গায়ে কোনো উল্লেখযোগ্য গন্ধই আমরা পাইনি। চিড়িয়াখানার পোষা বাঘে শাংখালাও কোনো গন্ধ অনুভব করেননি। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে একটু দূর থেকে বন্য বাঘের গায়ের গন্ধ অনুভব করেচেন। তাঁর ধারণা বিশেষ বিশেষ সময়, শারীরবৃত্তীয় কারণে হয়তো তুলনামূলকভাবে বেশি তীব্র গন্ধ বের হয় বাঘ-বাঘিনীর গা থেকে। এলজা আর চিতা পিপার গায়ে উল্লেখযোগ্য গন্ধ পেয়েছেন জয় অ্যাডামসন, ঠিক ঋতুকালে যখন তারা সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত।

শিকারী শের জঙ্গ একাধিক বার বনের বাঘের গন্ধ পেয়েছেন একটু দূর থেকে। ডানবার ব্রান্ডার বলেছেন শিকার করা বাঘের চামড়া ছাড়ানোর সময় তিনি বাঘের গায়ের 'দুর্গন্ধ' অনুভব করেছেন। সুন্দরবনের গ্রামে মানুষের বাড়িতে বাঘ ঢুকেছে অনেকবার ইদানীং কালে। তখন কেউ কেউ বাঘ দেখার আগেই গন্ধ পেয়েছেন, আবার কেউ কেউ একেবারেই পাননি। সুন্দরবনে টাইগার প্রোজেক্টের দু-তিন জন কর্মচারীর কাছে শুনেছি ঘুমপাড়ানি বন্দুক দিয়ে অজ্ঞান করা বাঘের গায়ে উল্লেখযোগ্য গন্ধ রয়েছে।

তবে মানুষের নাকে না ধরা পড়লেও, অনুকূল বাতাস বইতে থাকলে হরিণ ইত্যাদি বাঘের উপস্থিতি বুঝতে পারে। যে হরিণ বাঘের মার্কিং ফ্লুইড শুঁকে দেখে কৌতূহলের বশে কিন্তু ভয়ের কোনো চিহ্নই প্রকাশ করে না, বাঘের গায়ের গন্ধ বাতাসে ভেসে এলে সে নিমেষেই সচকিত হয়ে ওঠে। প্রথম ক্ষেত্রে, তার অভিজ্ঞতায় সে জানে এই মুহূর্তে বাঘ এখানে নেই। গায়ের গন্ধ মনে এখানেই আছে এখন বাঘটি। অতএব সাবধান। ভারতের বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ কৃষ্ণান বছর তিরিশ আগেই বলেছেন বাঘের গায়ের গন্ধটি যদি বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশ্লেষণ করতে পারেন, তার সাহায্যে হয়তো শস্যের খেত থেকে হরিণ বা হাতি তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তবে হাতির মতো বুদ্ধিমান প্রাণী হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে ফেলবে আমাদের এই ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। এ ছাড়াও গন্ধগুলি সাধারণত অনেক রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। সেগুলি ঠিক ঠিক অনুপাতে মেশানোও কঠিন কাজ। একবার একটি ভারতীয় বাঘের মার্কিং ফ্লুইডে পাওয়া গোটা দশেক ফ্যাটি অ্যাসিডের মিশ্রণ (ঠিক পরিমাণ মতো) আফ্রিকার একটি মুক্ত, বনচারী

লেপার্ডকে শুঁকতে দিয়েছিলাম। তার খাদ্যর কাছেই একটি পাথরে মাখিয়ে। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে সে মাথা নীচু করে আশেপাশে খুঁজছিল কোনো ছিটেফোঁটা পড়ে থাকা মাংস। সে সময় ওই গন্ধটি সে নিশ্চয় পেয়েছে, কিন্তু ফ্লেমেনও করেনি, অন্য কোনোরকম আগ্রহ বা ভয় কোনো কিছুই প্রকাশ করেনি। ওই গন্ধ তাকে কোনো বার্তাই দেয়নি। মার্কিং ফ্লুইডের ফ্যাটি অ্যাসিড, এলডিহাইড ইত্যাদি ৩০/৪০ টি পদার্থের মিশ্রণ দিলে হয়তো কাজ হত। অথবা তাতেও নয়, বুর্গারের শতাধিক পদার্থ হয়তো প্রয়োজন।

সে যাই হোক, বাঘের গায়ের গন্ধ বিশ্লেষণ আমাদের কাছে গুরত্বপূর্ণ। হরিণ তাড়ানোর চেয়েও আমার বেশি আগ্রহ বাঘের গায়ের গন্ধবার্তা ফেরোমোন হিসেবে কাজ করে কি না, তা জানতে। জানা গেছে বাঘিনী তার মিলন বেলায় শুধু 'পিচকারি মারে' না, তার শরীরও ঘষে, গাছে বা মাটিতে। তাই হয়তো দু-ভাবে দুটি বার্তা, দুটি আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেওয়া, দুটি কাছাকাছি ঠিকানায়।

সুন্দরবনে আজকাল অনেক বাঘ ধরা পড়ছে, তাদের ঘুমপাড়ানি বন্দুক দিয়ে অজ্ঞান করা হচ্ছে। এ অবস্থায় তাদের গা থেকে তুলো ঘষে রাসায়নিক দ্রবণের গন্ধের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু এদেশে লালফিতার ফাঁসে এ কাজ করা দুঃসাধ্য। তবুও একটি বাঘ আর একটি বাঘিনীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা গেছে। দুটি নমুনাতেই ধরা পড়েছে কতগুলি বড়ো ফ্যাটি অ্যাসিড অণুর অস্তিত্ব। (এগুলি methyl ester অবস্থায় আছে) শুধু এই অণুগুলির জন্য একটা মৃদু গন্ধ থাকার কথা, সেটা সুগন্ধও নয়, কিন্তু উৎকট দুর্গন্ধও নয়। (তবে আরও অনেক অণু আমরা সম্ভবত ধরতে পারিনি।)

মস্ত হাতির টুকিটাকি— কমবয়সি মদ্দা হাতিরা মাঝে মাঝে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে। কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁরা মনে করেন, অন্যান্য ঋতুর তুলনায় শীতকালেই এই ঘটনা ঘটে বেশি। উত্তরপ্রদেশের তরাইয়ের বনাঞ্চলে আমি কিন্তু মে মাসে হাতিদের মস্ত অবস্থায় দেখেছি।

একটি হাতি যখন মস্ত অবস্থায় পৌঁছোয় তখন তার রগের দু-পাশে অবস্থিত দুটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র থেকে বার হতে থাকে এক ধরনের রস, এরই নাম হল মদ বা মস্তস্রাব। প্রায় এক সেন্টিমিটার লম্বা এই রন্ধ্রগুলি হয় একটু ট্যারচা। সাধারণত রন্ধ্রগুলি বোজা থাকে, তাই দেখতে পাওয়া যায় না। মস্ত অবস্থায় রগ ফুলে উঠলে রন্ধ্রগুলি দেখা যায় এবং সেখান থেকে বার হতে থাকে মস্ত স্রাব।

এই রন্ধ্র স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই থাকে। কিন্তু মস্ত স্রাব কেবল পুরুষদেরই বার হয়। প্রাচীন কিছু লেখায় বলা হয়েছে যে সদ্য বন্দি মাদি হাতির রগ থেকে মস্ত স্রাব গড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। পোষা মাদির ক্ষেত্রে এইরকম ঘটনা কখনো লক্ষ করা যায়নি। প্রাচীন কিছু হাতিপালক এই রসকে মদ না বলে মল (শরীরের বর্জ্য) বলে চিহ্নিত করেন। শরীরের বর্জ্য দুর্গন্ধ যুক্ত হয় কিন্তু মস্ত স্রাবের গন্ধ বেশ ভালো। কামোত্তেজনার সময়ে মাদি হাতিদের কখনোই খেপার মতো ব্যবহার করতে দেখা যায় না। কিন্তু মদ্দাদের কাণ্ডজ্ঞান তো থাকেই না, তার উপর এই সময় তারা হয়ে ওঠে ভয়ংকর। এইরকম সময়

BanglaBook.org

স্বভাবতই বাঘেরা শান্তিপ্রিয়। মানুষ বা অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে খামোখা ঝগড়া বা ঝামেলা বাধাতে চায় না। একবার আহত হলে আর দেখতে হবে না। ঝোপেঝাড়ে তখন ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আচমকা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত বাঘ হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বা মাচা বেয়ে ওপরে উঠতে এতটুকুও দ্বিধা করে না।

হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে কিংবা কোনো মানুষকে ধরে ফেলেছে এমন আহত বাঘকে লক্ষ করে কখনো গুলি ছুড়তে নেই। বাঘ এত তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করে যে গুলি ফসকে গিয়ে হয় হাতিকে নয় মানুষকে জখম করতে পারে। এইরকম বিপদের সময় গুলির ফাঁকা আওয়াজে বাঘকে ভয় দেখাতে হয়। গুলির শব্দে বাঘ ভীষণ ভয় পায়।

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাঘের হাতে জখম হলে বাঁচা খুবই শক্ত। আঁচড়গুলো ঘা হয়ে পচতে আরম্ভ করে। গুলি খেয়ে বাঘ সব সময় কিন্তু মরে না, কখনও কখনও শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। গুলি করে বাঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাই অনেক শিকারীই প্রাণ হারিয়েছে।

পাথরের মূর্তির মতো মানুষ স্থির হয়ে থাকলে বাঘ আক্রমণ করে না। নিশ্বাস বন্ধ করে থাকলেও মানুষকে খুঁজে বার করতে পারে না।

বাঘের চামড়া, গোঁফ, দাঁত, নখ, মাংস এমনকী চর্বিও কাজে লাগে। অনেকেরই বিশ্বাস বাঘের মাংস খেলে বাঘের মতোই শক্তিশালী আর সাহসী হওয়া যায়। বাঘের চর্বি বাতের খুব ভালো ওষুধ। বাঘের নখ সোনায় কিংবা রুপোয় বাঁধিয়ে তাবিজের মতো ব্যবহার হয়। বাঘের হাড় ইংরেজরা যাকে 'লাকি বোন' বলে, সেটাও সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে অনেকে পরে। বাঘের ছাল খুব টেকসই, কার্পেটের মতো ব্যবহার করা হয়। শোনা যায় বাঘিনীর দুধে চোখের অনেক রকম রোগও সারে।

চিতাবাঘ বা গুলবাঘ— চিতাবাঘের আর এক নাম গুলবাঘ। বেড়াল পরিবারেরই এরা। খুব চালাক, ধূর্ত আর বিশ্বাসঘাতক। বুন্দেলখণ্ডের লোকেরা বলে 'তেন্দুয়া'। গায়ের ছোপগুলো ফুলের মতো দেখায় বলে এদের 'গুলদার' বা 'গুলবাঘ' বলা হয়।

চিতা প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। আফ্রিকার বাঘ মেলে না, কিন্তু চিতার ছড়াছড়ি। 'জাগুয়ার' বলে এক জাতের বাঘ আমেরিকার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, দেখতে ঠিক চিতার মতো। সাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চল ছাড়া এশিয়ার সব জায়গায় এদের দেখা যায়। আন্দামানের দ্বীপগুলোয়, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মাদাগাস্কার ও সাহারার মরুভূমিতে কিন্তু চিতা মেলে না। আমাদের দেশে প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। হিমালয়ের দু-হাজার থেকে দু-হাজার আটশো মিটার উঁচু জায়গাতেও এদের দেখা মেলে। যেখানেই থাকুক, বসবার সময় এরাও সবসময় বাঘের মতো ঠিক উঁচু জায়গাটি বেছে নেয়।

চিতার গায়ের রং সোনালি। তলপেট সাদা, বাকি শরীর কালো ছোপে ভরতি। থাবা, ঘাড়, মাথা, পেট আর ল্যাজের ছোপগুলো ঘন কালো। আসাম ও কেরালায় গড়পড়তা বছরে দু-শো আশি সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়। এখানকার চিতা কালো কুচকুচে। যতই কালো হোক, কালো রঙের তলায় ঠিক ফুলের মতো ছোপ। কাছ থেকে দেখলেই বুঝতে

BanglaBook.org

সামাল দেওয়ার জন্যই সার্কাস কিংবা চিড়িয়াখানার মদ্দাদের সঙ্গে মাদিদেরও রাখা হয়।

মস্ত স্রাব বেশ ঘন, তেলতেল, গাঢ় বাদামি রঙের আর তীব্র গন্ধযুক্ত। মধ্যবয়স্ক কিংবা বয়স্ক হাতিদের ক্ষেত্রে এর রং হয় প্রায় কালো আর অল্পবয়সিদের ক্ষেত্রে সাধারণত বাদামি। রস বার হওয়ার পরিমাণ অল্প হবে কিম্বা বেশি তা নির্ভর করে হাতির স্বাস্থ্য এবং বয়সের উপর।

প্রথম ক্ষরণ শুরু হয় পনেরো বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে। কিন্তু সেই সময় এর পরিমাণ হয় এতই অল্প যে গড়িয়ে বড়োজোর ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত নামতে পারে। পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত খুব বেশি ক্ষরণ হয় না আর আচরণেও প্রভাব পড়ে অল্পই। পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে খুব বেশি স্রাব বার হওয়া শুরু হয়। এই সময় ক্ষরণ এতটাই বেশি হয় যে হাতির মুখের দু-দিকই যায় ভিজে, কখনো কখনো আবার মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে মাটিতেও ঝরে পড়তে থাকে। এই সময় হাতি পূর্ণ মস্ত হয়। এরা রেগে উঠলে ক্ষরণের পরিমাণ যায় বেড়ে। বাল্মীকি ভালো জাতের হাতির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, পর্বতের মতো বিশাল আর শক্তিশালী, মদমত্ত, রগের দু-পাশ থেকে ঝরে পড়ে মস্ত স্রাব। যে হাতির মস্ত স্রাব বার হয় না তাকে মনে করা হয় অশুভ। এই স্রাবের গন্ধ খুবই তীব্র। অভিজ্ঞ লোক এই গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারেন কাছাকাছি কোন মস্ত হাতি আছে। হাতি যাঁরা পোষেন তাঁদের অনেকেরই এই গন্ধ খুব বেশি তীব্র বলে মনে হয়। সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্রাবকে দুর্গন্ধ যুক্ত বলা হয়নি। কিরাতার্জুনীয়ম-এ বলা হয়েছে এর গন্ধ সপ্তপর্ণ কিংবা এলাচ ফুলের মতো।

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন রগের দু-পাশে অবস্থিত গ্রন্থি থেকেই মস্ত স্রাবের ক্ষরণ হয়। হাতি যখন মস্ত হয়ে পড়ে তখন এই গ্রন্থিগুলি বড়ো হয়ে ওঠে আর সেইসঙ্গে তাদের রগ ফুলে উঠে দপ দপ করতে থাকে।

প্রায় চল্লিশ দিন ধরে চলে এই ক্ষরণ। প্রথম কয়েকদিন বার হওয়ার পরিমাণ থাকে অল্প, তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছে সব থেকে বেশি হয় আর একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে কমতে কমতে শুকিয়ে আসে। ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া এই সময়ের একটি লক্ষণ। দেখলে মনে হয় হাতি যেন সবসময়ই প্রস্রাব করছে। এই সময়ে প্রস্রাবে থাকে তীব্র গন্ধ আর রং হয় গাঢ় হলুদ। প্রস্রাবের এই গন্ধের সঙ্গে মস্ত স্রাবের গন্ধের কিছুটা সাযুজ্য পাওয়া যায়।

বাহ্যিক এই পরিবর্তনগুলি ছাড়াও প্রাণীটির মেজাজ আর আচার-আচরণেও পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় পরিবর্তনগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মস্ত স্রাব বার হওয়ার প্রায় চল্লিশ দিন আগে থেকেই হাতির ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও আরও চল্লিশ দিন এর প্রভাব থাকে। মস্ত অবস্থা চলে প্রায় ১২০ দিন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন এই অবস্থা চলতে পারে কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত, হাতির বয়স এবং শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সময়টা।

হাতির মস্ত স্রাব ক্ষরণ শুরুর আগের অবস্থাকে কালিদাস বলেছেন 'অন্তরমদাবস্থা' কিংবা প্রাক্ মস্ত অবস্থা। রাজা দিলীপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'রাজকীয় আভরণ ত্যাগ

BanglaBoi.org

করলেও তাঁর সুগঠিত দেহ ও মুখের ভাবই রাজোচিত মর্যাদার পরিচায়ক। হাতির কপালে মস্তস্রাব না গড়ালেও তার মস্ত অবস্থা বুঝতে যেমন অসুবিধা হয় না, এ ক্ষেত্রেও তেমনি।'

অভিজ্ঞ প্রতিপালকেরা হাতির ক্ষরণ শুরু হওয়ার আগেই তাদের মস্ত অবস্থার পূর্বাভাস দিতে পারেন। তাদের চোখের চাহুনিতেই তখন বদল ঘটে যায়। দেখা দেয় আদেশ অগ্রাহ্য করার একটা প্রবণতা। হাবভাব হয়ে পড়ে খেপার মতো। এই সময় তার কাজকর্ম আর প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে স্বাভাবিক অবস্থার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এইরকম সময়ে হাতিও আদেশ হয়তো শোনে তবে খুশিমনে নয় আর সবসময় তো নয়ই। সব কিছু নির্ভর করে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উপর। সব থেকে বাধ্য এবং শান্ত হাতি অনেক সময় দেখা যায় মাহুতের কথা অগ্রাহ্য করছে। এমনিতে মস্ত হাতিমাত্রই ভয়ংকর কিংবা তারা আক্রমণ করে বসবে এ-রকম নয় তবে কোনো কারণে চটে গেলে সে তখন সব কিছুই করে বসতে পারে।

মস্ত অবস্থায় যখন কোনো মদ্দা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় কিংবা খেপে ওঠে তখন সে মানুষকে প্রাণে মারতে পারে, সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারে। এইসব সময় তাকে গুলি করে মারা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। মানুষের স্বভাব হল কামোন্মাদ হাতিমাত্রই তাকে খ্যাপা বলে চিহ্নিত করা। হাতির উন্মত্ত অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। পোষা হাতির ক্ষেত্রে কামোত্তেজনা পাগলামির জন্ম দিতে পারে। তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও তারা খেপে ওঠে।

মস্ত ক্ষরণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতি অবাধ্য আর জেদি হয়ে পড়ে। সবাইকেই সে অপছন্দ করতে থাকে। এমনকি যারা তার খুব কাছের এবং যাদের উপর সে নির্ভর করে তাদের দেখলেও তার হতে থাকে রাগ। প্রথম চোটটা পড়ে যারা তার গা ধুইয়ে তার লোম আঁচড়ে দেয় তাদের উপর। খুবই আশ্চর্যের বিষয় হল এই সময় হাতি কোনো একজন মাহুতের কথা শোনে। এমনকী সে তার অপরিচিত হলেও। অন্য কোনো ভাবে যখন আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তখন অনেক সময় কামোন্মত্ত হাতিদের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাহুতদের সাহায্য চাওয়া হয়। হাতি যদি ছাড়া থাকে তাহলে তাকে ভুলিয়েভালিয়ে কিম্বা তর্জনগর্জন করে শিকল পরতে বাধ্য করা হয়। ন-মিটার লম্বা দুটি শিকল তার সামনের আর পিছনের পায়ে আটকে দেওয়া হয়।

অভিজ্ঞ মাহুতেরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই হাতিদের বেঁধে ফেলেন। সেই সময় তাদের রাখা হয় খোঁয়াড়ে। কমিয়ে দেওয়া হয় খাবারের পরিমাণ। খাবারের সঙ্গে অনেক সময় মেশানো হয় কোনো ঘুমপাড়ানি কিছু। আগেকার দিনের মাহুতেরা একতাল ময়দার মধ্যে আফিম মিশিয়ে হাতিদের খাওয়াতেন। আজকের দিনে তাঁরা বেশি নির্ভর করেন ব্রোমাইডের উপর, যথেষ্ট বেশি পরিমাণে যা হাতিদের খাওয়ানো হয়। তামাকও এই ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। ৪৫০ গ্রাম নস্যি হাতিকে প্রত্যেকদিন খাওয়ালে আশা করা হয় সে আর বাড়াবাড়ি করবে না। বাল্টিমোর পার্কে হাতিদের নিয়ম করে প্রত্যেকদিন নস্যি খাওয়ানো হয়।

BanglaBook.org

মস্ত স্রাবের কারণে যতদিন না হাতিদের মেজাজ ঠান্ডা হচ্ছে ততদিন তাদের খাবার দূর থেকে দেওয়া হয় ছুড়ে। তিন-চার মাস তাদের দিয়ে কোনো কাজ করানো হয় না। ক্ষরণ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে অবশ্য তাদের দিয়ে কিছু কাজ করানো চলতে পারে।

জঙ্গলে মস্ত হাতিরা সাধারণত একা একা ঘুরে বেড়ায় না। বেশির ভাগ সময়েই তাদের পালের সঙ্গে দেখা যায়। কখনো কখনো নিজেকে পালের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও খুব একটা দূরে সে চলে যায় না। মস্ত অবস্থায় হাতি অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এমনকী অন্য মদ্দরাও সেই সময় তার কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়।

পুরোনো দিনের মাহুতেরা মস্ত হাসি সম্পর্কে বহু কিছু বলেছেন। এঁদের বক্তব্য হল মস্ত স্রাব হচ্ছে মস্তিষ্কের ক্ষরণ। এই ক্ষরণ যখন আরম্ভ হয় সেই সময় হাতির মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটে। তাঁরা মনে করেন, এই অবস্থার সঙ্গে যৌন উত্তেজনার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। মস্ত মদ্দা যদি তার যৌন মিলনেচ্ছাকে চল্লিশ দিন দমন করতে পারে তাহলে সে তার নিয়ন্ত্রণ হারাবে না। যাই হোক না কেন এই অবস্থার সঠিক কার্যকারণ কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত জীবটির জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে এর যোগ অথবা সাধারণভাবে যৌন উত্তেজনার সঙ্গে এর সম্পর্ক এসবের কিছুই এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা যায়নি।

সম্প্রতিকালের মধ্যে কামোন্মত্ত অবস্থায় হাতি পালিয়ে যাওয়ার এইরকম একটি দৃষ্টান্ত হল উদয়গিরি নামে হাতিটির কাহিনি। এই মদ্দা হাতিটি ছিল রাষ্ট্রপতির আস্তাবলের সদস্য। উৎসবের সময় তাকে অংশগ্রহণ করতে নিয়ে যাওয়া হত। অসমের জঙ্গলে মাত্র আট বছর বয়সে সে প্রথম ধরা পড়ে। তারপর কাজিরাঙার বিখ্যাত হাতি আকবরকে যেভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল একেও সেইভাবে যত্ন নিয়ে শেখানো হয়। ১৯৫৪ তে তাকে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে পাঠানো হয়। ১৯৫৬ সালে একটি শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়ার সময় সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার নিউমোনিয়া হয়েছিল। পরের বছর একজন পরিচারক উদয়গিরিকে শিকল পরাতে গেলে সে তাকে পিষে ফেলে। এই ঘটনার পরেই উদয়গিরিকে খাবার দেওয়া হলে সে সঙ্গেসঙ্গে খেতে শুরু করে ও শান্ত হয়ে যায়।

উদয়গিরির দেহে মস্ত রস ক্ষরণের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাকে বেঁধে রাখা হয়। তারপর যখন মনে হয় যে সে ওই অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে তখন খুলে দেওয়া হয় হাতিটিকে। এই সময় একদিন তাকে হাঁটাতে নিয়ে গেলে সে হঠাৎই খেপে ওঠে ও রাস্তা দিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে ধাওয়া করে। তারপরেই সে ধেয়ে যায় এক পথচারীর দিকে। লোকটি কোনো মতে একটি বাড়িতে ঢুকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। অসীম সাহসের সঙ্গে তিন ঘণ্টা ধরে মাহুত সমানে চেষ্টা করে হাতিটিকে বাগ মানানোর। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলে সে হাতিটির পিঠ থেকে লাফিয়ে একটি বাড়ির ছাদের উপর চড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হাতিটিকে গুলি করে মারা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।

উদয়গিরি এসেছিল অসমের জঙ্গল থেকে। দিল্লির সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সে মানিয়ে নিতে পারেনি। এর আগে তার দিল্লির তীব্র ঠান্ডা, প্রচণ্ড গরম আর দীর্ঘ খরা মরসুমের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। ১৯৫৬-র গরমের সময় তাকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরের বছরও দেরাদুনে যাওয়ার আগেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

মত্ত অবস্থায় একটি হাতির অভাবনীয় শক্তির প্রকাশ ঘটে। ১৯৬৩-র ২৫ ডিসেম্বর কাগজে একটি খবর প্রকাশিত হয়। আরার কাছে জগদীশপুরে একটি হাতি, বাচ্চারা যেমন খেলনা নিয়ে খেলে, সেইরকম অনায়াসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ি শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্যে ছুড়ে দেয়। গাড়িটি গিয়ে পড়ে একটি বাড়ির চালে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে চালক সেই সময় গাড়ির মধ্যে ছিল না। হাতিটিকে আসতে দেখেই সে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। বহু চেষ্টার পর শেষপর্যন্ত মাহুত হাতিটিকে কবজা করতে পারে।

ভারতের হস্তী ধরা

খেদা— শিকারিদের কতক অশ্বপৃষ্ঠে এবং কতক পদব্রজে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালই হস্তী ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে স্থানে হস্তী বিচরণ করে, সেই স্থানে শিকারিরা উপস্থিত হইয়া ঢোল এবং ভেঁপু বাজাইতে থাকে। ঢোল ও ভেঁপুর শব্দে, হস্তীযূথ ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়। এইরূপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া, শরীরের ভারে ক্রমে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে; তৎপরে নিকটস্থ বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন পাকা শিকারিরা বৃক্ষছাল বা পাটের তৈয়ারি দড়ি হস্তীর গলায় বা পায়ে বাঁধিয়া দেয়। পরে পালিত ও শিক্ষিত হস্তী দ্বারা সেই সমস্ত বন্যহস্তী প্রলোভিত হইয়া ক্রমে মনুষ্যের বশীভূত হয়। একটা হাতির যত দাম, শিকারিরা তাহার সিকি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়।

চোরখেদা— যেখানে বন্য হস্তীযূথ বিচরণ করে, শিকারিরা সেখানে একটি পোষা হস্তিনী লইয়া যায়। মাহুত সেই হস্তিনীর পৃষ্ঠে নীরবে মৃতবৎ শয়ন করিয়া থাকে। হস্তিনীর পৃষ্ঠে যে কোনো মানুষ আছে, তাহা জানিবার জো নাই। হস্তীরা হস্তিনীকে দেখিয়া, আপনাআপনি লড়াই করিতে থাকে। ইত্যবসরে মাহুত, হস্তীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দেয়। শ্যামদেশে এই প্রথায় হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

গাদ— যেখানে হস্তীযূথ সচরাচর বিচরণ করে, সেই স্থানে একটি গর্ত খুঁড়িয়া রাখা হয়। এই গর্ত ঘাসে পরিপূর্ণ থাকে। শিকারিরা অদূরে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহে। হস্তীর দল সেই গর্তের নিকট উপস্থিত হইলে, শিকারিরা ঝোপের মধ্য হইতে শব্দ করিতে আরম্ভ করে। হস্তীগণ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অসাবধানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, ক্রমে একটা-না-একটা সেই গর্তের ভিতর পড়িয়া যায় এবং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে থাকে। গর্তের ভিতর যিনি পড়িলেন, তিনিই গেলেন। তাহাকে জল বা কোনোরকম খাদ্য দেওয়া হয় না, কাজেই ক্রমে সে বশে আসে।

বার— যে স্থানে হস্তীর দল বিশ্রাম করে, সেইখানে শিকারিরা একটা প্রকাণ্ড গর্ত খনন করে। সেই গর্তের একদিকে একটা পথ থাকে, পথের মুখেই একটি দরজা বসাইতে হয়। দরজা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। দড়িটি কাটিয়া দিলেই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। দরজার নিকট হস্তীর খাদ্যও নানাবিধ থাকে। হস্তীযূথ সেই সকল খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে খাদ্যের লোভে বে-সামাল হইয়া দরজার ভিতর প্রবেশ করে। শিকারিরা তখনই দড়ি

কাটিয়া দেয়। অমনই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। হস্তীযূথ তখন বিকট চিৎকারে দরজা ভাঙিবার চেষ্টায় থাকে। শিকারিরাও তখন আগুন জ্বালিয়া বাদ্য-বাজনা করে। হস্তীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। ক্রমে তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই সময় হস্তিনী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিক্ষিত হস্তিনীর মোহন ফাঁদে পড়িয়া, হস্তীযূথ আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। সেই সুযোগে শিকারিরা, তাহাদিগকে ধরিয়া পেলে। ক্রমেই সেই মত্ত মাতঙ্গ, মানুষের করায়ত্ত ও বশীভূত হয়।

মোগল সম্রাট আকবরের পূর্বে এই চারি প্রথার যেকোনো প্রথায় হস্তী ধৃত হইত। আকবর একটি কৌশল উদ্ভাবিত করেন। সেই কৌশল এই; বন্য হস্তীযূথের তিনদিকে হস্তীচালকগণ ঘেরিয়া রহিত; একদিক খোলা থাকিত। এই দিকে বহু সংখ্যক হস্তিনী রাখিয়া দেওয়া হইত। চারিদিক হইতে, বন্য হস্তী সকল আসিয়া হস্তিনীদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। হস্তিনীরা তখন একটি রক্ষিত স্থানে যাইত; হস্তীরাও তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্তী হইত। তাহার পর তাহারা উপরোক্ত উপায় ধৃত হইত। এখন হস্তী ধরিবার নানা কৌশল প্রচলিত আছে।

ভারতের নানা স্থানে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। এখন কিন্তু আর পূর্বের মতন হস্তী পাওয়া যায় না। ১৮৬৮ সালে মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট হস্তিনী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এ কার্যে নেপাল গবর্নমেন্টের অনেক আয় হয়। সিংহলে এখনও অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। আসামেও হস্তী ধৃত হয়। সিংহলের হস্তীরা বড়ো দুর্ধর্ষ। তাহারা সময়ে সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ক্ষেত্রের সমগ্র ফসলাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। এইজন্য সিংহল গবর্নমেন্ট হাতি মারিবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। কর্তৃপক্ষের নিকট একটি লাঙ্গুল আনিলেই চারি টাকা পুরস্কার। একবার ছয়শত হস্তী মারিবার জন্য গবর্নমেন্টকে হাজার টাকা পুরস্কার দিতে হইয়াছিল। শিকারিরা হস্তীর সম্মুখবর্তী হইয়া গুলি করে। গুলি কপাল ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে মৃত্যু নিশ্চিত। এতদ্‌ব্যতীত কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে গুলি করিতে হয়।

বন্দুক, বন্দুকের প্রকার ও ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য

বন্দুক মোটামুটি দুই রকমের বলা যেতে পারে। এক হচ্ছে স্মুথ-বোর (Smooth-bore) বন্দুক, আর এক রকম হ'ল রাইফ্‌ল (Rifle)। নলের ভিতরের গঠনকে বোর বলে। স্মুথ-বোর বন্দুকের নলের ভিতরটা একেবারে মসৃণ বা প্লেন, —একটা সাধারণ জলের পাইপের ভিতরটা যেমন হয়। ...রাইফ্‌লের নলের ভিতরটা সম্পূর্ণ প্লেন নয়, আগাগোড়া স্ক্রুয়ের মতো করে একটা অগভীর প্যাঁচালো খাঁজ কাটা থাকে। ছিদ্রের ভিতরে আলো ফেলে দেখলেই ঐ খাঁজটিও স্পষ্ট দেখা যায়। রাইফ্‌লের নল সম্পূর্ণ ইউরোপ থেকে আমদানী। ইউরোপীয়েরা আমাদের দেশে আসবার আগে আমাদের দেশের লোকেরা 'সাদানলী' বন্দুকের ব্যবহার জানত।

এই দুই রকম বন্দুকই এক নল বা দুই নলের হতে পারে। দুই নলের বন্দুককে দু'নলী

BanglaBook.org

বা জোড় নলী বন্দুক বলে। এক রকম একনলী রাইফ্‌ল আছে, তার নাম মেগাজিন (Magazine) রাইফ্‌ল। মেগাজিন মানে একটি আধার যার মধ্যে কতকগুলি কার্তুজ রাখা যায়। এই রকম একটি করে মেগাজিন এই রাইফ্‌লগুলিতে সংযুক্ত থাকে এবং মেগাজিনটি রাইফেলের একটি অংশ বলা যেতে পারে। মেগাজিন রাইফেল এমনভাবে তৈরী যাতে একটি কার্তুজ ফায়ার হবার পর, বন্দুক সংলগ্ন কোন বিশেষ অংশ (যার নাম লিভার) হাত দিয়ে ঠেলা বা টানা মাত্রই যে কার্তুজটি ফায়ার হয়ে গেল, সেটি নল থেকে বেরিয়ে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেগাজিন থেকে আর একটি কার্তুজ গিয়ে নলের মধ্যে ঢোকে। ...সাধারণত পাঁচ বা ছ'টা কার্তুজ এক একটি মেগাজিনে থাকে। আবার এরকম মেগাজিন রাইফ্‌লও আছে, যাতে একটা কার্তুজ ফায়ার হওয়ার পর আর হাত দিয়ে কিছুই করতে হয় না, আপনা-আপনি ফায়ার হওয়া কার্তুজ তৎক্ষণাৎ নল থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার জায়গায় আর একটা কার্তুজ মেগাজিন থেকে বেরিয়ে নলের ভিতরে যায়। ...আজকাল প্রায় সমস্ত যুদ্ধের রাইফ্‌লই এই রকমের। একে অটোমেটিক রাইফ্‌ল বলে।

...রাইফ্‌লে ছট্‌রা ব্যবহার করা যায় না। প্রত্যেক ফায়ারে কেবলমাত্র একটি বুলেট বা গুলি ছোঁড়া যায়। সুতরাং রাইফ্‌ল দিয়ে পাখী শিকার— বিশেষতঃ উড়ন্ত পাখী শিকার চলে না। ...পাখী শিকারে সাদানলী বন্দুকই ব্যবহার হয়, রাইফ্‌ল ব্যবহার হয় না... আমরা সাধারণতঃ যে সব সাদানলী ব্যবহার করি তার গুলি সত্তর-আশী গজের বেশী দূর শিকারের জন্তুর পক্ষে বড় একটা মারাত্মক হয় না। কিন্তু রাইফ্‌ল সাদানলীর চেয়ে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী অস্ত্র। বড় জন্তু শিকারের জন্য তৈরী একটা সাধারণ রাইফ্‌ল দিয়ে পাঁচ ছয় শত গজ দূর থেকে বাঘ-ভাল্লুক সহজে মারা যায়, যদি ঠিক মত লাগাতে পারা যায়। ...আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে শিকারে দুইশত গজের বেশী দূর থেকে ফায়ার করা প্রায়ই আবশ্যক হয় না। অধিকাংশ শিকার একশত গজের ভিতরেই হয়ে থাকে।

*

বন্দুকের নলের ছিদ্রকে ইংরেজীতে বোর বলে। আমরা যে সাদানলী বন্দুক বেশী ব্যবহার করি তার বোরের নম্বর হচ্ছে ১২। ...এই ১২ নম্বরের সাদানলীর বোরের ব্যাসের পরিমাণ বা ফাঁদ হচ্ছে এক ইঞ্চিকে চার ভাগ করে তিন ভাগ নিলে যতটা হয় তার চেয়ে সামান্য একটু কম। কিন্তু রাইফ্‌লের বোরের কথা যখন বলা হয়— তখন ঐ রকম মনগড়া নম্বর দিয়ে বলা হয় না। একেবারে বুঝে নেওয়া যায়, তার বোরের ফাঁদ এক ইঞ্চির কত অংশ। যেমন যদি কেউ বলে, 'এটা পাঁচশো বোরের রাইফ্‌ল,' তখনই বুঝতে হবে তার বোরের ব্যাস এক ইঞ্চিকে এক হাজার ভাগ করে তার পাঁচশত ভাগ নিলে যতটা হয় ঠিক ততটা— অর্থাৎ আধ ইঞ্চি। সেই রকম 'চারশত বোরের রাইফ্‌ল' মানে তার বোরের ব্যাস ঠিক $\frac{৪০০}{১০০০}$ বা ২/৫ ইঞ্চি।

*

১২ নম্বর সাদানলীর নলের দৈর্ঘ্য ও বোরের ব্যাস আজকাল শিকারে যে সব রাইফ্‌ল ব্যবহার হয় তার চেয়ে বড়, কিন্তু ঐরূপ সাদানলীর ওজন ঐসব রাইফ্‌লের চেয়ে কম।

BanglaBook.org

তার কারণ, কার্তুজ ফায়ার হওয়ার সময় যাতে বারুদের বিস্ফোরণের জোরে নলা ফেটে না যায় এরকম দৃঢ় ক'রে নলা তৈরী করতে যতটা ইস্পাতের দরকার হয়, তা সাদানলীর চেয়ে রাইফ্‌লে অনেক বেশি লাগে। ... আজকাল বড়ো জন্তু শিকারের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী (high velocity) রাইফ্‌ল সাধারণতঃ ৩৫০-৫০০ বোরের মধ্যে হয়ে থাকে। ৪০০ বা ৪০৫ বোরের চেয়ে বেশী খুব কম লোকই ব্যবহার করে। তার চেয়ে বড় বোরের রাইফ্‌ল বিষম ভারী হয় আর তা ব্যবহার করতে খুব শক্তিমান হওয়া দরকার।

*

রাইফ্‌লের নলীর ছিদ্রের গায়ে স্ক্রুর মতো যে খাঁজকাটা থাকে তাতে প্রধানতঃ ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে বুলেট্‌টি নলার মধ্য দিয়ে চালিত হয়ে ঐ প্যাঁচকাটা খাঁজের সঙ্গে ঘর্ষণ পেয়ে মহাবেগে ঘুরতে ঘুরতে নলার মুখ থেকে বা'র হয়, এবং যতদূর ঐ রকম ঘুরতে ঘুরতে সোজা লাইনে ছোটে। ঐ মহাবেগে ঘোরার ফলেই বুলেট্‌ বহুদূর পর্যন্ত আপনার সরল গতিপথ থেকে পাশাপাশিভাবে বিচ্যুত হয় না, কেবল যেতে যেতে পৃথিবীর আকর্ষণে ক্রমশঃ নেমে প'ড়ে মাটিতে আঘাত করে।

*

শিকারে মেগাজিন রাইফ্‌লের চেয়ে জোড়নালী রাইফ্‌ল বেশী উপযোগী, এ অনেক শিকারীর মত। তার কারণ এই যে, শিকারের জন্তুর উপর থেকে লক্ষ্য না সরিয়ে জোড়নলী বন্দুকে একটার পর একটা, এরূপ দুইটা ফায়ার করা যায়, কিন্তু মেগাজিন্‌ রাইফ্‌লে তা করা যায় না। ... জোড়নলীতে তুমি নিমেষ না ফেলতে বাঘের উপর আরেকটি ফায়ার্‌ করতে পার, কিন্তু মেগাজিনে তা পারবে না। তুমি যতক্ষণে হাত দিয়ে লিভারের কাজ শেষ ক'রে আবার বাঘের উপর লক্ষ্য করবে, ততক্ষণে বাঘের তোমার উপর লাফ দেবার খুব সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য, অটোমেটিক্‌ রাইফ্‌লে হাত দিয়ে লিভার টানতে বা ঠেলতে হয় না, সুতরাং জোড়নলীর মতো তাতেও জন্তুর উপর হতে লক্ষ্য না সরিয়ে একটার পর একটা ফায়ার করে যাওয়া চলে। কিন্তু বড় জন্তু শিকারের উপযোগী অত্যন্ত শক্তিশালী বড় বোরের রাইফ্‌ল আজ পর্যন্ত অটোমেটিক হয়নি।

*

বন্দুকের যে বারুদ এবং বুলেট্‌ ব্যবহার হয় সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সদানলী আর রাইফ্‌ল দুয়েতেই কেবল কালো বারুদই ব্যবহার হ'ত। আজকালও যে কালো বারুদ ব্যবহার হয় না, তা নয়। তবে ঐ বারুদের ব্যবহার এখন কমে গেছে। কালো বারুদের ধোঁয়া বেশী হয়। আজকাল সাদানলীতে বেশীর ভাগ স্মোক্‌লেস (smokeless) বা নির্ধূম বারুদ ব্যবহার হয়। এই বারুদে যে একেবারে ধোঁয়া হয় না তা নয়, খুব কম ধোঁয়া হয়।

খুব বেশী শক্তিশালী (high velocity) রাইফ্‌লে কালো বারুদ ব্যবহার হয় না। তাতে যে বারুদ ব্যবহার হয় তাকে সাধারণতঃ কর্‌ডাইট্‌ (Cordite) অথবা য়্যাকসাইট্‌ (Axite) বলে। এই বারুদের বিস্ফোরণ শক্তি অত্যন্ত বেশী ব'লে যে সব রাইফ্‌লে এই বারুদ ব্যবহার

BanglaBook.org

হয়, তার নলে কালো বারুদ ব্যবহারের উপযোগী রাইফ্লের নলের চেয়ে অনেক বেশী পুরু ইস্পাতের তৈরী, এবং সেই কারণে ভারীও বেশী। একটা ৪০০ বোরের কর্‌ডাইট্ রাইফ্ল একটা ৫০০ বোরের কালো বারুদ রাইফ্লের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। একটা ৪০০ বোরের ইংরেজী কর্‌ডাইট্ রাইফ্লের ক্ষমতা এতেই বুঝতে পারা যাবে যে, ওই রাইফ্লের বুলেট (যার ব্যাস আধ ইঞ্চিরও কম) যখন ফায়ার্ হয়ে নলের মুখ থেকে বের হয়, তখন সেটা ৪০০০ ফুট পাউণ্ডের শক্তি বহন করে; অর্থাৎ একটা ৪০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৫০ মণ লোহার তাল এক ফুট উঁচু থেকে যদি মাটিতে পড়ে, সেই লোহার তাল যতটা জোরে মাটিকে ধাক্কা দেয়, এই ছোট বুলেট্‌টি নলা থেকে বেরিয়েই যে জিনিস বা জন্তুকে আঘাত করবে তাকে তত বড় ধাক্কা দেবে। একটা বড় রয়্যাল্ টাইগার (Royal tiger) আক্রমণ করবার জন্য লাফ দিয়েছে, আর তখন তার সম্মুখ দিয়ে যদি ঐ গুলি তার শরীরে আঘাত করে তা'হলে তার লাফের অর্ধপথেই বুলেটের বিষম ধাক্কায় লাফ থেমে যাবে এবং সে মাটিতে প'ড়ে যাবে।

*

রাইফ্লের বুলেট্ সাধারণতঃ দুই রকমের হয়। একরকম যার অগ্রভাগ নরম সীসার তৈরী, আর একরকম যার সমস্তটাই নিকেল্ বা ঐরকম কঠিন ধাতুর পাত দিয়ে ঢাকা। যে সব জন্তুর চামড়া বেশ নরম আর যাদের আকার অত্যন্ত বৃহৎ নয়, সেই সব জন্তুর উপর নরম বুলেট্ ব্যবহার হয়। ঐ বুলেট্ চামড়া এবং তার নীচের মাংস ভেদ ক'রে জন্তুর মর্মস্থানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বুলেটের নরম অগ্রভাগ ব্যাঙের ছাতার মতো চ্যাপ্‌টা ও বড় হয়ে অথবা খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে মর্মস্থান একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দেয় এবং অতি শীঘ্র মৃত্যু ঘটায়। বাঘের চামড়া নরম, সেইজন্য বাঘের উপর সর্বদা এইরকম বুলেট ব্যবহার হয়। ভালুকের চামড়া বাঘের মতো অত নরম না হলেও খুব বেশী শক্ত নয়, আর আকারেও ভালুক খুব বড় নয়, সুতরাং ভালুক শিকারেও এই বুলেট্ই ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট জন্তুর পক্ষে এই বুলেট্ উপযোগী। কিন্তু হাতী বা গণ্ডারের পক্ষে এই বুলেট উপযোগী নয়। এই সব জন্তুর চামড়া অত্যন্ত দৃঢ় এবং তারা আকারেও অত্যন্ত বৃহৎ। তাদের চামড়া এবং মাংসরাশি ভেদ ক'রে যেতে যেতে যে বুলেট চ্যাপ্‌টা বা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে সে বুলেট তাদের মর্মস্থানে পৌঁছুতেই পারবে না এবং শীঘ্র মারাত্মকও হবে না। এই জন্য ঐসব জন্তুর উপর কঠিন নিকেলের আবরণ দেওয়া বুলেট ব্যবহার হয়।

*

রাইফ্লের বুলেট ঠিক গোল নয়, লম্বাটে, আর অনেক সময় তার অগ্রভাগ কতকটা ছুঁচলো হয়। লেড্ পেন্‌সিলের কাটা অগ্রভাগ ঢেকে রাখবার জন্য যেরকম একটা ধাতুর আবরণ ব্যবহার করা হয়, প্রায় সেই রকম আকৃতির। সাদানলীর বুলেট সাধারণতঃ গোলাকারই হয়। অন্য রকমেরও আছে। কিন্তু গোল বুলেটই সাদানলীর পক্ষে বেশী উপযোগী।

BanglaBook.org

*

বন্দুকের লক্ষ্য বা নিশানা করবার কয়েকটা কথা। ...বন্দুকের নলের মুখটি সর্বদা লক্ষ্যের উপর রাখতে হবে, অথচ যত বেশী বেশী দূর থেকে নিশানা করা হবে, বন্দুক সেক্ষেত্রে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে নলের মুখ লক্ষ্যের উপর হতে না সরিয়ে, নলটিকে লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে বেশী বেশী ঊর্ধ্বমুখী ক'রে ধরা হয়, যার ফলে বুলেটটি লক্ষ্যতে পৌঁছুবার আগে নেমে প'ড়ে মাটিতে আঘাত না করে বা লক্ষ্যের নীচে দিয়ে বেরিয়ে না যায়।

*

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে, —'রাইফ্‌লের নলটা লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে কতটা ঊর্ধ্বমুখী করতে হয়, তা কি করে জানব?' তার উত্তর এই— নলার মুখ লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে কতটা ঊর্ধ্বমুখী ক'রে ধরতে হবে তার নির্দেশের উপায় বা যন্ত্র নলের উপরিভাগে তার গায়েই দেওয়া থাকে। নলের মুখের ঠিক উপরেই একটি ছোট ফোর্‌সাইট (Fore sight) বা মাছি বসান থাকে। এই ফোর্‌সাইট নলের গায়ে দৃঢ়-সংলগ্ন, এর নড়ন-চড়ন নেই। নলের একেবারে পিছন দিকে ব্যাক্‌সাইট (Back sight) বা নিশানা করবার জন্য ইস্পাতের ছোট পাত বসান থাকে এবং ঐ পাতের ঠিক মাঝখানে একটা খাঁজ কাটা থাকে। লক্ষ্যকারীর চোখের সঙ্গে লক্ষ্যের জিনিস ফোর্‌সাইট আর ব্যাক্‌সাইটের খাঁজ এক লাইনে আসলে তবে লক্ষ্য স্থির হয়। রাইফ্‌লের ব্যাকসাইট একটা থাকে না, ঐরকম কতকগুলি একটার পর একটা বসান থাকে। ব্যাক্‌সাইটগুলি নলার দেহ হতে সমান উঁচু নয়। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার ব্যাক্‌সাইট তাদের উচ্চতা অনুসারে পর পর সাজান থাকে, ও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের জন্য ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার ব্যাক্‌সাইট ব্যবহার করতে হয়। ব্যাকসাইটগুলির গায়েই ঐ সব দূরত্বের নির্দেশক সংখ্যা মুদ্রিত করা থাকে, — যেমন ১০০ গজ দূরের লক্ষ্যের জন্য যে ব্যাক্‌সাইট ব্যবহার করবে তাতে ১ লেখা থাকবে, ২০০ গজ দূরের লক্ষ্যের জন্য ২, ৩০০ গজের জন্য ৩, এই রকম। লক্ষ্য যত বেশী বেশী দূরে থাকবে, তত বেশী বেশী উঁচু ব্যাক্‌সাইট ব্যবহার করতে হয়।

*

অনেক রাইফ্‌লে ব্যাকসাইটের জন্য কতকগুলি ভিন্ন পাত না থেকে একটি মাত্র খাঁজকাটা পাত থাকে, এবং এরূপ একটা বন্দোবস্ত থাকে যাতে পাতটিকে অপর একটা অপেক্ষাকৃত লম্বা, ফুটরুলের মতো দাগ কেটে ভাগ করা, অপরিসর ইস্পাতের ফলকের গায়ে লক্ষ্যের দূরত্বানুসারে ইচ্ছামত উঁচুতে তুলে দেওয়া বা নীচেতে নামিয়ে দেওয়া যায়। দাগগুলোর মুখে দূরত্বজ্ঞাপক সংখ্যা লেখা থাকে, যেমন ১০০, ২০০ থেকে আরম্ভ ক'রে ১০০০, ১২০০ পর্যন্ত। ফলকটি নলার গায়ে একটা কব্জা দিয়ে আঁটা থাকে, যাতে রাইফ্‌ল যখন ব্যবহার করা না হয়, তখন ফলকটাকে নলার গায়ে শুইয়ে রাখতে পারা যায় এবং ব্যবহার করার সময় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। সে সব রাইফ্‌লে (যেমন যুদ্ধের রাইফ্‌ল) অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করার বন্দোবস্ত রাখতে হয়, তাতে এই রকম ব্যাক্‌সাইট্‌ই

BanglaBook.org

ব্যবহার হয়, কারণ তা না হ'লে নলার গায়ে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পাত দিতে হয়। শিকারের জন্য বড় বোর রাইফ্‌লে সচরাচর ৫০০ গজের উপরে নিশানা করবার বন্দোবস্ত থাকে না। এমন রাইফ্‌লও আছে যার বুলেটের গতিবেগ এত বেশী যে প্রথম ২।৩ শত গজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্‌সাইটের দরকার হয় না, অর্থাৎ ঐ দূরত্ব পর্যন্ত বুলেট মাটির দিকে নামতে সুরু করে না। এই রাইফ্‌লগুলি ছোট বোরের বেশী শক্তিশালী রাইফ্‌ল, এবং তার বুলেটের ওজনও বেশী নয়।

*

ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে লক্ষ্য করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্‌সাইট দিয়ে রাইফলে লক্ষ্যকারীর কাজ সহজ ক'রে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা ছাড়াও তার নিজের করণীয় বিশেষ কিছু বাকী থেকে যায়, এবং সেটা হচ্ছে লক্ষ্যের জিনিসের দূরত্ব অনুমান ক'রে নেওয়া।

*

রাইফ্‌লে খুব দূরে লক্ষ্য ভেদ করতে হলে লক্ষ্যকারীর শরীর ও মন সবল এবং স্নায়ু দৃঢ় হওয়া চাই। কারণ লক্ষ্য স্থির ক'রে ফায়ার্ করবার সময় এক চুল এদিক ওদিক হলে দূরের লক্ষ্যে গুলি লাগবে না, লক্ষ্য থেকে অনেকটা ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। এইজন্য যারা রাইফ্‌লে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তাদের অনেক দিন, অনেক মাস ধ'রে শরীর ও মনের সংযম শিক্ষা করতে হয়। মন নিরুদ্বেগ আর স্নায়ু ইস্পাতের মতো দৃঢ় হওয়া চাই। তারা সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য এমন কি তামাক পর্যন্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে এই সাধনায় রত হয়।

*

কোন কোন সাদানলী বন্দুকেও ৫০ এবং ৭৫ গজের ব্যাক্‌সাইট দেওয়া থাকে। আমার কিন্তু মনে হয় এই বন্দুকে ওরকম ব্যাক্‌সাইটের বিশেষ দরকার হয় না। ...এই বন্দুকের দৌড় বা পাল্লা বেশী দূর নয়। কোন একটা বন্দুক কিছুদিন ব্যবহার করতে করতেই বুঝা যায় ৬০, ৭০, ৮০ গজ দূর থেকে বুলেট দিয়ে মারতে হ'লে ঠিক লক্ষ্যস্থানের কতটুকু উর্ধ্বে লক্ষ্য করলে ভালো হয়। বেশী দামের উৎকৃষ্ট সাদানলী বন্দুকে ব্যাক্‌সাইট একেবারেই দেওয়া হয় না। এই বন্দুক যত বেশী উৎকৃষ্ট হয় তত বেশী হালকা হয়।

'শিকারের কথা' নামক অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে
এই বিশেষ অংশটি গৃহীত। প্রকাশকাল, ১৯৪১।
(বানান অপরিবর্তিত)

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাঙালির শিকারের আগ্নেয়াস্ত্র

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'শিকারের কথা' বইটি থেকে একটি পরিচ্ছদ— 'বন্দুক, বন্দুকের প্রকার ও ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য' পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'বিখ্যাত শিকার কাহিনী' নামের বইটিতে, যার সম্পাদনা করেছিলেন বিশু মুখোপাধ্যায়। ওই পরিচ্ছদটি এতই সুলিখিত ও তথ্যবহুল যে আজ এত বছর পরেও এই বইতে সেটি আর একবার হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। মূল লেখক অক্ষয় কুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংযোজন করার চেষ্টা করছি।

ছিনাথ বহুরূপীর কথা বলতে গিয়ে বাঙালির বাড়িতে মুঙ্গেরী গাদাবন্দুক থাকার কথা লিখে গেছেন শরৎচন্দ্র। বস্তুত সে-আমলে ওই ধরনের গাদাবন্দুক দিব্যি শিকারের কাজে ব্যবহৃত হত। স্থান, কাল, পাত্র বিচার করলে বুঝি, সেটি ছিল 'ক্যাপ লক' শ্রেণির গাদাবন্দুক, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মাস্কেট'। এর ব্যবহারবিধি ছিল অতীব সরল— বন্দুকের কুঁদো মাটিতে রেখে, নল আকাশমুখী করে, আপনার বারুদের ফ্লাস্ক থেকে পরিমাণ মতো বারুদ বন্দুকের নলে ঢেলে, 'র‍্যাম রড' বা গাদন কাঠি দিয়ে ভালো করে ঠেসে গাদুন। এবার আপনার গুলির থলি থেকে একটি সিসার গুলি কিছুটা কাপড়সহ নলে ঢুকিয়ে আবার 'র‍্যাম রড' দিয়ে গেদে নিন। কাপড় ঠিকমতো দেবেন নতুবা নল নীচু করলে সিসার বল নল দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এবার বন্দুকের হ্যামারটি আপনার বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছনে টেনে উঠিয়ে 'কক' করুন আর আপনার পাউচ থেকে একটি 'পার্কাশন ক্যাপ' নিয়ে বন্দুকের নলের গোড়ায় থাকা 'নিপিল'-এ লাগান। এতক্ষণে বন্দুকে গুলি ভরা শেষ হল। এবার বন্দুকটি কাঁধে তুলে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানলেই হ্যামার 'পার্কাশন ক্যাপ'-এ এসে আঘাত করল, ক্যাপ আগুন দিল নলের বারুদে, গুলি ছুটল— গুড়ুম। পরের গুলিটি ছোড়ার জন্য আবার প্রথম থেকে শুরু করুন। এইভাবেই শিকার চলত। উৎসাহীর অভাব হয়নি।

১৮৬৬ সালে বিলেতে এই ধরনের গাদা বন্দুকের বদলে সেনাবাহিনীতে প্রচলিত হল 'স্নাইডার' রাইফেল, যার পেছনটি খুলে নলের গোড়ায় গুলি ভরা যায়। এর নাম হল 'ব্রীচ লোডিং' সিস্টেম। বারুদ, সিসার গুলি নলের মধ্যে গাদার আর প্রয়োজন রইল না। 'পার্কাশন ক্যাপ', 'নিপিল' সব বাদ। মোটা কাগজের তৈরি স্নাইডারের বক্স কার্তুজের মধ্যে সামনে থেকে পিছনে পরপর সাজানো থাকত সিসার বুলেট, বারুদ আর প্রাইমার। ট্রিগার টিপলে হ্যামার এসে পড়ত ফায়ারিং পিন-এর উপর। পিনটি এসে নলের মধ্যে থাকা কার্তুজের পেছনে প্রাইমারে আঘাত করতেই প্রাইমার নিজে জ্বলে উঠে আগুন ধরাত কার্তুজের বারুদে— ছুটত গুলি। আগ্নেয়াস্ত্রের এই মূল কারিগরি বিষয়টি এখনো একই আছে।

এই সময় থেকে 'ব্রীচ লোডিং' রাইফেল ও 'ব্রীচ লোডিং' স্মুথ বোর বন্দুকের আলাদা পথ চলা শুরু হল। রাইফেলের কার্তুজে ধাতব খোল ব্যবহার করা হল, যা আজও চলেছে। স্মুথ বোর বন্দুকের ক্ষেত্রে ১৮৭৭ সাল থেকে মোটা কাগজের খোলের চলন হল, প্রধানত লাল রঙের, তার রেশ আজও কিছু দেখা যায়। বন্দুকের কার্তুজে প্লাস্টিকের

BanglaBook.org

খোলও এখন বেশ চালু হয়েছে।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বন্দুক নির্মাণ শিল্পী জোসেফ ম্যান্টন ১৭৯২ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে নিজ আবিষ্কারের কয়েকটি পেটেন্ট নেন, তার একটি হল দোনলা বন্দুকের দুটি নলের মাঝের অংশটি একটি সমতল ধাতব পাতের সাহায্যে জোড়ার বিশেষ কারিগরি। এই প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়েই ক্রমে আজকের সব দোনলা বন্দুক ও রাইফেলের জন্ম।

এবার শিকারে ব্যবহৃত বন্দুক সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। এখানে বন্দুক বলতে আমরা স্মুথ বোর বন্দুক ওরফে শট গানের কথাই বলছি।

বন্দুকের নলের ব্যাসকে 'বোর' বলা হয় সেটা আমরা সবাই জানি, যাকে একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিশ শতকের গোড়ায় বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি ১২, ১৬, ২০ এবং ২৮ বোরের বন্দুক বাজারে এসেছিল, বিভিন্ন শিকারে এরা ব্যবহৃত হতে শুরু করলেও ক্রমে দেখা গেল যে ১২ বোর বন্দুকই শিকারিরা বেশি ব্যবহার করছেন। কেন এর নাম ১২ বোর? কারণ এর নলের ব্যাস এমন একটি সিসার বলের ব্যাসের সমান যে সিসার বলের ১২ টি'র মোট ওজন ১ পাউন্ড। অর্থাৎ বোর নির্ণায়ক সংখ্যা যত কমবে বন্দুকের নলের ব্যাস তত বাড়বে আর সংখ্যা যত বাড়বে নলের ব্যাস তত কমবে। বাঙালি শিকারিরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ১২ বোর দোনলা বন্দুক ব্যবহার করে গেছেন। এখন রাস্তাঘাটে ব্যাঙ্কের প্রহরীদের হাতে যে বন্দুক দেখা যায় সবই ১২ বোর।

বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি এই ১২ বোর বন্দুক ব্যবহার করেছেন সে-আমলের শিকারিরা। প্রধানত ব্রিটিশ গান মেকারদের বন্দুকের কদর ছিল বেশি। এছাড়া ইউরোপের কিছু দেশের বন্দুকও বিক্রি হত। আমেরিকান বন্দুকের তেমন চল ছিল না। ভারতে দোনলা বন্দুক যা দেখা যায় তা সবই 'সাইড বাই সাইড' অর্থাৎ নল দুটি পাশাপাশি। 'ওভার আন্ডার' অর্থাৎ নল দুটি ওপর নীচে বসানো ১২ বোর মডেল প্রায় দেখাই যায় না। ব্রীচ খোলার অর্থাৎ লিভার সরিয়ে নল নাবিয়ে গুলি ভরার জন্য বন্দুক খোলার প্রক্রিয়ারও অনেক রকমফের ছিল।

দুটি বিশেষ ধরনের ১২ বোর বন্দুকের নাম এখানে উল্লেখ করতে হয়— প্যারাডক্স আর টিউবুলার ম্যাগাজিন যুক্ত রিপিটার ওরফে অটো লোডার। অবস্থাপন্ন শিকারি বন্দুকের দোকানে গিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ অনুযায়ী বন্দুকের অর্ডার দিতেন। 'ট্রায়াল গান'-এ মকশো করে দেখতেন কোন মাপে তিনি স্বচ্ছন্দ। তারপর বন্দুক তৈরি হত। বন্দুক তিনরকম ওজনের হত— লাইট, মিডিয়াম, হেভি। প্রতিটির নলের দৈর্ঘ্য বাছাই করে নেওয়া যেত ২৫, ২৮, অথবা ৩০ ইঞ্চি। যার যেমন পছন্দ বেছে নিতেন।

এবার কার্তুজের কথায় আসা যাক। শিকার দুই ধরনের— পাখি এবং জন্তু। পাখি শিকারের সময় বন্দুক থেকে একটি সিসার বল ছুড়ে কোনো লাভ নেই, তাতে হয়তো একটি পাখি পাওয়া গেল। কাজেই এমন ব্যবস্থা করতে হল যাতে এক গুচ্ছ ছোটো ছোটো গুলি পাখিদের দলে ছুড়ে দেওয়া যায়, এর ফলে এক ফায়ারেই অনেক পাখি পাওয়া সম্ভব। অসুবিধা নেই, বন্দুকের কার্তুজ থেকে সিসার বলটি সরিয়ে দিয়ে সেখানে

রাখা হল কিছু ছোটো ছোটো সিসা বা সংকর ধাতুর বল। এই ছোটো ধাতুর বলগুলিকে আমরা বলি 'ছররা', ইংরেজিতে 'শটস'। শটস ছোঁড়ে বলে এই বন্দুককে বলা হয় 'শট গান'। বিভিন্ন ব্যাসের ও বিভিন্ন সংখ্যার শটস যুক্ত বিভিন্ন রকমের কার্তুজ বিভিন্ন পাখি ও জন্তু শিকারের উপযোগী। বাছাইয়ের সুবিধার জন্য এইসব কার্তুজের গায়ে দেওয়া থাকে কিছু ইংরেজি অক্ষর অথবা নম্বর, যা দেখে বোঝা যায় ওই কার্তুজের ভিতর কি 'শট' আছে। এই চিহ্নগুলি সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত তাই এখানে স্থানীয় শিকারিরা তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে 'কার্ট্রিজ নাম্বার' দেখে দোকান থেকে কিনে নিতেন, এখনও কেনেন।

এই বিষয়ে ১৯৩৬ সালের একটি তালিকা দেওয়া হল—

কার্তুজের মার্কা	কার্তুজের ভিতরে ছররা বা শটের সংখ্যা	প্রতিটি শটের ব্যাস (মি. মি.)
LG	6	9.14
MG	7	8.81
SG	8	8.43
Special SG	11	7.57
SSG	15	6.83
SSSG	25	5.77
AAA	35	5.16
AA	40	4.93
BBB	60	4.32
BB	70	4.09
B	80	3.91
1	100	3.63
2	120	3.43
3	140	3.25
4	170	3.05
5	220	2.79
6	270	2.59

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিকারের জন্য বাজারের চাহিদা অনুসারে কার্তুজের বিবর্তনের ফলে এত রকমের শটগান কার্ট্রিজ তৈরি হয়েছিল যা বাঙালি শিকারিরা ব্যবহার করে গেছেন। এর কয়েকটি এখন আর পাওয়া যায় না। হিংস্র জন্তু যথা বাঘকে শায়েস্তা করতে আরও কিছু বিশেষ ধরনের ১২ বোর কার্তুজ বিশ শতকের মধ্যভাগ

পর্যন্ত ভারতে পাওয়া যেত, বাঙালি শিকারিদের লেখায় এগুলির উল্লেখ আছে। যেমন কলকাতার বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী Lyon and Lyon বিক্রি করত Kynoch-এর তৈরি 'লিথাল বল', 'ম্যান্টন-এর ছিল 'কনট্রাক্টাইল' বুলেট, রডা-র 'রোটেক্স' বুলেট, হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড-এর 'প্যারাডক্স' বুলেট।

বন্দুক দিয়ে ছররা ছুড়ে পাখি নামাতে গিয়ে দেখা গেল কিছু দূরে যাবার পরেই ছররাগুলি এত বেশি ছড়িয়ে পড়ছে যে শিকারের গায়ে তেমন আঘাত লাগছে না। আবিষ্কার হল যে বন্দুকের নলের ভিতর 'চোক' দিলে এই সমস্যা অনেকটা সামলানো যায়। বন্দুকের নলের ভিতরে সামনের কিছু অংশ একটু সরু করে দেওয়া হল, এরই নাম চোক। যে নলে চোক নেই তাকে বলা হয় 'সিলিন্ডার'। এই ব্যবস্থায় শিকারিদের বেশ সুবিধা হল। দোনলা বন্দুকে চোক ব্যারেলে রইল পাখি শিকারের ছররা, সিলিন্ডার ব্যারেলে রইল বড়ো জানোয়ারের জন্য বুলেট বা বল। এই চোক আবার বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। বিভিন্নরকম চোকের ছররা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আলাদা। ছররাগুলি ছড়িয়ে যাবার মাপকে বলা হয় 'স্প্রেড' যার ব্যাস ইঞ্চির মাপে দেওয়া হয়ে থাকে। শিকারি তার শিকার অনুযায়ী পছন্দমতো কার্তুজ ও চোক ব্যবহার করতে পারেন। চোক-এর বিষয়ে একটি তালিকা দেখলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

১২ বোর বন্দুকে চোকের কর্মক্ষমতার এই তালিকাটি ১৯৪২ সালের। শিকারের সময় এই হিসাবটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হত।

বোর	25 গজ দূরত্বে ছররা স্প্রেডের ব্যাস	40 গজ দূরত্বে ছররা স্প্রেডের ব্যাস
True Cylinder	38 ইঞ্চি	57 ইঞ্চি
Improved Cylinder	32 ইঞ্চি	51 ইঞ্চি
Half Choke	26 ইঞ্চি	46 ইঞ্চি
Full Choke	21 ইঞ্চি	40 ইঞ্চি

শিকারের তাড়াহুড়োয় বন্দুকের হ্যামারটি প্রতিবার উঠিয়ে, পরিভাষায় 'cock' করে তারপর ফায়ার করা বড়ো ঝামেলা বোধ হতে লাগল। অতএব উদ্ভাবিত হল self cocking hammerless শটগান। ১৮৭৫ সালে প্রথম সাফল্যের সাথে এই কাজ করেছিলেন ইংলন্ডের দুই গান মেকার Anson এবং Deeley। এই ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থার নাম হল 'বক্স লক' যা আজও তৈরি হয়। এঁরা দুজন প্রথমে Westley-Richards কোম্পানিতে কাজ করতেন, পরে নিজেদের প্রতিষ্ঠান খোলেন। ১৮৮০ সালে Fredrick Beasley আবিষ্কার করেন বন্দুকের আরও উন্নত 'সাইড লক'। হ্যামারলেস বন্দুকের প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও হ্যামারযুক্ত বন্দুক বহুদিন শিকারিরা ব্যবহার করেছেন। বাঙালি শিকারিদের হাতে হ্যামারলেস অথবা হ্যামারযুক্ত বন্দুক, এই দুই ধরনের লকসহ দেখা গেছে। 'সাইড লক' বন্দুকের দাম বেশি তাই ধনী শিকারিরাই ওই বন্দুক কিনতেন।

BanglaBook.org

শিকারিদের আর একটি সমস্যা ছিল ফায়ার করার পরে বন্দুক খুলে খালি খোলগুলি আঙুলের ডগা লাগিয়ে টেনে বার করে ফেলে দেওয়া। এতে সময় নষ্ট তো হতই অনেক সময় আবার খালি খোল চেম্বারে এমন এঁটে যেত যে ছুরি, কাঁচি, লাঠির খোঁজ পড়ত। এই সমস্যার সমাধান হল Anson & Deeley Action যুক্ত হ্যামারলেস ইজেক্টর মডেলের বন্দুক আসায়। বাঙালি শিকারিরা এই দুই ধরনের বন্দুকই ব্যবহার করে গেছেন।

বন্দুকের বিষয়ে আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আলোচনায় চলে আসে কিন্তু এখানে তাদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র হবে।

এবার রাইফেলের ব্যাপারটি দু-এক কথায় সেরে ফেলা যাক কারণ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাই আছে। বেশি লিখলে সেটা সাধারণ্যে 'গান ম্যানুয়েল'-এর মতো নীরস লাগবে।

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ তাঁর 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে বাঙালিকে 'ম্যানলিকার' রাইফেলের নাম শুনিয়েছেন। বাস্তবে ওইরকম 6.5 mm হালকা বোরের পাঁচ কার্তুজের রোটারি ম্যাগাজিন যুক্ত রাইফেল বড়ো জানোয়ার শিকারের পক্ষে একেবারেই অচল। যাই হোক, কিছু পুরোনো বাঙালি শিকারিরা ব্ল্যাক পাউডারের যুগের শেষ ভাগ যেমন দেখেছিলেন তেমনি পরের দিকের বেশির ভাগই শিকারিরাই তাঁদের রাইফেলে স্মোকলেস কর্ডাইট বারুদ যুক্ত কার্তুজ ব্যবহার করেছেন যা পুরনো বারুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কর্ডাইট বারুদ শিকার জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। যা এতকাল অসম্ভব ছিল তা আর রইল না। ১৮৮৯ সালে ইংল্যান্ডে Sir James Dewar আর Dr. W. Kellner এক নতুন বারুদের পেটেন্ট নেন (পেটেন্ট নং ৫৬১৪ এবং ১১৬৬৪)। এই বারুদ প্রপেলান্টে ছিল (ওজনের হিসাবে) ৫৮% নিট্রোগ্লিসারিন, ৩৭% নিট্রোসেলুলোস, ৫% পেট্রোলিয়াম জেলি। 'অ্যাসিটোন' সলভেন্ট ব্যবহার করে তৈরি এই বিরাট শক্তিশালী পদার্থটি দেখতে হল সরু সরু দড়ি বা 'কর্ড'-এর মতো। নাম দেওয়া হল 'কর্ড পাউডার'। অচিরেই এই নাম পালটে হয়ে গেল 'কর্ডাইট' বাকিটা ইতিহাস।

বহু রকমের রাইফেলের কথা বাঙালি শিকারিদের লেখায় পাওয়া যায় Jeffry's .333 Cordite Magazine Rifle, Holland & Holland, .375 Magnum Magazine Rifle, Winchester .300 H&H Magnum Magazine Rifle, হাতি শিকারের জন্য ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর Manton .470 Double barrel Rifle ইত্যাদি আরও আরও অনেক। প্রতিটি রাইফেলের নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব থাকে যার জন্য একজন শিকারি ওই রাইফেলটি বেছে নেন। সেই বিশেষত্বগুলি আলোচনা ও শিকারকাহিনি লেখকের সঙ্গে রাইফেলগুলির তুলনামূলক মূল্যায়ন এক বড়ো বিষয় যা থেকে ওই রাইফেল ব্যবহারকারী শিকারির শিকার চরিত্রের এক বিশেষ ছবি আমরা পেতে পারি। ভবিষ্যতে ইতিহাসের আলোয় শিকারি বাঙালির ডাকাবুকো মনন আচরণ বিশ্লেষণে হয়তো তার প্রয়োজন হবে।

BanglaBook.org

অমিতাভ কারকুন

ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প

ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম	মোট আয়তন (বর্গ কি মি)	কোর আয়তন (বর্গ কি মি)
(১) বান্দিপুর (কর্ণাটক)	৬৯০	৩৩৫
(২) করবেট (উত্তরপ্রদেশ)	৫২০	৩২০
(৩) কানহা (মধ্যপ্রদেশ)	১৯৪৫	৯৪০
(৪) মানস (আসাম)	২৮৪০	৩৯১
(৫) মেলঘাট (মহারাষ্ট্র)	১৫৭১	৩১১
(৬) পালামৌ (বিহার)	৯৩০	২০০
(৭) রণথম্বোর (রাজস্থান)	৩৯২	১৬৭
(৮) সিমলিপাল (ওড়িশা)	২৭৫০	৩০০
(৯) সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ)	২৫৮৫	১৩৩০
(১০) পেরিয়ার (কেরালা)	৭৭৭	৩৫০
(১১) সরিস্কা (রাজস্থান)	৮০০	৪৯৮
(১২) বক্সা (পশ্চিমবঙ্গ)	৭৪৫	৩১৩
(১৩) ইন্দ্রাবতী (মধ্যপ্রদেশ)	২৭৯৯	১২৫৮
(১৪) নাগার্জুন সাগর (অন্ধ্রপ্রদেশ)	৩৫৬০	১২০০
(১৫) নামধাপা (অরুণাচলপ্রদেশ)	১৮০৮	৬৯৫
মোট	২৪,৭১২	৮৬০৮

(নবতম 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প' দুধওয়া বাদ দিয়ে)

ভারতের ন্যাশনাল পার্ক ও স্যাংচুয়ারী

রাজ্য	ন্যাশনাল পার্ক ও স্যাংচুয়ারীর নাম	অবস্থিতি	মাপ
১. জম্বু ও কাশ্মীর	স্যাংচুয়ারী (তিনটি) ঐ ঐ	কাশ্মীর প্রদেশ জম্বু প্রদেশ	....
২. পূর্ব-পাঞ্জাব	ঐ ঐ	.....	....
৩. পেপ্‌সু	স্যাংচুয়ারী	কান্দাঘাট জেলা ও পেপসুর অন্যান্য সংরক্ষিত বনভূমি	
৪. উত্তর—প্রদেশ	(১) হেইলী ন্যাশানাল পার্ক (২) রাজাজী স্যাংচুয়ারী (৩) কান্‌সরন স্যাংচুয়ারী (৪) নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারী (৫) করবেট পার্ক	গাড়োয়াল ও ন্যাশনাল জেলা শিবালিক পার্বত্য বিভাগ দেরাদুন অরণ্য বিভাগ কুমায়ুন বিভাগ	.... ১২৫ বঃ মাঃ
৫. পশ্চিমবঙ্গ	(১) লোথিয়ান দ্বীপ (সুন্দরবন) স্যাংচুয়ারী (২) সিনচল স্যাংচুয়ারী (৩) মহানদী ,, (৪) গরুমারা ,, (৫) চাপড়ামারা ,, (৬) জলদাপাড়া ,,	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও বক্সা বিভাগ	২১ বঃ মাঃ
৬. আসাম	(১) মোনাস বা উত্তর কামরূপ স্যাংচুয়ারী (১৯০৫)	কামরূপ জেলার ভুটান পর্বতের তলদেশ অঞ্চল	১০৫ বঃ মাঃ
	(২) সোনাই রুপাই স্যাংচুয়ারী (১৯৩৪)	চরাদুয়ারের সংরক্ষিত অরণ্যে আকা পর্বতের তলদেশ অঞ্চল ও বালিপাড়া	৮৫ বঃ মাঃ
	(৩) পাভা (মিলরয়) স্যাংচুয়ারী (১৯৪১)	উত্তর লখীমপুর	১৮ বঃ মাঃ
	(৪) কাজিরাঙ্গা স্যাংচুয়ারী (১৯০৮)	আসাম বরাবর দক্ষিণ ট্র্যাঙ্ক রোড	১৬৫ বঃ মাঃ
	(৫) ওরাং সংরক্ষিত বনভূমি (১৯১৫)	মঙ্গলদই হইতে টেস্কপুর	২৪ বঃ মাঃ

রাজ্য	ন্যাশনাল পার্ক ও স্যাংচুয়ারীর নাম	অবস্থিতি	মাপ
৬. আসাম	(৬) উমতি স্যাংচুয়ারী	খাসী ও জয়ন্তীয়া পর্বত	....
	(৭) গণ্ডার ও মহিষের স্যাংচুয়ারী	পশ্চিম গোয়ালপাড়া বিভাগের রিপু সংরক্ষিত অঞ্চলের মাক্তেও গাঁ ও মাউলা ব্লক	
	(৮) গণ্ডারের জন্য সংরক্ষিত	লাওখোয়া অঞ্চল	২৬ বঃ মাঃ
	(৯) তিরাপ সীমান্ত ট্র্যাক ন্যাশনাল পার্ক	আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল	....
৭. মধ্য প্রদেশ	(১) তাইরোবা সংরক্ষিত অরণ্য	উত্তর চান্দা বিভাগ	....
	(২) বান্‌জার ,, ,,	মান্দালা ,,	....
	(৩) বোরী ,, ,,	হোসাঙ্গাবাদ ,,	....
৮. বোম্বাই	(১) কৃষ্ণগিরি উপবন বা কান্‌হেরী ন্যাশনাল পার্ক	কান্‌হেরী উপত্যকা	৯ বঃ মাঃ
	(২) বন্যপ্রাণী স্যাংচুয়ারী এবং ন্যাশনাল পার্ক	উত্তর কিনারা বিভাগের কুলগী ও বীরনোলী	৮০ বঃ মাঃ
	(৩) এলিফেন্টা দ্বীপ	....	....
৯. মাদ্রাজ	মধুমালিয়া স্যাংচুয়ারী	নীলগিরি জেলা	২৩ বঃ মাঃ
১০. মহীশূর	(১) ভেনুগোপালা স্যাংচুয়ারী	.....	২২.৫ বঃ মাঃ
	(২) পক্ষী স্যাংচুয়ারী		
	(৩) মৎস্য স্যাংচুয়ারী	সিরিঙ্গাপটমের নিকট	....
	(৪) ন্যাশনাল পার্ক (ক্ষুদ্র)	রামনাথপুর	....
		মহীশূর পশুশালা	৪০ একর
১১. ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন	(১) পেরিয়ার ক্যাচ্‌মেণ্ট অঞ্চল স্যাংচুয়ারী		২৩২ বঃ মাঃ
	(২) পীরমেড গেম এ্যাসোসিয়েশন অঞ্চল		২২.৫ বঃ মাঃ
	(৩) একটি সংরক্ষিত বন, স্যাংচুয়ারী এবং ন্যাশলান পার্ক		৫৮৩ বঃ মাঃ

বঃ মাঃ = বর্গ মাইল

* উপরোক্ত তালিকাটি 'বিখ্যাত শিকার কাহিনী' (প্রকাশকাল ১৯৬৩) থেকে গৃহীত। এটি একটি সময়ের দলিল। বর্তমানে পাঁচশোর অধিক স্যাংচুয়ারী, প্রায় একশোটি ন্যাশনাল পার্ক এবং পঞ্চাশটি ব্যাঘ্র প্রকল্প তৈরি হয়েছে।

ভারতের বন্যপ্রাণী

মাংসাশী

১। ভারতীয় সিংহ
২। বাঘ
৩। প্যান্থার বা লেপার্ড
৪। চিতাবাঘ
৫। স্নো লেপার্ড বা আউন্স
৬। ক্লাউডেড লেপার্ড
৭। হায়না
৮। বুনো কুকুর

সাধারণ

১। হাতি
২। গণ্ডার

সরীসৃপ

১। কুমীর (পশু বা মানুষ, উভয়ই খাদ্য)
২। ঘড়িয়াল (সাধারণতঃ মাছই প্রধান খাদ্য)
৩। পাইথন বা ময়াল (সর্বভুক)

তৃণভোজী

১। শূকর ২। সজারু ৩। খরগোশ

গবাদী

১। বন্যমহিষ
২। বাইসন বা গৌর
৩। ইয়াক

মৃগজাতীয়

ডিয়ার

১। সম্বর বা গোঁড়
২। বারশিঙ্গা বা সোয়াম্প ডিয়ার
৩। বারকিং ডিয়ার বা কোট্‌রা
৪। স্পটেড ডিয়ার বা চিত্রল
৫। মাস্ক ডিয়ার বা কস্তুরী হরিণ
৬। কাশ্মীর স্ট্যাগ্‌
৭। হগ্‌ ডিয়ার (লসুনা)
৮। মাউস ডিয়ার (গুড়াণ্ডি)

গেজেল

১। নীলগাই ২। কৃষ্ণসাগর ৩। চৌর শিঙ্গা
৪। চিংকারা
৫। তিব্বতীয় গেজেল ৬। তিব্বতীয় এণ্টিলোপ

ভাল্লুক

১। হিমালয়ী কালো ভাল্লুক ২। হিমালয়ী বাদামী ভাল্লুক
৩। শ্লথ ভাল্লুক ৪। মালয়ী ভাল্লুক

ছাগ ও মেষ জাতীয়

১। ভরাল
২। আরগামী
৩। আইবেস্ক্‌
৪। মার্কহর
৫। থর (নীলগিরি)
৬। সিরো
৭। ঘুরাল বা ঘোড়ল
৮। উরিয়ল
৯। টাকীন

* অবিভক্ত বাংলার বন্যপ্রাণী

জেলার নাম	প্রধান বন্যপ্রাণী
১. চব্বিশ পরগনা (উত্তর ও দক্ষিণ)	বাঘ, চিতল হরিণ, গোসাপ, কুমির, অলিভ রিডলি, বাটাগুর কাছিম, ময়াল, শামুকখোল, সোনাজংঘা, মদনটাক, মানিকজোড়, লেহার জঙ্গ, বালিহাঁস, মেছো বিড়াল, চিতা বিড়াল, বেজি বা নেউল, ভাম, গন্ধ গোকুল, খেঁকশিয়াল, বানর, মেঠোখরগোশ, বুনো শুয়োর। *চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, একখড়্গ গণ্ডার বিলুপ্ত।
২. খুলনা	বাঘ, চিতাবাঘ, মেছো বিড়াল, চিতাবিড়াল, ভাম, নেউল, ভোঁদড়, চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর রেসাস বানর, সজারু, খরগোশ, বুনোমুরগি, হরিয়াল, কুমির, গোসাপ, নানারকম পাখি।
৩. যশোহর	চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, হনুমান, হরিয়াল, হাঁস, বক, কাদাখোঁচা, গোসাপ। (*চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর বিলুপ্ত।)
৪. নদিয়া	চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, হাঁস, বেঙ্গল ফ্লোরিকান, কাদাখোঁচা, গোসাপ, গোখরো-কেউটে-চন্দ্রবোড়া।
৫. হাওড়া	চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, খেঁকশিয়াল, ভাম, চিতাবেড়াল, ভোঁদড়, সজারু, বজ্রকিট বা বনরুই, জলমুরগি, জলপিপি, কাদাখোঁচা, বক, গোসাপ, জলার কুমির।
৬. হুগলি	বাঘ, চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, গোসাপ বিলুপ্ত। আগে ছিল। নানারকম বিষাক্ত সাপ ও হাঁস আছে।
৭. বাঁকুড়া	চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না, শ্লথ ভালুক, বুনোশুয়োর, চিতল হরিণ, ময়ূর বিলুপ্ত। ময়াল সাপ, গোখরো, চন্দ্রবোড়া দেখা যায়।
৮. বীরভূম	বুনো রাজহাঁস, শামুকখোল। কিছুকাল আগেও চিতাবাঘ ছিল।
৯. কুষ্ঠিয়া	স্থানীয় কিছু পাখি ছাড়া হনুমান দেখা যায়।
১০. মুর্শিদাবাদ	বর্তমানে বন্য প্রাণী কিছুই নেই। একসময়ে চিতাবাঘ ও বুনোশুয়োর ছিল।
১১. রাজশাহি	গোসাপ, বুনো রাজহাঁস, নানারকম হাঁস ও জলচর পাখি।
১২. মালদহ	বুনো রাজহাঁস, তিতির। *কুমির ও লালশির হাঁস বিলুপ্ত। এক সময় প্রচুর জলচর পাখি ছিল।
১৩. দিনাজপুর	একসময় বুনোশুয়োর ও চিতা ছিল। এখন নেই।
১৪. বরিশাল	একসময় বাঘ, চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর ও চিতল হরিণ ছিল। এখন বিলুপ্ত। পাখি আছে নানারকম।
১৫. ফরিদপুর	প্রচুর গোসাপ ছিল। এখন বিলুপ্তপ্রায়। বিষাক্ত সাপ আছে।

জেলার নাম	প্রধান বন্যপ্রাণী
১৬. পাবনা	চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, নানারকম পাখি আছে।
১৭. বগুড়া	কোনো বন্যপ্রাণী নেই।
১৮. রংপুর	একসময় চিতাবাঘ, খরগোশ ও নানাজাতির পাখি ছিল।
১৯. জামালপুর	জেলার উত্তরাংশের শালবনে সাধারণ বানর এবং লজ্জাবতী বানর দেখা যায়। উল্লুকও আছে।
২০. ময়মনসিংহ	বাঘ, চিতল হরিণ, সম্বর এবং কাঁকর হরিণ ছিল প্রচুর। বাঘ এবং হরিণ বিলুপ্ত।
২১. টাঙ্গাইল	বন্যপ্রাণী নেই।
২২. ঢাকা	একসময় বাঘ, চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, সম্বর হরিণ, কাঁকর হরিণ, জংলা হরিণ ও ময়ূর দেখা যেত। এখন বিলুপ্ত। বর্তমানে জেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের শালবনে রেসাস বানর দেখা যায়।
২৩. সিলেট	জেলার পূর্বাঞ্চলের সবুজ অরণ্যে আছে লজ্জাবতী বানর, সোনালি হনুমান, বাদামি হনুমান, চশমাপরা হনুমান, রেসাস বানর, অসমিয়া বানর, উলটোলেজি বানর, উল্লুক ও বুনো কুকুর।
২৪. কুমিল্লা	কোনো বন্যপ্রাণী নেই।
২৫. নেয়াখালি	কোনো বন্যপ্রাণী নেই।
২৬. পটুয়াখালি	কোনো বন্যপ্রাণী নেই।
২৭. চট্টগ্রাম	হাতি, গৌওর, সম্বর, কাঁকর হরিণ, বুনোশুয়োর, লজ্জাবতী বানর, লালচে হনুমান, খাটোলেজি বানর, অসমিয়া বানর, কাঁকড়া ভোজী বানর, বাঘ, চিতাবাঘ, জংলিমুরগি, বার্মিজ ময়ূর এবং জলচর পাখি। *বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি এবং গৌওর লুপ্তপ্রায়।
২৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম	গণ্ডার, হাতি, গৌওর, সম্বর, চিতল হরিণ, কাঁকর হরিণ, হনুমান, কাঁকড়াভোজী বানর, নানারকম বানর, উল্লুক, বুনো কুকুর, আমচিতা, বুনোমুরগি, জংলি হাঁস এবং নানারকম জলচর পাখি।
২৯. জলপাইগুড়ি	গণ্ডার, হাতি, গৌওর, বুনো মোষ, সম্বর হরিণ, চিতল হরিণ, কাঁকর হরিণ, পারা হরিণ, বারশিঙা হরিণ, শ্লথ ভাল্লুক, বুনোশুয়োর, বামনবরাহ, সজারু, খরগোশ, কণ্টকরোম, বজ্রকীট বা বনরুই, বাঘ, চিতাবাঘ, লালচিতা বা মেঘছাপ চিতা, জংলি বিড়াল, সোনালি বিড়াল, ভাম, গন্ধগোকুল, ভোঁদড়, ময়ূর, জংলি মুরগি, কালিজ, ডহর, কালো তিতির, ময়ালসাপ, জলচর পাখি। এদের মধ্যে কয়েকটি বন্যপ্রাণী বিলুপ্তপ্রায়।
৩০. কোচবিহার	বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত। একসময় দেখা যেত বাঘ, চিতাবাঘ, পারা হরিণ, কাঁকর হরিণ, বুনো মোষ, শামুকখোল, জংলি মুরগি আর ময়ূর।
৩১. দার্জিলিং	হাতি, গৌওর, সম্বর হরিণ, চিতল হরিণ, পারা হরিণ,

জেলার নাম	প্রধান বন্যপ্রাণী
	কাঁকর হরিণ, বুনোশুয়োর, উল্লুক, বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভালুক, কালো ভালুক, জংলি বিড়াল, গন্ধগোকুল, ভাম, শজারু, খরগোশ, বড়ো কাঠবেড়ালি, ময়ূর, জংলি-মোরগ, কালিজ, কালো তিতির, গোরাল, সিরু, মোনাল ফেজান্ট, তুষার চিতা।
৩২. পুরুলিয়া	মাঝে মাঝে অন্য রাজ্য থেকে আসে হাতি, চিতাবাঘ, ও ময়ালসাপ।
৩৩. মেদিনীপুর	বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভালুক, নেকড়ে, হায়না, হাতি, চিতল হরিণ, বানর, খরগোশ, হাঁস, কাদাখোঁচা, জলচর পাখি, গোসাপ, শঙ্খচূড়, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, ময়ালসাপ।

*** তথ্যসূত্র— বাংলার অরণ্য ও আরণ্যক : স্বপনকুমার দাস ও চিরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

শিকারের পাখী

(ডাঙ্গার)

১। পারট্রিজ (বাংলা ও হিন্দী নাম— তিতির) বহু রকমের হয়ে থাকে। নীচু হয়ে সোজাভাবে ওড়ে। এদের মারতে ৬নং ছররা ব্যবহার করতে হয়।

২। রেড ফাউল (জঙ্গলী মুরগী) গৃহপালিত মুরগীর মত দেখতে হয়। সোজাভাবে ওড়ে। ৬ নং ছররার দ্বারাই মারা যায়।

৩। ফেজেন্ট (কালিজ বা মুনাল) দেখতে কালো ও অল্প কিছু পাতলা সাদা দাগ আছে। মুনাল বহু রঙের হয়, তবে লালের প্রাধান্যই বেশী। ওড়া বিশেষ পছন্দ করে না, তবে উড়লে সোজাভাবে ওড়ে। ৪ নং ৬ নং ছররাই উপযুক্ত।

৪। পীফাউল (ময়ূর) গাছের উপরে থাকে ও উঁচু পাল্লায় ওড়ে। ওড়া অবস্থায় ৪ নং ও বসা অবস্থায় ১ নং বিশেষ কার্যকরী।

(জলের)

৫। গ্রে গুজ (সোনা রাজহাঁস) ১নং ছররা ব্যবহার করতে হয় এদের মারার জন্য।

৬। ব্রাহ্মনী ডাক (চখা) ১ নং ও ৪ নং ছররা প্রয়োজন।

৭। হুইস্‌লিং টীল (সারলী ও সিল্লী) ৬ নং ছররা।

৮। পিনটেল (দীঘা হাঁস) ৬ নং ছররা ব্যবহারই বিধেয়।

৯। রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড (লালশির) ৬ নং ছররার দ্বারাই নিহত করা যায়।

১০। হোয়াইট আইড পোচার্ড (ভূতীহাঁস) ৬ নং ছররা।

১১। ফ্যানটেল স্নাইপ, পিনটেল স্নাইপ, জ্যাক স্নাইপ, পেন্টেড স্নাইপ এরা বহু জাতীয় হয়ে থাকে। বাংলায় এদের কাদাখোঁচা বলে। ৮ নং ও ৯ নং ছররার দ্বারা জীবনান্ত ঘটানো যায়।

এই অংশটি প্রধানতঃ অদিতিমোহন রায়ের ‘শিকারের আদি কথা’ নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রকাশক : কমলা রায়, ২৮ নং চৌধুরী লেন, কলিকাতা ৪। প্রকাশকাল, ১৩৬৫।

(বানান অপরিবর্তিত)

লেখক পরিচিতি

এই সংকলনের লেখকরা যে সকলেই শিকারি ছিলেন তা নয়, লেখক তালিকায় পরিচিত লেখকরাও আছেন। শিকার ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে— সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তাঁরা অবদান রেখেছেন। শিকারিরা যেমন তাঁদের অভিজ্ঞতা সরাসরি লিখেছেন, অ-শিকারিরা সত্যঘটনা বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখায় প্রয়োগ করেছেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকজনের পরিচিতির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৬৫) : প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। ইংলণ্ডে পড়াশুনা ও কর্মগ্রহণ, এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। পরে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা সম্পাদনা, অধ্যাপনা ও সাহিত্যচর্চা। 'মৌচাক' পত্রিকায় 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে নানান মজার গল্প লিখেছেন। বিখ্যাত বই 'জগন্নাথের খেয়াল খাতা', 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' (অনুবাদ) ইত্যাদি। যৌবনে হকি ও ক্রিকেটের নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন।

ধরণীধর সেন (১৯০৯-১৯৮০) : নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রথমে ভূতত্ত্বে বি. এসসি.। পরে নৃতত্ত্বে এম. এসসি., নানা স্মরণীয় পুরাকীর্তি অনুসন্ধান অভিযানে অংশ নেন। ১৯৫৪য় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, অধ্যাপনা ও সাহিত্যচর্চা। রচিত বই : আদি মানব ও তুষার যুগ, অস্তি নর্মদা তীরে, কোলহাই হিমবাহের পথে, বাঙালীর জাতি পরিচয় ইত্যাদি। 'রংমশাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩) : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পরিব্রাজক। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'যাযাবর' ও ভ্রমণোপন্যাস 'মহাপ্রস্থানের পথে'। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ, হিমালয়ে দুর্গম গিরিঅঞ্চলে অভিযান, পরে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার বহু দেশ ভ্রমণ, ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান ইত্যাদি তার অবদান। রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত : প্রিয় বান্ধবী, নদ ও নদী, দেবতাত্মা হিমালয়, পর্যটকের পত্র, হাসুবানু, রাশিয়ার ডায়েরী, উত্তর হিমালয় চরিত, বনস্পতির বৈঠক ইত্যাদি।

হীরালাল দাশগুপ্ত (১৮৯০-১৯৭১) : স্বনামখ্যাত বিপ্লবী, রাজনীতিক ও লেখক। ১৯০৫ সালে অল্পবয়সে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেন, পরে বরিশালে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন বিপ্লবী দলে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯১১ সাল থেকে সাহিত্য জগতে প্রবেশ, ১৯১৬-১৮ কারাবরণ, পরে সক্রিয় রাজনীতি তথা কংগ্রেসে যোগদান, 'অভ্যুদয় প্রেস' স্থাপন, 'বরিশাল' ও 'তরুণ' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ ও লেখালেখি। এ ছাড়াও ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ শিকারি। শিকার নিয়ে তাঁর দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ : 'বাঘের জঙ্গল' ও 'মায়ামৃগ'।

BanglaBook.org

হিতেন্দ্রমোহন বসু : কুন্তলীন খ্যাত হেমেন্দ্রমোহনের পুত্র। সুদক্ষ ক্রিকেটার, কলকাতায় ক্রিকেট চর্চার অন্যতম স্থপতি। বিখ্যাত স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড় ও পরে বিখ্যাত কোচ। বাংলায় হাফেজ ও ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন, ছোটোদের জন্য নানা ছোটো ছোটো লেখা লিখেছেন। এ ছাড়া সুদক্ষ চিত্রশিল্পী— সন্দেশ ও মৌচাক পত্রিকায় চমৎকার অলংকরণ করেছেন। বাংলার দুই বিখ্যাত ক্রিকেটার গণেশ বসু ও কার্তিক বসু তাঁরই ভাই। পরিবারে শিকারের একটা ঐতিহ্যও ছিল।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : লালগোলার মহারাজা, দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীতে নিজের শিকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু বছর ধরে লিখে এসেছেন। সাহিত্যানুরাগী মানুষ, কলকাতার নানা সাহিত্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। রচিত বই : শিকারী জীবন, বাঘ ভাল্লুকের দেশে, বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি ইত্যাদি।

কুমুদনাথ চৌধুরী (১২৬৯-১৩৪০ বাংলা সন) : বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার হরিপুরে জন্ম। কুমুদনাথেরা সাত ভাই ছিলেন— বড়ো স্বনামধন্য আশুতোষ চৌধুরী। তাঁর কনিষ্ঠ এক ভাই বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। কুমুদনাথ ছিলেন নামজাদা ব্যারিস্টার, গুণগ্রাহী শিল্প-সাহিত্য প্রেমিক এবং দুঃসাহসী শিকারি। সাহিত্যপ্রতিভা কম উজ্জ্বল হলেও নগণ্য ছিল না। তাঁর লেখা 'Sport in Jheel and Jungle' ইংরেজি বইটির অনুবাদ করেছিলেন লেখকের ভাগনি প্রসিদ্ধা কবি প্রিয়ংবদা দেবী প্রায় ৮০ বছর আগে, পরে এই বইটি তাঁর কন্যা অলকা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'ঝিলে জঙ্গলে' নামে প্রকাশিত হয়। মধ্যপ্রদেশের এক জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়।

সূর্যকান্ত আচার্য (চৌধুরী) (৭।২।১৮৫১—২০।১০।১৯০৮) : জন্ম পূর্ববঙ্গে মুক্তাগাছায়। ময়মনসিংহের জমিদার। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে এবং স্বদেশি বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। জনহিতকর কাজে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, চিকিৎসালয়ে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। শিকারে এঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত। মাত্র ১৯/২০ বছর বয়সে শিকারের অভিজ্ঞতা শুরু হয়। শিকারের নানা তথ্য ও ঘটনা সন্নিবেশিত করে 'শিকার কাহিনী' (দু-খণ্ডে) বইটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৩ সালে।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭৫) : খ্যাতনামা ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। তাঁর কর্মদক্ষতায় আমাদের দেশে বিদেশী ভাস্করদের একাধিপত্যে ছেদ পড়ে। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' প্রাপ্ত। শিল্পীসত্তার বাইরে নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি যেমন কুস্তি, বংশীবাদন, সাহিত্যচর্চা ও অবশ্যই শিকার। নিজহাতে শিকার করেছেন। শিল্প শিক্ষক রূপেও প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি।

সূত্র সহযোগিতা : দেবাশিস গুপ্ত, সুগত রায়, প্রসাদ রঞ্জন রায়

সহায়ক বাংলা পুস্তক তালিকা

(শিকার ও শিকার-সম্পৃক্ত অরণ্যজীবন/প্রাণীজীবন/অরণ্য অভিযান সংক্রান্ত)

শুধু শিকারকাহিনি নয় আমাদের তালিকায় স্থান পেয়েছে অরণ্য প্রবাস, অরণ্য অভিযান যার পটভূমিকা শিকারকাহিনির থেকে কম রোমাঞ্চকর নয়, যেসব প্রাণী অতীতে শিকার হত তাদের জৈবজীবন সম্বন্ধে আবশ্যক তথ্যসমৃদ্ধ কয়েকটি বিখ্যাত বইও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে কাল্পনিক কোন মৃগয়াকাহিনির বই তালিকাভুক্ত না হয়। লেখকরা প্রায় সকলেই নিজেদের শিকারের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, অরণ্যজীবন ও প্রাণীজীবন সম্পর্কে বইয়ের লেখকরা লিখিত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষদর্শী বিশেষজ্ঞ। প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রুতকীর্তি বিদেশি শিকারি বা আরণ্যক অভিযাত্রীদের কাহিনির অনুবাদ এই তালিকায় এল কেন? তার উত্তর হল যেহেতু এগুলো প্রত্যক্ষ ও সত্য ঘটনার সারাৎসার তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য সংযোজিত। তালিকার বহু বই পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে পাঠকদের উত্তরোত্তর প্রয়াসে তালিকাটি আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে আশা রাখি।

বই	লেখক	প্রকাশক	মুদ্রণকাল
অবিশ্বাস্য অভিযান	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯৬
আনাড়ি এক হাতি শিকারী	সাধন ভট্টাচার্য	কথাশিল্প	
আফ্রিকার সাফারি	অনুবাদ : মনোরঞ্জন ঘোষ	বেঙ্গল পাবলিশার্স	
আফ্রিকার বনেজঙ্গলে	কেনেথ আন্ডারসন/অনু:-পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং	১৯৯০
আমার শিকার স্মৃতি	বিজয়কান্ত সেন		
আফ্রিকার জঙ্গলে বার বার	রতনলাল ব্রহ্মচারী		
আমার ভারত	জিম করবেট (অনুবাদ)	অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির	
আসামের জঙ্গলে	সুধাংশুকান্ত আচার্য্য	ময়মনসিংহ প্রিন্টার্স লিমিটেড	
উগান্ডার বনে জঙ্গলে	কেনেথ আন্ডারসন/অনু:-পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং কোং	
কায়না	আত্তিলিও গাত্তির 'আফ্রিকা'/অনু:-ময়ূখ চৌধুরী	নিউবেঙ্গল প্রেস	১৯৮৭
কার্পেট সাহেব	অনু:- পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং কোং	
কাফু'র সিংহ	নর্মান কার/অনু:-পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং কোং	১৯৮৪
ক্রিসেন্ট পাহাড়ের নরখাদক	কেনেথ আন্ডারসন/অনু:পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং কোং	১৯৮৪
কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ	জিম করবেট	সিগনেট প্রেস, ১৯৫৩	
গহনবনের গোপন কথা	পবিত্রময় দত্ত	দে'জ পাবলিশিং কোং	২০০২
গারোহিলের গুণ্ডা হাতি	বিশ্বনাথ বসু	গ্রন্থ প্রকাশ	১৩৮১
গ্রামবাংলার বন্যজন্তু (স্তন্যপায়ী)	শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য	পশ্চিমবঙ্গ জীব বৈচিত্র্য পর্ষদ	২০০৮

বই	লেখক	প্রকাশক	মুদ্রণকাল
চামলা ভ্যালির ডোরাকাটা	পবিত্রময় দত্ত	দে'জ পাবলিশিং কোং	২০০৬
জঙ্গল	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	প্রবাসী	
জঙ্গলে জঙ্গলে	সম্পা: কমল চৌধুরী	দে'জ পাবলিশিং কোং	২০০৬
জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি	আলোকময় দত্ত	আনন্দধারা	১৯৮৪
জঙ্গল মহল	বুদ্ধদেব গুহ	দে'জ পাবলিশিং কোং	১৯৯০(২)
জাঙ্গল লোর	জিম করবেট/অনুবাদ:অমিয় চক্রবর্তী	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	
জঙ্গল কাহিনী	কেনেথ আন্ডারসন/অনু:-সৌরেন ভট্টাচার্য	ভারতী বুক স্টল	১৯৯৫
জঙ্গলের ডায়রি	কল্যাণ চক্রবর্তী		
জয় অ্যাডামসন অমনিবাস	জয় অ্যাডামসন/অনু:-শৈলেশ দে	বিশ্ববাণী	
জিম করবেট অমনিবাস, ১ ও ২	জিম করবেট/অনু:-মহাশ্বেতা দেবী	করুণা প্রকাশনী	১৩৮৩
ঝিলে জঙ্গলে শিকার	কুমুদনাথ চৌধুরী/অনু:-প্রিয়ংবদা দেবী	সিটি বুক	১৯৪১(২)
ঝিলে জঙ্গলে	কুমুদনাথ চৌধুরী/অনু: অলকা চৌধুরী	নাথ ব্রাদার্স	১৩৮৩
ডোরাকাটার অভিসারে	শের জঙ্গ/অনু: সুভাষ মুখোপাধ্যায়	রূপরেখা	১৯৬৯
তিস্তাচরের মানুষখেকো	কৃষ্ণেন্দু দে	বুক ট্রাস্ট	১৯৮৬
দুঃসাহসের কাহিনী	অনু:-ময়ূখ চৌধুরী	নির্মল বুক এজেন্সী	
ন'টা বাঘ আর একটা মত্ত হাতি	কেনেথ আন্ডারসন/অনু:-অমিয় চক্রবর্তী	অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির	
পশ্চিমঘাটের পাহাড়ে জঙ্গলে	আলোকময় দত্ত	দে'জ পাবলিশিং কোং	১৯৯৩
২৫(পঁচিশ)টি ভয়ংকর বাঘ	সম্পা: বুদ্ধদেব গুহ	পারুল প্রকাশনী	
বনজঙ্গল ও শিকারের কথা	ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	ওরিয়েন্ট লংম্যান	১৯৪৮
বনজঙ্গলের পাঁচালী	তুষারকান্তি বসু	অমর ভারতী	
বন ও বন্য	দিলীপ ভট্টাচার্য	নাথ ব্রাদার্স	১৯৭৮
বনে বনে	সঙ্কর্ষণ রায়	নির্মল বুক	২০১৫
বনের খবর	প্রমদারঞ্জন রায়	সিগনেট প্রেস	১৯৫৬
বাকলার জঙ্গলে	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কোং	১৯৮০
বাঘ, কুমির, সুন্দরবন	মিতা সিংহ	নিউ স্ক্রিপ্ট	২০১৬
বাঘ ভাল্লুকের দেশে	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	দেব সাহিত্য কুটীর	
বাঘে মানুষে	বিশ্বনাথ বসু	সিগনেট প্রেস	১৩৭৮
বাঘ ও বাঘিনী	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কোং	১৯৮৪

বই	লেখক	প্রকাশক	মুদ্রণকাল
বাঘের গল্প	কল্যাণ চক্রবর্তী	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯৬
বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	ইন্ডিয়ান অ্যাসো: পাবলিশিং কোং	
বাঘের জঙ্গল	হীরালাল দাশগুপ্ত		
বাঘের গর্জন	কেনেথ আন্ডারসন/অনুবাদ	শৈব্যা প্রকাশনালয়	
বাঘ সিংহ হাতি	রতনলাল ব্রহ্মচারী	শৈব্যা প্রকাশনালয়	
বাঘ হাতি হরিণ	বিমল কুমার ভট্টাচার্য	ওরিয়েন্ট লংম্যান	
বাঘ সিংহ হাতি	বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী	মিত্র ও ঘোষ	১৪০৯
বাঘের মাসী বেড়াল	এম. ডি. চতুর্বেদী/অনু:-ইন্দ্রাণী সরকার	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট	১৯৭২
বাঘের দেশে	জেমস ইংলিশ/অনু: সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	নির্মল বুক কনসার্ন	
বাংলার শিকার কাহিনী	শচীন্দ্রনাথ মিত্র		
বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী	এন. ইউ. চৌধুরী		
বনে জঙ্গলে	হীরেন বসু	দেবসাহিত্য কুটীর	
বিচিত্র শিকার কাহিনী	অনু:- বীরু চট্টোপাধ্যায়	কস্‌মো স্ক্রিপ্ট্	
বিচিত্র বাঘ শিকার	ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	এশিয়া পাবলিশিং কোং	
বিখ্যাত শিকার কাহিনী	সম্পা: বিশু মুখোপাধ্যায়	দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম	১৩৭০
ভারতের জাতীয় পশু বাঘ	বিশ্বনাথ বসু	মণ্ডল বুক হাউস	
ভারতের বন্যপ্রাণী	ই. পি. জি/অনু: অমিয় চক্রবর্তী	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	
ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী	কল্যাণ চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ চৌধুরী		
ভারতের বনে জঙ্গলে	হিউ অ্যালেন/অনু:-পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং	
ভয়াবহ শিকার কাহিনী	অনু:-ময়ূখ চৌধুরী	নির্মল বুক এজেন্সী	
মাগদি হিলসের কালো চিতা	কেনেথ আন্ডারসন/অনু: পরিতোষ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং	
মানুষখেকোর বিভীষিকা	কেনেথ আন্ডারসন	শৈব্যা প্রকাশনালয়	
মানুষখেকোর কথা	পবিত্রময় দত্ত	দে'জ পাবলিশিং	২০০৩
মানুষ ও বাঘ	কল্যাণ চক্রবর্তী	আনন্দ পাবলিশার্স	
মায়ামৃগ	হীরালাল দাশগুপ্ত		
মৃত্যু যখন মুখোমুখি	জিম করবেট/অনু:-ঋষি দাস	অশোক প্রকাশন	
রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী	অনু:-সুধীন্দ্র নাথ রাহা	দেব সাহিত্য কুটীর	
রুদ্রপ্রয়াগের চিতা বাঘ	জিম করবেট (অনুবাদ)	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	

বই	লেখক	প্রকাশক	মুদ্রণকাল
শিকার কাহিনী	সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী	সান্যাল এন্ড কোং	১৩১৩
শিকারের বিচিত্র কাহিনী	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কোং	
শিকার অমনিবাস	জিম করবেট ও কেনেথ আন্ডারসন/অনু: প্রসাদ সেন	পত্রলেখা	১৯৯৪
শিকারের জার্ণাল	অর্ধেন্দু দত্ত	দে'জ পাবলিশিং	১৯৮৭
শিকারের গপ্‌পো	অর্ধেন্দু দত্ত	দে'জ পাবলিশিং	
শহরে জোড়া বাঘ	গঙ্গেশ চন্দ্র বিশ্বাস	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং	১৩৯০
শিকারী জীবন	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	ইন্ডিয়ান অ্যাসো: পাবলিশিং কোং	
শিকার	হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়	নবপত্র প্রকাশন	১৯৭৬
শিকার ও শিকারী	ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী		১৩৩৬
শিকার স্মৃতি	জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী		১৩৩১
শিকারের সন্ধানে প্যান্থার	এম. ডি. চতুর্বেদি		
শিকারের সেরা গল্প	গঙ্গেশ চন্দ্র বিশ্বাস	পূর্ণ প্রকাশন	
শিকার অমনিবাস	অনু:- বীরু চট্টোপাধ্যায়	মৌসুমী প্রকাশন	১৯৮২
শিকার যখন ভয়ংকর	শিশির গুহ	মালা পাবলিশিং	১৯৮৯
শিকার কাহিনী	অনু: মণীন্দ্র দত্ত	সাহিত্য তীর্থ	১৯৯০
শিবানী পল্লীর কালো চিতা	কেনেথ আন্ডারসন	শৈব্যা প্রকাশন	
সাভোর মানুষ খেকো	জে. এইচ. প্যাটারসন/অনু:-মহাশ্বেতা দেবী	করুণা প্রকাশনী	১৯৮৮
হাতির বই	ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	আনন্দ পাবলিশার্স	২০১১
হাতীর সঙ্গে পঞ্চাশ বছর	পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য	বিশ্ববাণী	১৯৮২
হাটারী	মাইকেল মিলার	গ্রন্থপ্রকাশ	
হাতিসারের হাতি	দিলীপ ভট্টাচার্য	সাহিত্যলোক	
হান্টার্স ট্র্যাকস্‌	অনু:- জে. এ. হান্টার	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	
হান্টার	অনু:- জে. এ হান্টার	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	
সুন্দরবনের আতঙ্ক	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কোং	
বাঙলার শিকার প্রাণী	শচীন্দ্রনাথ মিত্র		১৩৬৭
বনের বাসিন্দা	নারায়ণ চন্দ		১৩৬৬
বনে বনে বেড়াই	কল্যাণ চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী		১৯৯১
ভারতের বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্য	বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী	এন বি টি	১৯৭৫

বই	লেখক	প্রকাশক	মুদ্রণকাল
সবুজের খোঁজে	কল্যাণ চক্রবর্তী		১৯৯১
হাতি বনজঙ্গলের কথা	ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী		১৯৯৬
জীবজন্তুর ডায়েরি	ঋতিংকর দত্ত		
ডোরাকাটার খোঁজে	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৬
অরণ্য পথিক	চারুব্রত মুখোপাধ্যায়		১৯৮৭
সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার	তাহাওয়ার আলীখনি অনুবাদ : আখতার উল আলম	ঢাকা	১৯৯৩
আফ্রিকার জঙ্গলে	রতনলাল ব্রহ্মচারী		১৯৯৫
আফ্রিকার জঙ্গলে বারোমাস	রতনলাল ব্রহ্মচারী		১৯৯৫
শিকারী অমনিবাস	বীরু চট্টোপাধ্যায়		১৯৮২
পশুরাজ্যের কাহিনী	বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত		১৯৬৫
সারাণ্ডার জঙ্গলে	দিলীপ ভট্টাচার্য		১৩৯১
বাংলার অরণ্য ও আরণ্যক	স্বপনকুমার দাস ও চিরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৯৯
অরণ্যে অরণ্যে	কমল চৌধুরী সম্পাদিত		২০০২
শিকার কাহিনী	বুলু ইমাম	এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স	২০০৯

ছবি : ময়ূখ চৌধুরী

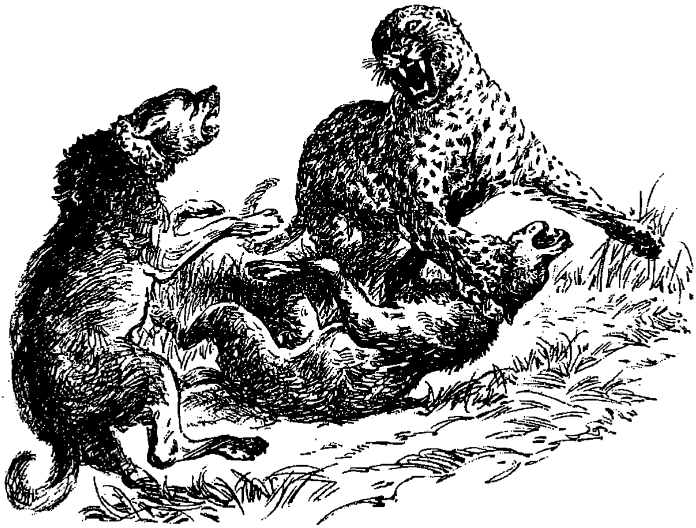

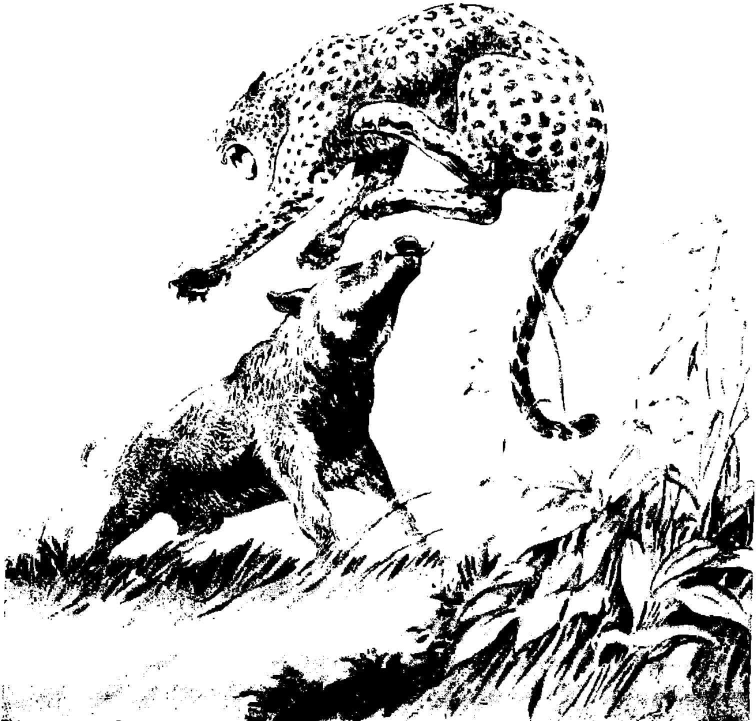

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org